জেম্‌স্‌ হিল্‌টন্‌

লস্ট হরাইজন

অনুবাদ

মোহিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

পূর্বাচল পাব্‌লিশার্স

২৫, ভবানী দত্ত লেন

কলিকাতা—৭

প্রকাশ করেছেন—

পূর্বাচল পাব্লিশার্স-এর পক্ষে

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

২৫, ভবানী দত্ত লেন

কলিকাতা—৭

ছেপেছেন—

কে, ব্যানার্জি

শ্রীবঙ্কিম প্রেস

১১৮।২, বহুবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

বেঁধেছেন—

ন্যাশনাল বাইণ্ডার্স

৮।২, ভবানী দত্ত লেন

কলিকাতা—৭

মূল্য—সাড়ে তিন টাকা মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন

১৯৪৭ সালে যখন বাংলায় ঘোরতর দুর্যোগ তখন "ঘোষ রায়" (অর্থাৎ "ভারতী ভবন") জেমস্ হিল্টনের তিনখানি বিখ্যাত উপন্যাসের বাংলা তরজমা প্রকাশের অধিকার অর্জন করেন। তাঁরা "গুডবাই মিস্টার চিপ্স্" ও "র‍্যাণ্ডম হারভেস্ট"-এর তরজমা পর পর প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে অনিবার্য কারণে "ভারতী ভবন" কাজ-কর্ম বন্ধ করতে বাধ্য হন। গত বৎসর আমরা "ভারতী ভবনে"র কাছ থেকে হিল্টনের "লস্ট হরাইজন" উপন্যাসটির বাংলা তরজমা প্রকাশের অধিকার অর্জন করি। বিলম্ব হলেও আজ সেটি প্রকাশিত হলো।

"লস্ট হরাইজনে"র তরজমা করেছেন শ্রীমোহিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, আর তাঁকে আদ্যন্ত সাহায্য করেছেন "ভারতী ভবনে"র শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—বিশেষ করে শেষ অর্ধাংশের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

বইটির মুদ্রণকালে মোহিত বাবু অসুস্থ থাকায় আমরা তাঁর সাহায্য পাইনি, তাছাড়া একাধিক অনিবার্য কারণে তখন বীরেন্দ্র বাবুরও সাহায্য পাওয়া সং হয়নি। তাই বইটিতে মুদ্রণ-প্রমাদ ছাড়া অন্যান্য ত্রুটিও বহুস্থলে থেকে গেল। এই সব ত্রুটি পাঠের অসুবিধা করবে বলে মনে হয় না, তবু পাঠকদের কাছে আমরা সবিনয় মার্জনা চাইছি।

আষাঢ়ের প্রথম দিন

১৩৫৯

—কথামুখ—

ইস্কুলের পুরনো বন্ধুরা মানুষ হয়ে উত্তরজীবনে আবার মিলিত হলে ছেলেবেলার মিলগুলি খুঁজতে হাঁপিয়ে ওঠে, আমাদেরও বুঝি তাই হলো। —সিগারগুলি নীরবে নিঃশেষ হতে থাকে।

রাদারফোর্ড ঔপন্যাসিক। উইল্যাণ্ড দূতাবাসের অন্যতম সচিব, টেম্পলহকে আজকের ডিনার সেই দিয়েছে, কিন্তু মনে হয় তেমন খুশী হয়নি, তবে এসব ক্ষেত্রে কূটনীতিকের পালনীয় সংযমটুকু সে বজায় রাখতে পেরেছে। খুব সম্ভব আজ আমাদের মিলিত হবার একমাত্র কারণ—দূর বিদেশের এক শহরে সমাগত আমরা তিনটি অবিবাহিত ইংরেজ। আর একটি সিদ্ধান্তে আমি এসেছি,—ছেলেবেলা উইল্যাণ্ডের চরিত্রে যে কিছুটা দাম্ভিকতা দেখতাম এতদিন তা সমানেই থেকে গেছে, আর রাদারফোর্ডকে আজ আমার খুবই ভাল লেগেছে। ছেলেবেলার সেই অস্থিচর্ম্মসার অকালপক্ক ছেলেটি—যাকে কত ক্ষেপিয়েছি, যার ওপর কত মোড়লি করেছি —আজ একটি গোটা মানুষে পরিণত হয়েছে। রাদারফোর্ড আমাদের চেয়ে অনেক বেশি উপায় করছে, আমাদের চাইতে তার জীবনে বৈচিত্র্য অনেক বেশি, বোধ করি এই কথা ভেবে উইল্যাণ্ড ও আমার মনে একটি ভাবই দেখাপাত করেছে—সেটা হয়তো মৃদু হিংসারই ভাব।

যাই হোক, সন্ধ্যাটা মোটেই বিরক্তিকর মনে হলো না। সেখান থেকে বড় বড় লাফ্‌ট-হানসা বিমানগুলিকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, মধ্য য়ুরোপের কত জায়গা থেকে তারা এরোড্রোমে এসেছে। অন্ধকার হতেই চারিদিকে অসংখ্য আলো জ্বলে উঠল, আলো-ঝলমল দৃশ্যটিকে মনে হলো রঙ্গমঞ্চেরই মত জমকাল। বিমানগুলির একটি বিলাতী; তার সাজ-পোষাক পরা পাইলট আমাদের টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে উইল্যাণ্ডকে অভিবাদন

করে দাঁড়াল। উইল্যাণ্ড প্রথমটা তাকে ঠিক চিনতে পারেনি। তারপর পরস্পরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ধূম পড়ে গেল। আমরা আমাদের টেবিলে তাকে আমন্ত্রণ জানালাম। হাসিখুশি চমৎকার যুবকটি, নাম স্যাণ্ডার্স। বিমানীর পোষাকে মানুষ চেনার ভারি অসুবিধা এই বলে উইল্যাণ্ড কুণ্ঠা প্রকাশ করলে, স্যাণ্ডার্স হেসে উঠে বলল, সেকথা আমি ভাল রকমই জানি। আমিও তো বাসকুলে ছিলাম।

উইল্যাণ্ডও হেসে উঠল, কিন্তু যেন জোর করে। তারপর কথাবার্তা চলতে থাকল অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে।

আমাদের ছোট্ট দলটিতে স্যাণ্ডার্স যেন জীবন এনে দিল,—একসংগে সবাই বোতলের পর বোতল বিয়ার শেষ করলাম। প্রায় দশটার সময় উইল্যাণ্ড কাছের একটি টেবিলে কার সংগে আলাপ করার জন্যে উঠে গেল। রাদারফোর্ড হঠাৎ একটু ফাঁক পেয়ে স্যাণ্ডার্সকে প্রশ্ন করল, একটু আগে আপনি বাসকুলের উল্লেখ করলেন। জায়গাটা আমিও চিনি। সেখানে কী হয়েছিল যেন বলছিলেন ?

লজ্জিত ভংগিতে একটু হেসে স্যাণ্ডার্স বলল, আমি যখন সেখানে কাজ করছিলাম তখন কোন একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। হয়েছিল কি, একজন আফগান না আফ্রিদি কিংবা ওই ধরণের কেউ আমাদের একটি বিমান নিয়ে পালায়, আর বুঝতেই পারছেন তার জন্যে পরে আমাদের অনেক দুর্ভোগ গেছে। এরকম চুরির কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। ধুরন্ধর চোরটা সুযোগ বুঝে পাইলটকে কাবু করে বিমান থেকে সরিয়ে দেয়, তারপর তার পোষাক পরে সকলের অজ্ঞাতে ককপীটে উঠে মেকানিকদের নির্ভুল সংকেত করে উড়ে যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সে আর ফিরে আসেনি।

আগ্রহান্বিত কণ্ঠে রাদারফোর্ড প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা ঘটেছিল কবে ?

বছরখানেক তো হবেই। একতিরিশ সালের মে মাসে। আপনার

বোধ হয় মনে আছে বাসকুলে তখন বিপ্লব চলেছে, আমরা শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের সেখান হতে পেশোয়ারে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। চারিদিকে তখন বিশৃংখলা, নইলে এরকম ব্যাপার কিছুতেই ঘটত না। কিন্তু যখন ঘটেছে, তখন মনে হয় জামা-কাপড়ই মানুষের রূপ দেয়,—তাই না ?

রাদারফোর্ডের আগ্রহ তখনও মেটেনি। বলল, কিন্তু আমি তো জানতাম ওরকম সময় প্রত্যেক বিমানে একজনের বেশি লোক দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

সাধারণ সেনাবাহী বিমানগুলিতে তাই ছিল। কিন্তু সেই বিমানটি ছিল একটু বিশেষ ধরণের। কোন এক মহারাজার জন্যে বুঝি প্রথমে তৈরি হয়েছিল, তারপর সেটা ভারতীয় জরিপ বিভাগ কাশ্মীরে খুব উঁচুতে ওঠার জন্যে ব্যবহার করছিলেন।

সেটা পেশোয়ারেও পৌঁছয়নি ?

আমরা যতদূর জানতে পারি, সেটা কোথাওই নামেনি। সেইটাই অদ্ভুত ব্যাপার। অবশ্য যদি সেই লোকটা উপজাতীয় হয় তাহলে বিমানের আরোহীদের গুম করে টাকা আদায় করার জন্যে পাহাড়-পর্বতের দিকে যাওয়াই স্বাভাবিক। আমার মনে হয় সেই বিমানের কেউই বেঁচে নেই। সীমান্ত এলাকায় এমন বহু জায়গা রয়েছে যেখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ কোনদিন জানতে পারে না।

হ্যাঁ তা আমি জানি। আচ্ছা কতজন আরোহী ছিলেন তাতে ?

চারজন মনে হয়। তিনজন পুরুষ আর একজন ধর্ম্মপ্রচারিকা।

তাঁদের ভেতর কনওয়ে নামে কেউ ছিলেন ?

হ্যাঁ ছিলেনই তো!—বিস্মিত নয়নে স্যাণ্ডার্স বলল, 'গ্লোরি' কনওয়েকে আপনি চেনেন নাকি ?

সে আর আমি একই স্কুলে পড়তাম।—একটু আত্ম-সচেতন হয়ে রাদারফোর্ড বলল। কথাটা সত্য হলেও, রাদারফোর্ডের মনে হলো, তার মন্তব্যে কোথায় যেন সঙ্গতির অভাব রয়েছে।

বাসকুলে তিনি কী করেছেন জানি না, কিন্তু চমৎকার লোক ছিলেন। - স্থাণ্ডার্স বলল।

ঘাড় নেড়ে রাদারফোর্ড বলল, নিশ্চয়···কিন্তু কী অদ্ভুত···কী অদ্ভুত··· কিছুক্ষণের জন্যে তার মনটা কোন্ সুদূরে ছুটে গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে-ভাব সামলে নিয়ে বলল, কিন্তু কাগজে তো কই এ খবর পড়িনি ?

হঠাৎ স্থাণ্ডার্স একটু অসোয়াস্তি বোধ করে, এমনকি আমার মনে হয় লজ্জায় সে লাল হয়ে ওঠে। বলল সে, সত্যি কথা বলতে, আমি এমন অনেক কিছু বলে ফেলেছি—যা বলা আমার উচিত হয়নি। অবশ্য আজ আর এসব নিয়ে কে মাথা ঘামাবে। ব্যাপারটা তখন চেপে যাওয়া হয়েছিল - মানে, যেভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা মানে···গভর্ণমেণ্ট শুধু এইটুকু প্রকাশ করে যে, তাঁদের একটি বিমান নিখোঁজ হয়েছে, আর তার আরোহীদের নাম এই—এই। এ খবরে সাধারণের দৃষ্টি স্বভাবতই বিশেষ আকৃষ্ট হয়নি।

এই সময় উইল্যাণ্ড ফিরল। স্থাণ্ডার্স একটু কিন্তু হয়ে বলল, উইল্যাণ্ড এরা গ্লোরি কনওয়ের কথা বলছিলেন। বাসকুলের কথা আমি বলে ফেলেছি—তাতে কি বিশেষ ক্ষতি হবে ?

কথাটা শুনেই উইল্যাণ্ড মুহূর্ত্তের জন্যে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল। এক-দিকে বন্ধুর প্রতি ভব্যতা অন্যদিকে কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা—বেশ বোঝা গেল, এই দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করছে সে। শেষে সে বলল, সেসব কথা নিয়ে আলোচনা করা অন্যায় হয়েছে স্থাণ্ডাস। তোমরা যে ভেতরের কথা প্রকাশ করবে না সেটুকু তোমাদের সম্মান-বোধের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।—স্থাণ্ডার্সকে এভাবে ভৎর্সনার পর রাদারফোর্ডের দিকে ফিরে বলল, অবশ্য তোমার ক্ষেত্রে একথা খাটে না। কিন্তু ফ্রন্টিয়ারের খবর অনেক সময় একটু ঢেকে রাখা দরকার। তুমি এ-কথা স্বীকার কর নিশ্চয়।

রাদারফোর্ড নীরস কণ্ঠে বলল, তবে সত্য জানার ইচ্ছা সকলেরই হয়—

সত্যিই যাদের জানতে চাওয়ায় হেতু ছিল তাদের কাছে কিছুই গোপন করা হয়নি। আমি নিজে তখন পেশোয়ারে ছিলাম, কাজেই একথা আমি জোর করে বলতে পারি। কনওয়ের সংগে তোমার কি খুব পরিচয় ছিল,—মানে, স্কুল থেকে ?

অক্সফোর্ডে কিছুটা আলাপ হয়েছিল, তারপর মাঝে মাঝে কয়েকবার দেখা হয়েছে। তোমার—?

আক্কারায় থাকতে দু'একবার দেখা হয়েছিল।

কী রকম মনে হয়েছিল তাকে ?

খুবই বুদ্ধিমান, কিন্তু কেমন যেন অলস প্রকৃতির।

একটু হেসে রাদারফোর্ড বলল, বুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। যুদ্ধ বাধার আগে অবধি তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন ছিল অপূর্ব। নৌকাচালনায় ব্লু, য়ুনিয়নের একজন প্রধান, তারপর যত পুরস্কার সব যেন ছিল তারই,—আরও শুনেছি, সৌখীন পিআনোবাজিয়ে হিসাবেও তার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। তার প্রতিভা ছিল বহুমুখী।—কিন্তু অক্সফোর্ডের পর তার কথা আর কেউ বিশেষ জানে না। অবশ্য যুদ্ধ তার অক্সফোর্ড-জীবনে ছেদ টেনে দিয়েছিল। তখন সে পূর্ণ যুবক,—শুনেছি যুদ্ধে অনেক দিন কাটিয়েছে—

হ্যাঁ।—সায় দিয়ে উইল্যাণ্ড বলল, আহতও হয়েছিল, তবে খুব গুরুতর ভাবে নয়। খুব খারাপ সেখানেও ছিল না—ফ্রান্সে ডি, এস, ও পেয়েছিল। তারপর মনে হয় কিছু দিনের জন্যে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে অক্সফোর্ডে ফিরে গিয়েছিল। একুশ সালে চলে যায় প্রাচ্যে। প্রাচ্য ভাষাগুলিতে দখল থাকায় সহজে চাকরি পায়। তারপর অনেকগুলি পদে কাজ করে—

তাহলেই বুঝতে পারছো তো।—হেসে বলল রাদারফোর্ড। ইতিহাস একথা কোনদিন প্রকাশ করবে না। সামান্য চাকরির খিৎমদের আড়ালে কী প্রতিভা নষ্ট হয়ে গেল।

একটু ভারিক্কি গলায় উইল্যাণ্ড বলল, সে অবশ্য কূটনীতিক কাজে ছিল না।—বেশ বোঝা গেল, এসব অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না, তাই কিছু পরে রাদারফোর্ড যখন যাবার জন্যে উঠল সে বাধাও দিল না।

যাই হোক, রাতও বেশ হয়েছিল, আমিও উঠলাম। আমাদের উইল্যাণ্ড নীরবে বিদায় দিল তার পদমর্য্যাদার গাম্ভীর্য অক্ষুণ্ণ রেখে; কিন্তু স্যাণ্ডাস জানাল অকৃত্রিম বিদায় অভিবাদন, এমনও বলল, আবার হয়তো আমাদের দেখা হবে।

ভোরবেলায় বিশ্রি একটা সময়ে আমার ট্রেণ। ট্যাকসির জন্যে অপেক্ষা করছি রাদারফোর্ড বলল, মাঝের কটি ঘণ্টা আমি তার হোটেলে কাটাতে পারি। বললাম, তাহলে তো খুব ভালই হয়।

রাদারফোর্ড বলল, যদি তোমার ভাল লাগে তাহলে সময়টা কনওয়ে সম্বন্ধেই গল্প করা যাবে।

বললাম, ভালো লাগবে না কেন। তবে আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল না। ফার্স্ট টার্মের শেষের দিকে তিনি চলে যান। তারপর আর কোন দিন দেখা হয়নি। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি আমার জন্যে যা করেছিলেন, সত্যিই তা ভুলব না। ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ—তাহলেও একজন নতুন ছেলের জন্যে কেন যে করেছিলেন জানি না।

রাদারফোর্ড বলল, সময়ের পরিমাপে বিচার করলে আমি তার কথা তেমন কিছুই জানি না। কিন্তু সত্যিই তাকে আমার ভয়ানক ভাল লাগত।

নীরবে কয়েকটি রাস্তা অতিবাহন করার পর আবার রাদারফোর্ড বলল, যাই হোক আজকের সন্ধ্যাটি আমার কাছে খুবই দামি। বাসকুলের ঘটনা সম্পর্কে স্যাণ্ডাসের গল্পটি আমার একটি কৌতুহল মিটিয়েছে। জান, এই গল্প আমি আগেই শুনেছি, কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। এটি একটি অদ্ভুত—হ্যাঁ অদ্ভুতই—গল্পের অংশমাত্র এবং তা বিশ্বাস করার কোন কারণই পাই নি,—কিংবা হ্যাঁ, কেবল ছোট্ট একটি কারণ ছিল। এখন হলো দুটি।

তুমি তো জান বাজে কথায় সহজে ঠকবার মতন লোক আমি নই। আমার জীবনের বেশির ভাগ কেটেছে দেশ-দেশান্তরে, আমি জানি পৃথিবীর এমন অনেক আশ্চর্য জিনিস আছে যা নিজের চোখে না দেখে, শুধু লোকের মুখে শুনে বিশ্বাস করা যায় না। এবং যদিও—

হঠাৎ সে যেন বুঝতে পারল, সে যা বলছে আমার কাছে তা বলার তেমন সার্থকতা নেই, তাই একটু হেসে বলল, উইল্যাণ্ডের কাছে এসব কথা আমি ভাঙিনি, তার কারণ, জানি তা বলা মানে বেনাবনে মুক্তো ছড়ান। দেখি তোমার ভাল লাগে কিনা।—

এটা খোসামুদে কথা শোনাচ্ছে না?

তোমার বই পড়ার পর কিন্তু আমি একথা মানি না।

আমি যে একটি বিশেষ বিষয়ে পুস্তক রচনা করেছি তা কাউকে বলিনি। তাই রাদারফোডের মুখে তার উল্লেখে রীতিমত বিস্মিত হয়ে তাকে সেকথা বললাম।

সে জবাব দিল, বইটা পড়েছিলাম কেন জান? কনওয়ে এক সময় স্মৃতিভ্রংশ রোগে ভুগেছিল।

হোটেলে পৌঁছে ব্যুরো থেকে চাবি নিয়ে আমরা ছতলায় রাদারফোডের ঘরে চললাম।

রাদারফোর্ড বলল, এতক্ষণ তো ভূমিকা করলাম, আসল কথা কি জান, কনওয়ে মরেনি—অন্তত কয়েকমাস আগেও সে জীবিত ছিল।

লিফট তখন ছতলায় চলেছে,--তাছাড়া সেই স্বল্প-পরিসর স্থান; আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

কয়েক সেকেণ্ড পরে করিডরে নেমেই প্রশ্ন করলাম, নিশ্চিত জান? কী করে জানলে?

দরজার চাবি খুলে বলল সে, জানি কারণ গত নভেম্বরে তার সংগে একটি জাপানী লাইনারে শাংহাই হতে হনুলুলু অবধি গিয়েছি।

তারপর চেয়ারে আরাম করে বসে আমাকে ড্রিঙ্ক আর সিগার এগিয়ে দিয়ে আবার সে বলতে শুরু করল : গত শরৎকালের ছুটিতে চীনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেড়ান আমার নেশাই বলতে পার। যাই হোক। কনওয়ের সাথে তার আগে কয়েক বছর দেখা হয়নি, চিঠিপত্রের আদানপ্রদানও ছিল না এবং তার কথা যে বিশেষ ভাবতাম তাও জোর করে বলতে পারি না। তবে পুরণো বন্ধুদের মনে করবার চেষ্টা করলে তার মুখ অ-চেষ্টাতেই মনের মাঝে ভেসে উঠত। হাঙ্কাউ-এ একটি বন্ধুর সাথে দেখা করে পেকিন এক্সপ্রেসে ফিরছিলাম, হঠাৎ ফরাসী ধর্মসেবিকাদের এক অধিনেত্রীর সংগে আলাপ হলো। তিনি যাচ্ছিলেন চুং-কিয়াঙে,—তাঁদের কন্‌ভেণ্ট সেইখানেই। ফরাসী ভাষায় আমার সামান্য দখল রয়েছে দেখে মহা উৎসাহে তিনি তাঁদের কাজকর্মের কথা সবিস্তারে বলতে লাগলেন। চুং-কিয়াঙে তাঁদের মিশন-হাসপাতালের প্রসঙ্গে বললেন, কয়েক সপ্তাহ আগে একজন রুগী আসে, তখন তার প্রবল জ্বর। তার সংগে কোন কাগজ-পত্রও ছিল না, আর সে নিজের কথা কিছুই বলতে পারেনি। তাই তাকে আমরা প্রথমে য়ুরোপীয় ভেবেছিলাম। মিশনের মেয়েরা যখন তাকে নিয়ে আসে তখন তার পরণে ছিল জরাজীর্ণ দেশীয় পোষাক। চীন ভাষা সে অনর্গল বলতে পারে, ফরাসীও বেশ ভাল জানে, আবার মিশনের মেয়েদের সংগে গোড়ার দিকে সে ইংরেজিও বলেছিল—এবং তার উচ্চারণ খুবই শুদ্ধ।

আমি বললাম, এধরণের ঘটনা আমার কল্পনাতীত, এবং মৃদু শ্লেষের সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিলাম যে-ভাষা তিনি জানেন না তার শুদ্ধাশুদ্ধতাই বা ধরলেন কী করে। এই সব নানান কথা নিয়ে আমাদের কিছুক্ষণ হাস্য-পরিহাসও হলো। শেষে তিনি বললেন, যদি আমি কোনদিন চুং-কিয়াঙে যাই তাহলে যেন মিশনটা একবারটি দেখে আসি। তখন তা আমার কাছে এভারেস্টে ওঠার মতনই অসম্ভব মনে হয়েছিল। চুং-কিয়াং আসতে তাঁর সংগে করমর্দন করে সত্যিই দুঃখের সঙ্গে বললাম, আমাদের হঠাৎ পরিচয়ের শেষ হলো।

কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরেই আমাকে আবার চুংকিয়াঙে ফিরতে হলো। ট্রেণ মাইল দুয়েক যাবার পর আবার বহু কষ্টে আমাদের স্টেশনে ফিরিয়ে আনল,—সেখানে শুনলাম বারো ঘণ্টার আগে কোন বদলী ইন্‌জিন আসার তেমন সম্ভাবনা নেই। চৈনিক রেলোয়েতে এধরনে ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কাজেই পুরো বারোটি ঘণ্টা চুংকিয়াঙে কাটাতে হবে—কী করি শেষে সেবিকা-অধিনেত্রীর নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়া হাজির হলাম।

সমাদর ও বিস্ময় মিশ্রিত অভ্যর্থনা পেলাম সেখানে। মিশনের লোক-জনদের'ও বেশ ভাল লাগল। এক ঘণ্টা না কাটতেই দেখি তাঁরা খাবারও প্রস্তুত করে ফেলেছেন। একজন চৈনিক ক্রীশ্চান যুবক ডাক্তারও আমার সংগে বসলেন—এবং ফরাসী ইংরেজী মিশিয়ে বেশ চমৎকার আলাপও করতে লাগলেন। তারপর অধিনেত্রী তাঁর হাসপাতাল দেখাতে নিয়ে গেলেন। হাসপাতাল তাঁদের গর্বের বস্তু। আমি তাঁদের বলেছিলাম যে আমি সাহিত্যিক—আর তাঁরাও সরল মনে ধরে নিয়েছিলেন আমার কোন বইয়ে তাঁরা সকলেই স্থান পাবেন। রোগীদের বিছানাগুলি একের পর এক দেখতে দেখতে আমরা এগলাম,—ডাক্তার তাদের সংগে সংগে রোগের বিবরণ বলে গেলেন। হাসপাতালটি চমৎকার,—চারিদিক ঝকঝকে-তকতকে, কোথাও নোংরা নেই—দেখলেই মনে হয় তার পরিচালনা অত্যন্ত সুষ্ঠু। শুদ্ধ ইংরেজি জানা সেই রুগীটির কথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, অধিনেত্রী তার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, তার বেডে এবার আমরা এসে পড়েছি। রুগীটি পিছু ফিরে শুয়েছিল, ভাবলাম হয়তো ঘুমুচ্ছে। অধিনেত্রী আমায় আগেই অনুরোধ করেছিলেন তাকে যেন ইংরেজিতে সম্বোধন করি। তাই বললাম, গুড আফ্‌টারনুন। রুগীটি এদিক পানে ফিরে উত্তর দিল, গুড আফটারনুন। তাঁর উচ্চারণ যে শিক্ষিতের তা সত্য। কিন্তু তাতে আমি বিস্মিত হলাম না। মুখভরা দাড়ি-গোঁফ, চেহারারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বহুদিন দেখাও

হয়নি, তবু তাকে চিনতে এতটুকু কষ্ট হলো না,—সে কনওয়ে। নিশ্চিত কনওয়ে সে, এতটুকু সন্দেহ নেই। প্রায় চিৎকার করে তার নাম ধরে ডাকলাম, নিজের নামও বললাম,—ফ্যাল ফ্যাল করে সে তাকিয়ে রইল, কিন্তু আমি স্থির-নিশ্চিত হলাম সে কনওয়ে ছাড়া আর কেউ নয়। বাঁচোখের কাছে সেই পৈশিক কুঞ্চন, সেই ধূসর চোখ। একবার যে তাকে দেখেছে চিনতে ভুল তার কোনদিন হবে না। ডাক্তার আর অধিনেত্রী ব্যাপার দেখে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের বললাম যে, তাঁদের রুগীটিকে আমি চিনি, আমারই বন্ধু, জাতিতে ইংরেজ,—আমাকে যদি চিনতে না পেরে থাকে তার কারণ তার স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে। বিস্মিত ভংগিতে তাঁরা শুধু আমার কথায় সায় দিলেন। তারপর তার অসুখ নিয়ে তাঁদের সংগে অনেক আলোচনা হলো। অসুস্থ কনওয়ে কী করে চুংকিয়াঙে এলো সে সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই বলতে পারলেন না।

যে কোনরকমে হোক কনওয়ের লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে আসব এই আশা নিয়ে সেখানে পনেরোদিন কাটালাম। কিন্তু স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারলাম না—অবশ্য শারীরিক দিক থেকে সে বেশ ভাল হয়ে উঠল। নানান গল্প হয় আমাদের। একদিন যখন তাকে খোলাখুলি বললাম সে কে,—সে কথা সে শুধুই শুনল, কোন প্রতিবাদ করল না। তাহলেও সে বেশ আনন্দেই ছিল আর আমার সঙ্গ পেলে খুসিই হতো। আরেকদিন বললাম তাকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব, সে শুধু বলল, বেশ তো। তার নিজের তেমন কোন ইচ্ছা ছিল না,—এটা একটু ভীতিজনক বইকি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করলাম। হাঙ্কাউ দূতাবাসে একজন পরিচিতকে গোপনে সব কথা বলতে পাসপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ হাঙ্গামা হলো না। ব্যাপারটা কনওয়ের দিক থেকে গোপন রাখার দরকার বলে তখন আমার মনে হয়েছিল, আর তাতে আমি সফলও হয়েছিলাম। নইলে খবরের কাগজওলারা তো পৃথিবী জুড়ে ঢাক পিটতে সুরু করত। যাই হোক, বেশ

নির্বিঘ্নে একদিন চান হতে বিদায় নিলাম। ইয়াংসি ধরে জাহাজে এসে ট্রেনে সাংহাই গেলাম। সেই রাত্তিরেই সাংহাই থেকে একটা জাপানী লাইনার সানফ্রানসিসকো যাচ্ছিল, তাড়াহুড়ো করে কোনরকমে তো আমারা জাহাজ ধরলাম—

সত্যিই তুমি কনওয়ের জন্যে যথেষ্ট করেছ। আমি বললাম।

রাদারফোর্ড সেকথা অস্বীকার না করে বলল, সত্যিই, আর কারুর জন্যে এতটা করতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু কনওয়ের ভেতর কী যে রয়েছে,—কী তা ঠিক বোঝাতে পারব না,—যার জন্যে যে কোন লোক সানন্দে সব কিছু করবে।

সত্যিই।—সায় দিয়ে বললাম, মানুষকে জয় করবার তার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তার কথা আজও ভাবতে বেশ লাগে—অবশ্য আমাব চোখের সামনে ভেসে ওঠে ক্রিকেট ফ্লানেল পরা স্কুলের ছাত্র কনওয়ে।

দুঃখের কথা যে তুমি তাকে অক্সফোর্ডে দেখনি। এককথায় সে ছিল অপূর্ব।—লোকে বলে যুদ্ধের পর সে নাকি অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল,—আমার নিজেরও তাই মনে হয়। তার যা প্রতিভা ছিল তাতে তার বড় কিছু একটা করা উচিত ছিল,—বড় বলতে আমি সরকারী কাজ বলি না। কনওয়ে সত্যিই বড ছিল,—অন্তত তাই হওয়া তার উচিত ছিল। আমরা দুজনেই তাকে চিনি, কাজেই আমি যে বাড়িয়ে বলছি না তা তুমি জান। তাকে ভোলা যায় না। মধ্যচীনে যখন তার সংগে আবার আমার দেখা হলো তখন তার মনে বিরাট শূন্যতা, তার অতীত আঁধারে তলিয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি এতটুকু কমেনি।

রাদারফোর্ড একটু থেমে বুঝি অতীতের কথাগুলিই ভাবে। তারপর আবার শুরু করল: বুঝতেই পারছ জাহাজে আমাদের পুরনো বন্ধুত্ব আবার নতুন করে হলো। তার সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি সবই তাকে একদিন বললাম, এবং সে কেমন এক অবিশ্বাস্য মনোযোগের সংগে সমস্ত কথাগুলি

শুনল। চুং-কিয়াঙে আসার পর থেকে তার সব কিছুই মনে ছিল। আরেকটা কথা, কোন ভাষা সে ভোলে নি।

য়ুকোহামাতে জাহাজে অনেক যাত্রী এলেন, তাঁদের ভেতর ছিলেন প্রসিদ্ধ পিয়ানো বাজিয়ে সাইভেকিং। তিনি আমেরিকায় 'কনসার্টটুরে' যাচ্ছিলেন। খাবার টেবিলে তাঁর সংগে প্রায়ই আমাদের দেখা হতো; কনওয়ের সংগে মাঝে-মাঝে জার্মান-ভাষায় আলাপও করতেন। তা হলেই বুঝতে পারছ বাইরে কনওয়ে কত স্বাভাবিক ছিল। স্মৃতি বিলোপটুকু বাদ দিলে,—সাধারণ কথাবার্তায় তাও বোঝা যেত না,—তাকে বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হতো। জাপান ছাড়ার কয়েকদিন পর জাহাজের যাত্রীরা সাইভেকিং-এর পিয়ানো বাজানর একটা জলসার ব্যবস্থা করল। আমরাও তাঁর বাজনা শুনতে গেলাম। তিনি যে খুব ভালই বাজালেন তা বলা বাহুল্য মাত্র। বাজনার ফাঁকে দু একবার কনওয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি, সাইভেকিঙের বাজনা সে রীতিমত উপভোগ করছে। তার অতীত জীবনে সংগীতপ্রিয়তার কথা ভাবলে সেটা স্বাভাবিক। প্রোগ্রামের শেষের দিকে সকলে বারবার অনুরোধ করায় সাইভেকিং আবাব বাজালেন; এবাব বিশেষ করে বাজালেন সোঁপা—জানো তো তাইতেই তাঁর নাম বেশি। শেষে তিনি পিয়ানো ছেড়ে উঠলেন; স্তাবকপরিবৃত হয়ে দরজার দিকে এগলেন। ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। কনওয়ে পিয়ানোয় বসে দ্রুতছন্দে প্রাণবন্ত একটি সুর বাজাতে লাগল। কী সুর আমি বুঝতে পারলাম না কিন্তু তা শুনে সাইভেকিং উত্তেজিতভাবে ফিরে এসে সুরটির নাম জানতে চাইল। কনওয়ে বহুক্ষণের অদ্ভুত নীরবতার পর জবাব দিল, সে জানে না। সাইভেকিং তার কথা তো বিশ্বাস করলেনই না বরং আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। কনওয়ে তখন তা মনে করবার প্রাণপণ চেষ্টার পর শেষে বলল, সেটি সোঁপারই একটি সুর। সাইভেকিং তাঁর কথা মানতে পারলেন না, আমিও তাতে বিস্মিত হলাম না কেন না আমার নিজেরই সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। সাইভেকিঙের

কথায় কনওয়ে হঠাৎ রেগে উঠল, আমি তো অবাক, তার আগে অবধি তাকে কোন বিষয় নিয়েই বিচলিত হতে দেখিনি। যাই হোক সাইভেকিং তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'শুনুন, সোঁপার যা কিছু আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি আমি জানি, এবং একথা আমি জোর করে বলতে পারি যে এই মাত্তর আপনি যে সুর বাজালেন তা কস্মিনকালেও সোঁপার লেখা নয়। তিনি লিখলে হয়তো এইরকমই হতো, কেন না আপনার সুরটির ভংগি তাঁরই মতন,—কিন্তু এটা তিনি লেখেন নি। আপনি আমায় তাঁর যে কোন সংস্করণে এই সুরটি দেখিয়ে দিন—'। শেষে কনওয়ে বলল, 'দেখুন এখন আমার মনে হচ্ছে যেন এ সুরটি কোনদিন প্রকাশিত হয় নি। আমি এটি সোঁপারই একটি শিষ্যের কাছ থেকে শিখেছি......আচ্ছা, আরেকটি অপ্রকাশিত সুর বাজাচ্ছি শুনুন, এটিও তাঁর কাছেই শেখা'।

রাদারফোর্ড স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে সজাগ করে তুলল, বলল: তুমি সংগীতরসিক কিনা জানি না, না হলেও কনওয়ে যখন দ্বিতীয় সুরটি বাজাতে লাগল তখন আমার আর সাইভেকিঙের অবস্থা কিছুটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। আমার উত্তেজিত হবার কারণ অবশ্য এতদিনে তাঁর রহস্যভরা অতীত সম্পর্কে ছোট একটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া। আর সাইভেকিং সংগীতের সমস্যায় মগ্ন হয়ে উঠেছিলেন—সমস্যাটা জটিলও বটে, কেন না তুমি জান সোঁপা মারা যান ১৮৪৯ সালে। সমস্ত ঘটনাটা বলতে গেলে এত অবিশ্বাস্য যে আমি না বলে পারছি না যে, এ ঘটনার অন্তত ডজনখানেক সাক্ষী রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামজাদা অধ্যাপকও আছেন। সময়ের বিচারকাঠিতে কনওয়ের কথা যে সত্যিই অসম্ভব তা সহজেই বলা যায়; কিন্তু তাহলে সংগীতটিরই বা ব্যাখ্যা কী, কনওয়ের কথা যদি সত্য না হয় তাহলে সেটা কী সুর? সাইভেকিং অবশ্য আমায় বললেন, সুর দুটি প্রকাশিত হলে ছ'মাসের মধ্যে প্রতিটি রসজ্ঞের সমাদর পেত। অতিরঞ্জন বলে মনে হলেও সাইভেকিং-এর অভিমত এই।

যাই হোক, এদিকে আমরা বহুক্ষণ আলোচনা করেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম না, কেন না কনওয়ে তার কোট্ কিছুতেই ছাড়তে রাজি হয় না। শেষে তাকে ভয়ানক ক্লান্ত দেখাতে লাগল। তখন ভিড়ের হাত হতে উদ্ধার করে তাকে তার ক্যাবিনে নিয়ে গেলাম। শেষে সুর দুইটিকে গ্রামোফোনে রেকর্ড করার কথা হয়। সাইভেকিং বললেন, আমেরিকায় গিয়েই তিনি রেকর্ড করার সব ব্যবস্থা করবেন, কনওয়ে মাইকের সামনে সুর দুটি বাজাতে রাজি হলো। কিন্তু ভারি আপসোসের কথা শেষ অবধি কনওয়ে তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি।

রাদারফোর্ড ঘড়িটা একবার দেখে বলল : তোমার ট্রেণের এখনও অনেক সময় রয়েছে, ইতিমধ্যে আমার গল্প শেষ হয়ে যাবে। গল্পটা বলতে হবে কেন না সেই রাত্তিরেই জলসার পর কনওয়ে তার লুপ্ত স্মৃতি ফিরে পায়। আমরা যে যার ক্যাবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ি ; আমি এমনি জেগেই শুয়েছিলাম, এমন সময় কনওয়ে এসে তার কথা শুরু করল। তার মুখ তখন গভীর বিষাদে ভরা,—সারা দুনিয়ার বিষাদ যেন জমাট বেঁধেছিল তার মুখটিতে। বলল অতীতের সব কিছুই সে মনে করতে পারছে,—সাইভেকিং-এর বাজনার সময় থেকে টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলি তার মনে জমা হতে থাকে। কতক্ষণ আমার বিছানায় সে চুপ করে বসে রইল, আমিও তার কাছ হতে সব কিছু শোনার জন্যে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাকে বললাম, সে যে তার হারান স্মৃতিগুলি ফিরে পেয়েছে তাতে আমি খুবই আনন্দিত, তবে যদি তার মনে হয় যে স্মৃতি ফিরে না পেলে ভাল ছিল তাহলে আমি খুবই দুঃখিত। চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে সে যা বলল তাতে আমি খুব বেশি সম্মানিত হলুম। বলল সে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ রাদারফোর্ড যে তুমি অন্তত আমার কথা বুঝতে পেরেছ। তারপর পোষাক পরে আমরা বোটের ডেকে হাজির হলাম। নিস্তব্ধ উষ্ণ তারাভরা রাত—তার তলে সমুদ্র যেন জমাট দুধের মতোই আঠাল, বিবর্ণ। কোন প্রশ্ন না করে তাকে নিজের মতন সব কথা

বলার সুযোগ দিলাম। শেষ রাত্রের দিকে এক সময় সে তার কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বলতে শুরু করেছিল, যখন থামল তখন চারিদিকে খটখটে রোদ। অবশ্য ঠিক শেষ সেইখানেই হলো না। তারপরের চব্বিশটি ঘণ্টায় আরও টুকিটাকি অনেক কথা সে বলেছিল। বিপদে তার মন ভারী হয়ে উঠেছিল, চোখে ঘুম ছিল না কাজেই সব সময়টাই তার সংগে গল্প করে কাটালাম। পরের দিন মাঝরাত্তিরে জাহাজ হনুলুলু পৌঁছবার কথা। সন্ধ্যে বেলায় আমার ক্যাবিনে একটু পানের আয়োজন করেছিলাম,—রাত্তির দশটার সময় কনওয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিল।—তারপর—আর তাকে দেখিনি।

তার মানে—

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল হোলিহেড-কিংসটাউন মেলবোটে একটি শান্ত আত্মহত্যার দৃশ্য।

রাদারফোর্ড হেসে বলল, না—না, আত্মহত্যা করার মতন লোক সে নয়। স্রেফ সে পালাল। সেখান থেকে তীরে যাওয়া খুবই সহজ ছিল। অবশ্য সে জানত যে আমি তার খোঁজ করলে তার পক্ষে আমাকে এড়িয়ে যাওয়া খুবই শক্ত। আর খোঁজও আমি করেছিলাম। পরে জানতে পারি, ফিজির দক্ষিণগামী একটি কলাবোঝাই জাহাজে সে কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল।

কী করে জানলে?

খুব সহজভাবে। তিন মাস পরে ব্যাঙ্কক থেকে একটি চিঠি লিখেছিল সে। তার জন্যে আমি যা খরচ করেছিলাম তা মিটিয়ে একটা ড্রাফ্টও চিঠির সংগে পাঠিয়েছিল। বিশেষ কিছু লেখেনি, শুধু ধন্যবাদ দিয়ে জানায় যে সে ভাল আছে, আর খুব শিগগিরই উত্তর-পশ্চিমে দীর্ঘ ভ্রমণে বেরুচ্ছে। বাস্, আর কিছু নয়।

কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে বলতে—

সেটা খুবই অস্পষ্ট। ব্যাঙ্ককের উত্তর-পশ্চিমে হাজারটা দেশ পড়ে—বার্লিনও তো তার ভেতর ধরা যেতে পারে।

সত্যই অদ্ভুত গল্প—কিংবা হয়তো রাদারফোর্ডের বলার কায়দায় অদ্ভুতত্ব পেয়েছে, কি জানি। গল্পের সংগীতীয় অংশটি, যতই রহস্যময় হোক, আমায় বিশেষ আকৃষ্ট করেনি, আমি ভাবছিলাম কী করে কনওয়ে চৈনিক মিশন হাসপাতালে এলো। রাদারফোর্ডকে সেকথা বললাম। রাদারফোর্ড বলল যে একই সমস্যার ও-দুটি অংশ মাত্র।

কিন্তু সে কী করে চুং-কিয়াঙে এলো সেকথা তোমায় কিছু বলেনি ?

হ্যাঁ কিছু কিছু বলেছিল বটে। এত কথা বলার পর সে অংশটুকু তোমার কাছে গোপন করার কোন কারণ নেই, শুধু সে অংশটি খুবই বড়। তোমার ট্রেনে ওঠার আগে সেটা মোটামুটি বলাও সম্ভব নয়। তাছাড়া সে-অংশটি জানার আরেকটি সহজ উপায় রয়েছে। জাহাজে কনওয়ের সংগে আমার যে সব কথাবার্তা হয়েছিল সেগুলি আমি টুকে রেখেছিলাম, পরে সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি এক করে লিখেছি। তা'বলে ভেব না যেন আমি কিছু রসান দিয়েছি বা অদলবদল করেছি। সে যা বলেছিল সেইটুকুই একটা বড় বইয়ের পক্ষে যথেষ্ট—তাছাড়া জান তো তার বলার শক্তি কী রকম ছিল। আসল মানুষটিকে তুমি চিনতে পারবে তারই গল্পে।—উঠে একটা পাণ্ডুলিপি আমায় এনে দিয়ে বলল সে,—এই নাও। এটা পড়ে যা-খুশি বিহীত করতে পার।

তার মানে বিশ্বাস করব না বলতে চাও ?

না ঠিক তা বলতে চাই না। তবে পড়ে কী মনে হয় আমায় জানিও।

পাণ্ডুলিপিটি অসটেণ্ড একস্‌প্রেসেই সব পড়ে ফেললাম। ভেবেছিলাম ইংলণ্ডে পৌঁছে লম্বা একটা চিঠি লিখে সেটি রাদারফোর্ডকে ফিরিয়ে দেব ; কিন্তু তার আগেই তার কাছ থেকে ছোট একটি চিঠি পেলাম। তাতে জানলাম, আবার তার ভবঘুরে জীবন শুরু হয়েছে এবং কিছুদিনের জন্যে তার কোন স্থায়ী ঠিকানা থাকবে না। এবার সে যাচ্ছে কাশ্মীর,—সেখান থেকে 'আরও পূর্বে'।—তাতে এতটুকু বিস্মিত হলাম না।

এক

মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ—

অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। বাসকুলের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে পূর্বব্যবস্থামত পেশোয়ার থেকে কয়েকটি বিমান এসে পৌঁছল। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় আশি এবং সৈন্যবাহী বিমানগুলি নিরাপদে তাদের প্রায় সকলকেই পেশোয়ারে সরিয়ে নিয়ে গেল।

বিভিন্ন জাতের আরও কতকগুলি বিমান একাজে নিযুক্ত ছিল। তাদের একটি ছিল চণ্ডপুরের মহারাজার। সেটি ক্যাবিন বিমান।

সেই বিমানটিতে সকাল প্রায় দশটার সময় চারজন আরোহী—পূর্বধর্ম প্রচার পরিষদের মিস রবার্ট ব্রিনক্‌লো, একজন আমেরিকান নাগরিক হেনরি ডি বারণার্ড, মাননীয় রাজদূত হিউগ কনওয়ে ও তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন চার্লস ম্যালিনসন—আরোহণ করল।

এই নামগুলি ভারতীয় ও ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলিতে পরে প্রকাশিত হয়।

কনওয়ের বয়স সাঁইতিরিশ। দীর্ঘ ঋজু দেহ, কড়া পিঙ্গলবর্ণ গায়ের রং, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা—চোখদুটি গাড় নীলাভ। না হাসলে (সে হাসে কম) তাকে ভয়ানক গম্ভীর ও চিন্তামগ্ন দেখায়; হাসলে চোখে-মুখে ফুটে উঠে ছেলেমানুষি। বাঁ চোখের কাছে ছোট একটি পৈশিক কুঞ্চন—খুব বেশি পরিশ্রম করলে বা মদ খেলে সেটি সহজে নজরে পড়ে। বিমানে যখন সে উঠল তখন পৈশিক কুঞ্চনটি খুবই প্রকট, কেন না ইভাকুয়েশনের ঠিক আগে পুরো একটি দিন ও একটি রাত সর্বক্ষণ তাকে দলিল দস্তাবেজ বাকস-বন্দী করতে হয়েছে কিংবা নষ্ট করে ফেলতে হয়েছে। বিমানে যখন সে উঠল তখন সে অসম্ভব ক্লান্ত। ভিড়ঠাসা সেনাবাহী বিমানের বদলে মহারাজার শৌখিন বিমানটিতে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারায় এখন সে বেশ খুশীই হয়।

বিমান শূন্যে পাড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে একটা ছোট আসনে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে বসল। কঠিন ক্লেশ সহ্য করার ক্ষতিপূরক হিসেবে যারা ছোটখাট আরাম প্রত্যাশা করে কনওয়ে তাদেরই একজন। সে দুর্গম পথের সব কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করে সমরখন্দ যাবে কিন্তু লণ্ডন হতে প্যারি যেতে হলে সিলভার এ্যরোর জন্যে শেষ নোটখানিও বিনাদ্বিধায় ব্যয় করে বসবে।

শূন্যপথে ঘণ্টাখানেক যাবার পর ম্যালিনসন বলল, মনে হচ্ছে পাইলট যেন ঠিক রাস্তায় যাচ্ছে না। সামনের দিকে সে বসেছিল। বয়স তিরিশের কম, গালদুটি লালচে, বুদ্ধিমান কিন্তু প্রজ্ঞাবান নয়, শিক্ষা সাধারণ স্কুলেই সীমাবদ্ধ—অবশ্য তার ভালটুকু সব পেয়েছে। একটি পরীক্ষায় সফল না হওয়াই তার বাসকুলে আসার প্রধান কারণ। আসার পর প্রায় ছটি মাস কেটে গিয়েছে—এই ছ'মাসে তাকে কনওয়ের ভালই লেগেছে।

চলন্ত বিমানে কথাবার্তা বলা কিছুটা কষ্টসাধ্য, কনওয়ে সে-কষ্টটুকু সইতে রাজি নয়। ঘুমজড়ান চোখদুটি বারেকের জন্যে খুলে বলল সে, বিমান যে-পথেই চলুক না, পাইলট তা ভালই জানে।

আধঘণ্টা পরে—

বিমানের একটানা আওয়াজে আর ক্লান্তিতে কনওয়ের তখন বেশ ঘুম ধরেছে, হঠাৎ ম্যালিনসন বাধা দিল। বলল, কনওয়ে, আমি ভেবেছিলাম ফেনার বিমান চালাচ্ছে—

কেন, সে নয়?

এইমাত্তর পাইলট এদিক পানে ফিরেছিল, আমি শপথ করে বলতে পারি ও কিছুতেই ফেনার নয়।

কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে লোক চেনা শক্ত—

যেভাবেই দেখি না কেন, ফেনারকে চিনতে আমার ভুল হবে না।

কিন্তু তাতেই বা হয়েছে কি! ফেনারের বদলে না হয় আর কেউই হলো।

কিন্তু ফেনার যে আমায় বলেছিল সে ই আমাদের নিয়ে যাবে।

কর্তাদের শেষ কালে হয়তো মতের পরিবর্তন হয়েছে। সে হয়তো অন্য কোন বিমান নিয়ে গিয়েছে।

তাহলে ও কে ?

কী আশ্চর্য, তা আমি কী করে জানব ? তুমি কি বলতে চাও, এয়ার-ফোর্সের প্রত্যেকটি পাইলটের মুখ আমার মুখস্ত ?

তাদের অনেককেই আমি চিনি, কিন্তু ওকে দেখেছি বলেও মনে হয় না।

তাহলে যাদের তুমি চেন না ও তাদেরই একজন।—একটু হেসে কনওয়ে বলল আর একটু পরেই তো পেশোয়ারে পৌচচ্ছি তখন তুমি যত খুশি ওর পরিচয় নিও।

কোনদিন পেশোয়ারে পৌছব কিনা সন্দেহ রয়েছে। পাইলট অনেক আগেই রাস্তা গোলমাল করে ফেলেছে—শুধু তাই নয়, এত উঁচুতে উঠেছে যে কোথা দিয়ে চলেছে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

কিন্তু কনওয়ের এতটুকু ভাবনা হয় না। আকাশ ভ্রমণে সে অভ্যস্ত—কাজেই কোন কিছুই তাকে ভাবিয়ে তুলতে পারে না। তাছাড়া পেশোয়ারে পৌছে তার বিশেষ কিছু করারও নেই, আর বিশেষ কাউকে দেখার জন্যে সে অধীরও হয়ে ওঠেনি, কাজেই···পৌছতে চারঘণ্টাই লাগুক আর ছ'ঘণ্টাই লাগুক তার কাছে দুই-ই সমান। অবিবাহিত সে ; তার পথ চেয়ে কেউই ব্যাকুল প্রতীক্ষায় নেই। বন্ধুবান্ধব অবশ্য রয়েছে, তারা হয়তো তাকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে বড়জোর একটা খানাপিনার ব্যবস্থা করবে। সেটাও অবশ্য কম লোভনীয় নয়, কিন্তু তাই ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবার কথা নয়।

তেমনি গত দশটি বছরের কথা ভেবেও সে আকুল হয়ে ওঠে না। সে কটি বছরের স্মৃতি মধুর হলেও তাকে খুশী করার মত কিছু নয়। কত জায়গায়-না সে ঘুরেছে—বাসকুল, পেকিন, ম্যাকাও, আরও কত জায়গা। পরিবর্তনের

পর পরিবর্তন; কিছুটা বিরাম, কোন স্থিতি নেই—এই তো তার জীবন, শুধু তার কেন গোটা পৃথিবীরই গত ক'বছরের এই ইতিহাস।—সবার শেষে মনে পড়ে তার অক্সফোর্ডের কথা। দুটি বছর সেখানে তার কেটেছে প্রাচ্য ইতিহাসের বক্তৃতা দিয়ে, রোদেভরা লাইব্রেরি ধুলো খেয়ে। সেদিনগুলি আজও তাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু তার মনে আলোড়ন জাগাতে পারে না। তার শুধু মনে হয় সে যা হতে পারত তার কতটুকু সে!

হঠাৎ সে বুঝতে পারল বিমান নামতে শুরু করেছে। ম্যালিনসনকে একটু রাগাবার ইচ্ছে হয় তার, কিন্তু তার আগেই ম্যালিনসন হঠাৎ এমন লাফিয়ে উঠল যে ছাদে তার মাথা ঠুকে গেল; বারণার্ড সরু গ্যাংওয়ের পাশে নিজের জায়গায় বসে ঢুলছিল,—মাথাঠোকার শব্দে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল।

ম্যালিনসন জানালা দিয়ে একবার নীচের দিকে তাকিয়েই চিৎকার করে উঠল, ওই দেখ, একবার নীচে।

কনওয়ে দেখল। যে দৃশ্য দেখল তা দেখার আশা সে মোটেই করেনি,—অবশ্য যদি সত্যিই সে কোন আশা করে থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জ্যামিতিক পরিমাপে তৈরি ক্যাণ্টনমেণ্ট, আর লম্বা লম্বা হ্যাঙারের বদলে কুয়াশার ঘন আবরণতলে দেখা যায় জনমানবশূন্য রোদেপোড়া বিরাট এক প্রান্তর। বিমান বিপুলবেগে নামছিল, কিন্তু তখনও সাধারণ বিমানের পক্ষে অনেক উঁচুতে। বিরাট উপত্যকার অস্পষ্টতার মাঝে দেখা যায় তরঙ্গায়িত পর্বতমালা মাইলের পর মাইল চলে গিয়েছে—খাঁটি সীমান্তপ্রদেশের দৃশ্য। কনওয়ে এত উঁচু থেকে কখনও সীমান্ত দৃশ্য দেখেনি, তাহলেও তার ভুল হয় না। শুধু তাই নয়, এটুকুও সে বুঝতে পারে, সে-দৃশ্য পেশোয়ারের কাছাকাছি কোথাকার নয়। যতই সে তা দেখে ততই অসোয়াস্তি ধরে। শেষে বলল, কিছুই আমি চিনতে পারছি না।—পাছে আর সকলে ভয় পায় সেইজন্যে ম্যালিনসনকে চুপি চুপি বলল, তোমার কথাই হয়তো ঠিক—পাইলট রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।

বিমান তখন প্রচণ্ডগতিতে নামছে। বাতাস গরম হয়ে উঠল, নীচেকার তপ্ত পৃথিবীকে মনে হয় যেন মুক্তদ্বার একটা জলন্ত অগ্নিকুণ্ড। দিগ্‌রেখার ওপর এক একটি পর্বতশিখর ছায়াময় বিভীষিকার মতন জেগে ওঠে... ... বিমান তখন একটি বক্র উপত্যকা ধরে ছুটে চলেছে। উপত্যকাময় বড় বড় পাথর ছড়ান, শুষ্ক নদীগর্ভে ধ্বংসস্তূপ। মাঝে মাঝে বায়ুমণ্ডলের শূন্যতায় পড়ে বিমানটির দশা হয় স্রোতের মুখে একখণ্ড তৃণের মত,—এমনভাবে বিমানটি উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে যে, তার চারজন আরোহী প্রাণপণে আসনগুলি আঁকড়ে ধরে থাকে।

ভগ্নকণ্ঠে বারণার্ড চিৎকার করে উঠল, পাইলট দেখছি এইখানেই নামতে চায়—

অসম্ভব।—সংগে সংগে ম্যালিনসন বলে উঠল, তাই যদি ওর ইচ্ছা হয় তাহলে বুঝতে হবে ও বদ্ধ পাগল। এখানে নামা মানেই চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া--

কিন্তু পাইলট সেখানেই নামল। একটি খাদের পাশে খানিকটা পরিষ্কার জায়গা দেখে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সংগে বিমানটিকে সেইখানেই নামাল। বার-কতক প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে বিমানটি স্থির হয়ে গেল। তারপর যা ঘটল তাতে তাদের আশাভরসা লোপ পেল: দাড়িওলা মাথায় পাগড়িবাঁধা দলে দলে উপজাতীয় লোক চারিদিক হতে এসে বিমানটিকে ঘিরে দাঁড়াল। এবং পাইলট ছাড়া আর কাউকে বিমান থেকে নামতে দিল না। পাইলট নেমে দেশীয় ভাষায় উত্তেজিতকণ্ঠে তাদের সংগে কী সব কথা কইতে লাগল। তখন স্পষ্ট দেখা গেল, পাইলট ফেনার তো নয়ই, এমন কি কোন য়ুরোপীয়ও নয়। ইতিমধ্যে একদল উপজাতি কাছাকাছি কোন গুদাম হতে টিন টিন পেট্রল নিয়ে বিমানের বিরাট ট্যাঙ্কটি ভর্তি করতে লাগল। আরেকদল রইল আরোহীদের পাহারায়। অসহায় বন্দী চারজনের হাজার অনুনয়ে তাদের কাছ থেকে উত্তর এলো শুধু অবজ্ঞার হাসি আর উপেক্ষার নীরবতা। নামবার এতটুকু চেষ্টা করতেই এক ঝাঁক রাইফেল এগিয়ে এলো। কনওয়ে কিছুটা

পস্তু ভাষা জানত, তারই সাহায্যে যতটা পারে সে নিজেদের কথা বোঝাবার চেষ্টা করে; কিন্তু কোন ফলই হলো না। আর পাইলটকে যে কোন ভাষায় যে কোন প্রশ্ন করলে সে উত্তরে রীতিমত অর্থপূর্ণ ভংগিতে রিভলবারটি শুধু দেখিয়ে দেয়। দুপুরের প্রচণ্ড রোদ্দুরে বিমানের ছাদটি আগুনের মত তেতে উঠেছে তখন, ভেতরের বাতাসও এমনই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যে তাদের মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। কিন্তু সম্পূর্ণ শক্তিহীন তারা, ইভাক্যুয়েশনের শর্ত অনুসারে তারা কোন অস্ত্রই সংগে আনতে পারে নি।

পেট্রল ভরা শেষ হলে একজন এক টিন ঈষদুষ্ণ জল জানালা গলিয়ে তাদের পান করতে দিল। কিন্তু কোন প্রশ্নের জবাব তারা দিল না, অথচ তাদের ব্যক্তিকভাবে ঠিক শত্রু বলেও মনে হলো না। আরও কিছুক্ষণ আলাপ করার পর পাইলট বিমানে উঠে বসল······একজন পাঠান অপটুহাতে প্রপেলারটা ঘুরিয়ে দিল······আবার যাত্রা শুরু হলো......

সেই স্বল্পপরিসর জায়গাটিতে নামার চাইতে সেখান থেকে অত পেট্রল নিয়ে ওঠা আরও শক্ত—কিন্তু পাইলটের নৈপুণ্যে এতটুকু অসুবিধা হলো না। কুয়াশার রাজ্যে পৌঁছে বিমানটি এবার পূর্বদিকে চলল,—যেন সেইটিই তার পথ। তখন মধ্য-অপরাহ্ণ।

কী অভূতপূর্ব আশ্চর্য ঘটনা! শীতল বাতাসের স্পর্শ পেয়ে সুস্থ হতে তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে, সত্যিই এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। অশান্ত সীমান্তপ্রদেশের ইতিহাসে ঠিক এ ধরণের কোন ঘটনার নজির নেই। যদি তারা নিজেরা এ ঘটনার সংগে জড়িত না হতো তাহলে তারা কিছুতেই এসব বিশ্বাস করত না। যাই হোক, উত্তেজনার প্রাবল্য কমার পর ঘটনাটির সম্ভাব্য কারণ অনুমানের পালা শুরু হলো। ম্যালিনসন একটি সিদ্ধান্ত খাড়া করল যেটা পরিত্যার্জ্য বলে মনে হলো না। সে বলল, আমি নিঃসন্দেহ যে, দুর্বৃত্তদল আমাদের গুম করে রেখে একটা মোটা রকমের মুক্তিমূল্য আদায় করতে চায়। সীমান্তের ইতিহাসে এ-ব্যাপার নতুন কিছু

নয়, তবে তারা যে উপায়টি অবলম্বন করেছে সেটিতে অভিনবত্ব আছে। যোটের ওপর ভয় পাবার কিছু নেই, মানুষগুম আগে অনেক হয়েছে ; এবং শেষঅবধি বন্দীদের বেশির ভাগই মুক্তি পেয়েছে। এরা করবে কি, পাহাড়-পর্বতের কোন গুহায় আমাদের লুকিয়ে রেখে গভর্ণমেণ্টের কাছে মুক্তিপণ দাবি করবে,—তারপর টাকা পেলেই ছেড়ে দেবে। সেই সময়টুকু ব্যবহার যে খুব খারাপ করবে তা নয়। তবে টাকাটা যখন নিজের নয় তখন কিছু-দিনের ভোগান্তি আছে বইকি। টাকা দেবার পর হয়তো গভর্ণমেণ্ট একদল বোমারু বিমান পাঠাবে, এবং আমরা বাকী জীবনে একটি লোমহর্ষক গল্প বলার সুযোগ পাব।

ম্যালিনসনের কথায় যেন দুর্বলতার একটা ছোঁয়াচ থাকে।

বাধা দিয়ে আমেরিকাবাসী বারণার্ড রসিকতার সুরে বলল, মাপ করবেন, একটা কথা না বলে পারছি না। আপনাদের বিমানবহরের জন্যে আপনারা যতই গৌরব বোধ করুন না কেন, আমি তাকে খুব প্রশংসা করতে পারছি না। আপনারা শিকাগোর রাহাজানি নিয়ে কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন কিন্তু এমন ঘটনা দেখান তো দেখি, যেখানে দুর্বৃত্ত আরোহীশুদ্ধু বিমান নিয়ে পালিয়েছে।—একটা হাই তুলে বলল সে, কিন্তু কথা হচ্ছে—আসল পাইলটকে নিয়ে এ-হতভাগা কী করলে ? বস্তাবন্দী করে রেখে এসেছে নিশ্চয়।

বারণার্ডের দেহটি বিপুল মাংসল, মুখে কঠিন অভিজ্ঞতার ছাপ, অথচ কেমন একটা হাসিখুশী ভাব যেটা নৈরাশ্যবোধ দ্বারা চিহ্নিত হয়নি। বাসকুলে কেউই তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না। তবে শোনা যায়, বাসকুলে আসার আগে পারস্যে তেলের ব্যাপারে কী যেন করত সে।

কনওয়ে তখন ভারি ব্যস্ত। তাদের সংগে যত কিছু কাগজ ছিল সব একজায়গায় জড়ো করে তাতে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় নিজেদের বিপদের কথা লিখে বিমান থেকে ফেলে দিচ্ছিল। এরকম জনবিরল অংশে তাতে বিশেষ কোন কাজ হবার আশা ছিল না, তবুও চেষ্টা করতে ক্ষতি কী।

চতুর্থ আরোহী ব্রিন্‌কলো সেই-যে নিজের আসনে খাড়া হয়ে বসেছে তার পর থেকে এপর্য্যন্ত এদের কথায় মন্তব্য করেছে দু'একটি, অভিযোগ জানায়নি কিছুই। শক্ত-সমর্থ ছোটখাটো মানুষটি যেন বাধ্য হয়ে এমন একটি পার্টিতে যোগ দিয়েছে যেখানকার অদ্ভুত কর্মধারায় তার তেমন সমর্থন নেই।

বারণার্ড আর ম্যালিন্‌সনের আলোচনায় কনওয়ে বিশেষ যোগ দিতে পারছিল না, কেন না তাদের বিপদের কথা দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করতে খুব বেশি একাগ্র হতে হয়েছিল। অবশ্য কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে উত্তর সে দিচ্ছিল। ম্যালিনসনের সিদ্ধান্ত আপাতত তার মনে ধরেছিল, আবার বিমান বহর সম্বন্ধে বার্ণাডের মন্তব্য সম্পর্কে একমত হয়েছিল। সে বলল, ঘটনাটা কী ভাবে ঘটতে পারে তা বোঝা হয়তো অসম্ভব নয়। বাসকুলে তখন বেজায় উত্তেজনা, সে অবস্থায় বিমানীর পোশাকে সব মানুষকেই প্রায় সমান দেখাই স্বাভাবিক। ধরুন, যদি কেউ বিমানীর ঠিক পোশাকটি পরে, ঠিকমতন তার কাজ করে যেতে পারে তাহলে কেউ কি তাকে অবিশ্বাস করবে? আমাদের এই পাইলটটি বিমানীর খুঁটি-নাটি সব কিছু জানে; এবং বিমান-চালনাতেও যে খুবই নিপুণ তা তো দেখাই যাচ্ছে। তবু আমি আপনার সংগে একমত যে ব্যাপারটা এমনই যার জন্যে কেউ না কেউ দায়ী। এবং জানবেন একজন দোষী সাব্যস্ত হবেই, তবে সে দোষ তার প্রাপ্য কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।

সত্যি মশাই, আপনি যে ভাবে প্রশ্নোটির দুটো দিক বিচার করে দেখলেন তাতে আপনার প্রশংসা না করে পারছি না—বারণার্ড বলে উঠল, যখন আপনাকে বিমানে নিয়ে উধাও হচ্ছে তখনও ঐভাবে ভাবতে পারা প্রশংসনীয় নিশ্চয়।

কনওয়ে একটু হাসল, কিন্তু আর কোন কথা বলল না। ভাবল, আঘাত না দিয়ে মুরুব্বির চালে কথা বলতে আমেরিকানরা ভারি পটু।

আর কিছু ভাবার মতন অবস্থা তখন তার নয়, এতই ক্লান্ত সে। বিকেলের

দিকে ম্যালিনসন আর বারণার্ড তর্ক করতে করতে কী একটা বিষয়ে তার মতামত জানতে গিয়ে দেখে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ম্যালিনসন বলল, ভীষণ ক্লান্ত, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমি তো জানি গত কয়েকটি সপ্তাহ কী ভাবে কেটেছে।

আপনি ওঁর বন্ধু ?—বারণার্ড জিজ্ঞাসা করল।

কনস্যুলেটে ওঁর সংগেই কাজ করতাম। গত চার দিন উনি দু'চোখের দু পাতা এক করেননি। সত্যি কথা বলতে কি, এরকম বিপদে ওঁকে সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা। অনেকগুলো ভাষা তো জানেনই, তাছাড়া লোকের সংগে মেশার অদ্ভুত ক্ষমতা ওঁর। এই বিপদ থেকে কেউ যদি আমাদের উদ্ধার করতে পারে তো উনিই পারবেন। ও রকম ঠাণ্ডা মাথার মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি।

তাহলে উনি কিছুক্ষণ ঘুমোন, বারণার্ড বলল।

স্বল্পবাক মিস ব্রিনকলো মন্তব্য করল, ওঁকে দেখে খুব সাহসী মনে হয়।

কিন্তু কনওয়ে খুব সাহসী কিনা সে বিষয়ে তার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সত্যিই সে ঘুমোচ্ছিল না, শারীরিক ক্লান্তিতে চোখ দুটি বুজে শুয়ে ছিল। সে সব কিছুই শুনতে পাচ্ছিল, বিমানের গতি পর্যন্ত অনুভব করছিল। ম্যালিন-সনের প্রশংসাবাদ তার কানে গিয়েছিল। তার কথাগুলি নিছক স্তুতি না হলেও সবটুকু গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। সে অভিজ্ঞতা থেকে জানে, বিপদের জন্যেই যারা বিপদ ভালবাসে তাদের দলে সে নয়। অবশ্য বিপদের একটা দিক সে উপভোগই করেছে—মনের রুদ্ধ আবেগ বিপদের উত্তেজনার ভেতর দিয়ে নির্মুক্ত হয়েছে। তাই বলে জীবনের ঝুঁকি নেবার বাসনা তার হয়নি। বারোবছর আগে ফ্রান্সে থাকার সময় পরিখা-যুদ্ধ সে ঘৃণা করতে শুরু করেছে, এবং বহুবার সে মৃত্যু এড়িয়ে গেছে অসাধ্য সাধনে বীরত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা না করে। এমন কি সে যে ডি, এস, ও, পেয়েছিল তা শারীরিক সাহস প্রদর্শনের

জন্ম নয়। অদ্ভুত সহ্য-শক্তি দেখানর জন্যে। তাই যুদ্ধের পর থেকে তার বিপদের সম্মুখীন হওয়ার স্পৃহা কমেই এসেছে,—অবশ্য উত্তেজনার সম্ভাবনা যেখানে প্রবল সেখানে অন্যকথা।

চোখ বুঝেই শুয়ে রইল সে। ম্যালিনসন যা বলল তাতে সে একটু ভীত হয়। এমনি তার বরাত, লোকে তার মানসিক স্থৈর্যকে সাহস বলে ভুল করে, সে জানে তার মানসিক স্থৈর্যে পৌরুষের চাইতে আছে নিস্পৃহ ভাব। বিশ্রী একটা অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের, তা নিয়ে তার বীরপনা জেগে উঠছে না, বরং কত দুর্ভোগ যে বরাতে রয়েছে তাই ভাবতে তার বিরক্তি লাগছে। তাদের সঙ্গে মিস ব্রিনক্লো রয়েছে। সে স্ত্রীলোক, তার দাবি সকলের সমবেত দাবিরও আগে, ভবিষ্যতে হয়তো এমনই অবস্থার উদ্ভব হবে যখন এই কথা ভেবে তাকে কাজ করতে হবে। এই ধরণের অসম ব্যবহার যেখানে অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় সেখানে সে বড় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

যাই হোক, তার বাহ্যিক জাগরণের পর প্রথমেই সে কথা বলল—মিস ব্রিনক্লোর সঙ্গে। সে দেখতে পেল মিস ব্রিনক্লো যুবতীও নয় সুন্দরীও নয়।—সামনে যে-ধরণের বিপদ তাতে রূপ গুণ না থাকাটাই সুবিধের। তার জন্যে আরও একটি কারণে তার দুঃখ হয়—তার সন্দেহ হয় ম্যালিনসন বা বারণার্ড কেউই ধর্ম্মপ্রচারকদের, বিশেষ করে মহিলা প্রচারকদের দেখতে পারে না। তার অবশ্য ওসব বালাই নেই, তবে তার ভয় হয়, মিস ব্রিনক্লো হয়তো তার খোলা মনকে সহজভাবে নিতে পারবে না, এক হিসেবে সেটা আরও বিশ্রী। মিস ব্রিনক্লোর কানের কাছে ঝুঁকে পড়ে কনওয়ে বলল, মনে হচ্ছে বেশ একটু ঝঞ্ঝাটে পড়া গেছে। কিন্তু, আপনি বিচলিত হননি দেখে আমি খুব আনন্দিত। অবশ্য ভয়ানক কিছু একটা ঘটবে বলে আমার মনে হয় না।—

সেটা নির্ভর করছে আপনার ওপর।—উত্তরে মিস ব্রিনক্লো বলল; কিন্তু কনওয়ে তাতে সান্ত্বনা পেল না।

বলল সে, আপনার কিছু অসুবিধা হলে জানাবেন, যতদূর সম্ভব আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের—

স্বাচ্ছন্দ্য!—কথাটি কানে যেতেই বারণার্ড প্রতধ্বনি তুলে বলে উঠল, এমন আরামে রয়েছি আমরা! অভাব শুধু একজোড়া তাসের—নইলে চার-জনে এতক্ষণে এক হাত ব্রিজ খেলা যেত।

কনওয়ে ব্রিজ পছন্দ করে না, কিন্তু বারণার্ডের মন্তব্য তার ভালই লাগল। হাসতে হাসতে বলল সে, কিন্তু মিস ব্রিনক্লো বোধ হয় তাস খেলেন না।

কেন খেলব না!—সংগে সংগে মিস ব্রিনক্লো এদিক ফিরে বলল, তাস খেলার ভেতর আমি অন্যায় কিছু দেখি না, আর কই বাইবেলেও তো তেমন কিছু নেই।

তার কথায় সকলে হেসে উঠল।

কনওয়েও কিছুটা আশ্বস্ত হলো,—যাক, মিস ব্রিনক্লো তাহলে বিকারগ্রস্ত নয়।

•

উচ্চ বায়ুমণ্ডলের পাতলা কুয়াশা জালের মধ্য দিয়ে বিমানটি সারা বিকেল ছুটে চলল। এত উঁচু দিয়ে যায় যে, নীচের কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। মাঝে মাঝে, বহুক্ষণ অন্তর, হয়তো পলকের জন্যে কুয়াশার আবরণ সরে যায় আর তারই ফাঁকে নীচে জেগে ওঠে কোন বন্ধুর পর্বতশিখর, বা কোন অজানা পার্বত্য নদীর ঝলকানি। সূর্যের অবস্থান থেকে মোটামুটি অনুমান করা যায় বিমান কোনদিকে চলেছে। পূর্বাভিমুখে, অবশ্য মাঝে-মাঝে কয়েকবার উত্তরে বাঁক নিয়েছে। কিন্তু কতদূর এসেছে তা জানতে হলে আগে জানতে হবে বিমানের গতিবেগের হিসাব। নির্ভুলভাবে সে হিসাব করা কনওয়ের পক্ষে অসম্ভব। তবে এটুকু বলা যায় যে, বিমানটি ইতিমধ্যে অনেক পেট্রল পুড়িয়েছে, কিন্তু সে হিসাবও নির্ভর করে কতকগুলি অনিশ্চিত বিষয়ের ওপর। আর বিমান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কনওয়ের কোন জ্ঞানই নেই, তবে এটুকু সে

নিশ্চিত করে বলতে পারে যে তাদের বিমানীটি বিমানচালনায় অতি দক্ষ। প্রস্তরাকীর্ণ সেই প্রান্তরে বিমান নামান এবং তারপরে আরও কতকগুলি ছোটপাট ঘটনা থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্যের অকপট মর্যাদা দিতে কনওয়ে ইতস্তত করে না। কিন্তু তার সংগীরা তার ভাবগ্রাহী হবে বলে মনে করে না। তার চাইতে তাদের চঞ্চল হয়ে ওঠার যে অনেক বেশি ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে—সে তা জানে। যেমন, ম্যালিনসনের বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে রয়েছে, ইংলণ্ডে পৌছলেই হবে; বারণাড'ও হয়তো বিবাহিত; মিস ব্রিনক্লোর কাজকর্ম রয়েছে। ম্যালিনসনই বেশি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে; এবং যত সময় এগিয়ে চলে সেও তত অস্থির হয়ে ওঠে; এমন কি একটু আগে কনওয়ের যে ধৈর্যের প্রশংসা সে করছিল, সে তারও বিরুদ্ধে অনুযোগ করতে থাকে। একবার বিমানের গর্জনধ্বনি ছাপিয়ে জেগে ওঠে ম্যালিনসনের ক্রুদ্ধ স্বর, শোন কনওয়ে, ওই পাগল বিমানীটা ওর যা খুশি করে যাবে, আর আমরা এখানে বসে বসে আঙুল কামড়াব? অসহ্য। সামান্য একটা কাঁচের জানালা ভেঙে ফেলে কি ওর সংগে বোঝাপড়া করা যায় না?

খুব যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ও সশস্ত্র আর আমাদের কাছে কিছুই নেই। তাছাড়া আমাদের ভেতর কেউই প্লেনটাকে মাটিতে নামাতে পারবে না—

সেটা খুব শক্ত কাজ নয়। সে তুমিই পারবে—

কী আশ্চর্য ম্যালিনসন, যা কিছু অলৌকিক কাজ আমায় করতে হবে?

সত্যি কনওয়ে আমার এমন বিশ্রী লাগছে। ওকে কি কিছুতেই কায়দা করা যায় না?

বেশ, বল কী করে করবে।

ম্যালিনসন ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। বলল, এই তো মাত্র ছ ফিট দূরে ও রয়েছে, কেমন কিনা? তারপর ও একা, আমরা তিনজন। তা

সত্ত্বেও আমরা শুধু হাঁ করে ওর পিঠের দিকে চেয়ে বসে থাকব? অন্ততঃ আমাদের নিয়ে ও কী করতে চায়, সেটুকু তো জানতে পারি?

বেশ চেষ্টা করে দেখা যাক।—ককপিট আর ক্যাবিনের মাঝে পার্টিশনটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল কনওয়ে। তার একটু উঁচুতে ছ'ইঞ্চি লম্বা চওড়া একটা কাঁচের জানালা। দরকার পড়লে সেই কাঁচের জানালায় মুখ দিয়ে পাইলট আরোহীদের সংগে কথা বলে। কনওয়ে তার ওপর কয়েকটি টোকা মারল। যে উত্তরটি সে আশা করিয়াছিল তাই পেল। কাঁচের জানালাটি একপাশে সরে গেল, কোন কথাবার্তা নয়—সেখানে জেগে উঠল শুধু একটি পিস্তলের নল। কনওয়ে কিছু না বলে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এলো। জানালাটি আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ম্যালিনসন গোড়া থেকে সবই লক্ষ্য করে, কিন্তু তাতে তার সুর বদলায় না। সে বলল, ও কেবল ভয় দেখাচ্ছে, গুলি করার সাহস ওর হবে না।

তা হতে পারে।—কনওয়ে সায় দিয়ে বলল, কিন্তু সেটা জানার ভার আমি তোমার ওপরেই দিলাম।

নিরীহের মতন ওর কাছে নতি স্বীকার করার আগে আমাদের একটা কিছু করা উচিত।

তার জন্যে কনওয়ের মনে সহানুভূতি জাগে। ইংরেজ কাকেও ভয় করে না, কখনও আত্মসমর্পণ করে না, কখনও পরাজিত হয় না—স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের এই সব উক্তিগুলির প্রভাব সে উপেক্ষা করতে পারে না। বলল সে, জয়ের আশা যেখানে খুবই কম সেখানে যুদ্ধ করার আমি কোন মানে বুঝি না, সে ধরণের বীর আমি নই।

ঠিক বলেছেন।—বারণার্ড বলে উঠল, যখন নাচার হাসিমুখে মেনে নেওয়াই ভাল। আমি তো মশাই, যতক্ষণ বাঁচব আর একটিও সিগার থাকবে ততক্ষণ জীবনকে ভোগ করতে পেছ-পা হব না।—আশা করি আমার জন্য আপনাদের

যদি আরেকটু বিপদ বাড়ে তাহলে কিছু মনে করবেন না,—মানে আমি যদি একটি সিগার—

আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, তবে তাতে মিস ব্রিনক্লোর অসুবিধা হতে পারে—

বার্ণার্ড সংগে সংগে শুধরে নিয়ে বলল, মাপ করবেন, মিস ব্রিনক্লো, আপনার কি কোন অসুবিধা হবে?

মোটেই না।—ব্রিনক্লো সদয়কণ্ঠে বলল, আমি নিজে ধুমপান করি না বটে কিন্তু সিগারের গন্ধ আমার খুব ভাল লাগে।

ম্যালিনসন তখন কিছুটা শান্ত হয়েছে। কনওয়ে তাকে একটি সিগারেট দিয়ে যেন বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিল, কিন্তু নিজে ধরাল না। তারপর বলল, তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি—ম্যালিনসন। আমরা খুবই বিশ্রি অবস্থায় পড়েছি, এক দিক থেকে আরও বিশ্রি, কেননা আমাদের বিশেষ কিছু করবার নেই। এবং আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভালই হয়েছে,—একথাগুলি অবশ্য কনওয়ে নিজের মনে বলল, কেন না তখনও সে ভয়ানক পরিশ্রান্ত। তার প্রকৃতি এমনই অদ্ভুত যে অনেকে বলে সে অলস; কিন্তু সত্যিই সে তা নয়। প্রয়োজন হলে তার মতন কঠিন পরিশ্রম করতে বা সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে খুব কম লোকেই পারে। তবে একটা কথা, কাজের নেশা বলতে যা বোঝায় তা তার নেই, দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে সে খুশী হয়ে ওঠে না। তার চাকরি-জীবনে কিন্তু এই দুটিই ছিল প্রধান,—এবং সে খুব ভাল ভাবে তার কাজ করে এসেছে, কিন্তু তার মত বা তার চাইতে যোগ্য ব্যক্তির ওপর সব কিছু ভার ছেড়ে দিতে সে সব সময় প্রস্তুত। এই কারণেই মনে হয় চাকরিজীবনে তার সাফল্য লোকের চোখে তেমন ধরা পড়েনি। . .

ক্লান্তি তার তখনও কাটেনি, তাছাড়া করবারও কিছু ছিল না, কনওয়ে আসনে সমস্ত শরীরটা ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল। এবার সে কিছুক্ষণের মধ্যে

সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতে উঠে দেখল সব দুশ্চিন্তা ভেদ করে সকলে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছে।

মিস ব্রিন্‌কলো খাড়া হয়ে বসে চোখদুটি বুজে রয়েছে—দেখে মনে হয় যেন মান্ধাতার আমলের একটি বিবর্ণ প্রতিমা; ম্যালিনসন হাতের তালুতে চিবুক ন্যস্ত করে কাত হয়ে পড়েছে, আর বারণার্ড রীতিমত নাক ডাকাচ্ছে। কনওয়ে ভাবে, যাক এদের তাহলে সুবুদ্ধি হয়েছে। মিছিমিছি চেঁচিয়ে শরীরকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী! ঠিক সেই সময়—

হঠাৎ সারা শরীরে কেমন একটা অনুভূতি জাগে, কেমন যেন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, হৃৎপিণ্ড ঢিপ ঢিপ করতে থাকে, যেন কষ্ট করে জোরে শ্বাস নিতে হয়। মনে পড়ে তার এই রকম অবস্থা আগে একবার হয়েছিল—সুইজারল্যাণ্ডে আল্পস্ পর্বতে।

জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। চারদিকের আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। শেষ অপরাহ্ণের তরল আলোকে তার চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে উঠল তাতে তার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে। দূরে বহুদূরে দিগরেখায় থরে থরে সাজান তুষারাবৃত পর্বতের পর পর্বত, হিমবাহের শ্বেত মালিকা তাদের গলায়, আর বিরাট মেঘসমুদ্রে যেন তারা ভাসমান। অর্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত হয়ে তারা পশ্চিমে দিকচক্রবালের সাথে এক হয়ে মিশেছে। সেখানকার দৃশ্য আরও ভীষণ, রঙের আড়ম্বরে জাঁকাল হয়ে আরও ভয়ঙ্কর···যেন কোন অর্ধোন্মাদ প্রতিভার আঁকা একখানি ক্যানভাস। বিমানটি তখন এক অতলস্পর্শ খাদের ওপর দিয়ে একটি তুষার প্রাচীরের দিকে চলেছে। তুষার প্রাচীরটিকে আকাশেরই অংশ বলে মনে হয়, কিন্তু তার ওপর সূর্য্যের আলো পড়ে তার কী-রূপই হলো! যেন রঙের আগুন ধরল,—অত্যুজ্জ্বল দ্যুতিময় আলোকে চোখ যেন ঝলসে যায়......

কনওয়ের মনকে নাড়া দেওয়া বড় সহজ কথা নয়,—দৃশ্য দেখার বাতিক তার নেই। একবার দলে পড়ে গৌরীশৃঙ্গে সূর্যোদয় দেখার জন্যে সে

দার্জিলিঙের কাছে টাইগারহিলে গিয়েছিলে,—পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতটি দেখে সেদিন সে হতাশই হয়েছিল। কিন্তু জানালার বাইরে অদূরে ওই ভীতিকর দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের; এর কোথাও সাজান গোছানর ছোঁয়াচ নেই। উদ্ধত পর্বতশিখরগুলির সাথে কী যেন একটা বন্য হিংস্রতা মিশে রয়েছে,—এভাবে তাদের সান্নিধ্যে যাওয়া যেন ধৃষ্টতা। মনে মনে মানচিত্র হাতড়ে, দূরত্ব হিসাব করে, সময়ের এবং গতির মাপ করে কনওয়ে ভাবে—শুধু ভাবে। এমন সময় দেখে ম্যালিনসন কখন ঘুম ভেঙে উঠেছে। কনওয়ে তার হাত চেপে ধরল।

দুই

কনওয়ে কিন্তু কাকেও জাগাল না ;—সেইটেই তার বিশেষত্ব। শুধু তাই নয়, ঘুম ভাঙার পর তাদের বিস্ময়োক্তির উত্তরেও বিশেষ কিছু বলল না। পরে যখন আবার বারণার্ড তার মতামতের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল তখন এমন এক ভংগিতে সে কথা বলে গেল যে মনে হলো কোন অধ্যাপক এক জটিল সমস্যার বিশ্লেষণ করছেন। বলল, দেখুন যতদূর আমার মনে হয় তাতে এখনও আমরা ভারতবর্ষের ভেতরই রয়েছি। ক'ঘণ্টা আমাদের বিমানটি বরাবর পূর্বদিকে চলছে, কিন্তু এত উঁচু দিয়ে চলেছে যে নীচের কিছু দেখার উপায় নেই। তাহলেও আমার মনে হয়, বিমানটি কোন একটি নদীর উপত্যকা ধরেই এসেছে এবং সেই উপত্যকার বিস্তার পূর্ব-পশ্চিমে। খুব সম্ভব সেই উপত্যকাটি উধ্বর্তর সিন্ধুনদের। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের এতক্ষণে পৃথিবীর একটি অপূর্ব অংশে এসে উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক, এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা এসেছিও তাই।

বারণার্ড প্রশ্ন করল, কিন্তু কোথায় এসে পৌঁচেছি তা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

না—জীবনে কোনদিন আমি এদিকে আসিনি। তবে নাঙ্গা পর্বতের যে বর্ণনা শুনেছি তার সংগে ওই পাহাড়টি অবিকল মিলে যাচ্ছে। ওইটি নিশ্চয় নাঙ্গা পর্বত,—মামারি ওইখানেই প্রাণ হারান।

পাহাড়ে ওঠা আপনার অভ্যাস আছে নাকি ?

ছেলেবেলায় খুবই ছিল,—তবে কেবল সুইটজারলণ্ডের পাহাড়ে।

বিরক্তির সংগে ম্যালিনসন বলে উঠল, কী আশ্চর্য, ওসব ছেড়ে এখন ভাব কোথায় চলেছি আমরা। ভগবান, কেউ যদি তা বলে দিতে পারত !

আমার তো মনে হয়, আমরা ওই পর্বতমালার দিকেই চলেছি।—বারণার্ড বলল, তোমার কী মনে হয় কনওয়ে? কনওয়ে বললাম বলে কিছু মনে করো না যেন। যখন আমরা একই নৌকার যাত্রী তখন আর আদবকায়দা কেন?

কনওয়ে অবশ্য তার কথায় কিছুই মনে করেনি—কেউ তার নাম ধরে ডাকলে তাতে মনে করার কী-ই বা আছে। বলল হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, আমার মনে হয় ওই পর্বতমালাটি কারাকোরাম। আমাদের পাইলট যদি ওটি অতিক্রম করতে চায় তাহলে অবশ্য অনেকগুলি গিরিপথ আছে।

আমাদের পাইলট!—মানে, ওই পাগলটার কথা বলছ?—ম্যালিনসন বলল, আমার তো মনে হয় 'গুম' করার থিওরি আর খাটে না, কেন না, সীমান্ত প্রদেশের সীমানা আমরা বহুক্ষণ ছাড়িয়ে এসেছি, আর কাছাকাছি কোন উপজাতির বসতি আছে বলেও তো মনে হয় না। এখন তো একটি কথাই ভাবতে পারা যায়, এক বদ্ধ পাগলের পাল্লায় পড়েছি আমরা; পাগল নইলে এইরকম জায়গায় কেউ আসে?

কুশল বিমানী ছাড়া আর কেউ আসবে বলেই মনে হয় না, বারণার্ড বলল, দেখুন, ভূগোলে আমার কোনদিনই বিশেষ জ্ঞান নেই, তবুও এটুকু বলতে পারি যে, পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা হচ্ছে কারাকোরাম। এবং তাই যদি হয় তাহলে কারাকোরাম অতিক্রম করা দস্তুরমত বাহাদুরির কথা!

এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা।—অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে মিস ব্রিনক্‌লো বারণার্ডের কথায় জুড়ে দিল।

কনওয়ে কিছুই বলে না। সব কিছুর কারণ চাইতে গেলে ঈশ্বরের ইচ্ছা কিংবা মানুষের খেয়াল, এদুটির একটিকে বেছে নিতে হবে। সেই ভয়াবহ দৃশ্যের পটভূমিকায় সুশৃংখল ক্যাবিনটির কথা ভেবে তার মনে হয়, কিংবা এও তো হতে পারে—মানুষের ইচ্ছা কিংবা ঈশ্বরের খেয়াল। যে কারণটিই বেছে নেওয়া হোক-না কেন তাতে মনের সায় অবশ্যই থাকা চাই। বাইরের দিকে

তাকিয়ে এইসব কথাই ভাবছিল সে, হঠাৎ পর্বতমালাটির অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল। সারা পর্বতমালা নীল আলোয় ভরে গেল, আর তার নিম্নাংশে নীলাভ সেই আলোক-ছটা আরও ঘনীভূত হয়ে ধূমল হয়ে উঠল। তার স্বভাবসুলভ নিরাসক্ত মনে কী এক গভীর ভাবের উদয় হলো,—ঠিক উত্তেজনা নয়, আবার ভয়ও নয়, কেমন যেন একটা ব্যাকুল প্রতীক্ষা। বলল সে, বারণার্ড ঠিকই বলেছ তুমি, সব কিছু যেন আরও অপূর্ব হয়ে উঠছে।

ওসব কথা আমি বুঝি না, আর ও নিয়ে হৈ হৈ করারও কিছু দেখি না।—ম্যালিনসন বলল, জানি শুধু এখানে আসতে আমরা কেউই চাইনি—ভগবান জানেন ওখানে পৌছাবার পর আমাদের কপালে কি আছে। পাইলট তোমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে বলে কি তার এই ঔদ্ধত্য সহ্য করতে হবে। আর না হয় দক্ষ পাইলটই হলো, তাহলেও আমি ওকে পাগল ছাড়া কিছু বলব না। শুনেছি, একবার একজন পাইলট নাকি শূন্যপথে পাগল হয়ে গিয়েছিল, তোমাদের পাইলটটি গোড়া থেকেই পাগল।

কনওয়ে চুপ করেই রইল। বিমানের একটানা গর্জনধ্বনির মাঝে চিৎকার করতে তার আর ভাল লাগছিল না; তাছাড়া, কী হবে না হবে তাই নিয়ে তর্ক করেই-বা কী লাভ। কিন্তু ম্যালিনসনও নাছোড়বান্দা,—তাই কনওয়ে বলল, পাগল না হয় মানলাম, কিন্তু তার পাগলামিটা খুব সুসংবদ্ধ বলতে হবে। পেট্রল নেওয়ার কথাও নিশ্চয় তোমার মনে আছে, তারপর আরেকটা ব্যাপার, বাসকুলে যতগুলি বিমান ইভাক্যুয়েশনের কাজে ছিল তাদের মধ্যে এইটিই যে কেবল এত উঁচুতে উঠতে পারে একথাও ও জানত।

তাইতেই কি প্রমাণ হচ্ছে যে ও পাগল নয়। এসব করার মতন প্রকৃতিস্থতা হয়তো ওর আছে—

তা অবশ্য হতে পারে।

তাহলেই বুঝতে পারছ যে, আমাদের এখন কর্মপন্থা স্থির করা উচিত। মাটিতে নামার পর কী করব আমরা? যদি-না অবশ্য মাটিতে আছড়ে পড়ে

তার আগে চূর্ণ-বিচূর্ণ না হই। কী করব আমরা বল ? ছুটে গিয়ে পাইলটকে তার দক্ষতার জন্যে অভিনন্দন জানাব নিশ্চয়, তাই-না ?

মাথা খারাপ।—উত্তর দিল বারণার্ড, ছোটাছুটির ভারটা আমি তোমার ওপরই দিলাম।

তার সাথে কথা কাটাকাটি করতে কনওয়ের এবারও ইচ্ছা হলো না; তাছাড়া সে দেখল যে বারণার্ড স্থূল রসিকতা দিয়ে ম্যালিনসনকে বেশ সামলে রেখেছে। কোন কথাই বলল না সে। ভাবে তাদের ছোট্ট দলটিতে আরও বেশি অসঙ্গতি থাকতে পারত। একমাত্র ম্যালিনসনই একটু বিগড়ে গিয়েছে, সেটা হয়তো এত উঁচুতে ওঠার জন্যেই। কেন না, পাতলা বাতাসের চাপ বিভিন্ন লোকের ওপর বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে। যেমন তার মনটা কেমন হালকা হয়ে গিয়েছে, দেহেও কেমন একটা ঔদাসীন্য—দুয়ে মিলে যেন ভালই লাগছে। সত্যিসত্যি বুক ভরে নির্মল ঠাণ্ডা বাতাস টেনে নিতে সে বেশ খুসী হয়ে উঠছিল। সমস্ত অবস্থাটা অবশ্য ভীতিকর মনে হয়, কিন্তু যা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছিল তার বিরুদ্ধে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অভিযোগ করার মত শক্তি কিছু ছিল না।

সেই অপূর্ব পর্বতটির দিকে তাকিয়ে থাকতে একথাও তার মনে হলো, মানুষের সমাজ হতে বহু দূরে মানুষের অনধিগম্য হয়ে আজও পৃথিবীতে এমন জায়গা রয়েছে। মনটা তার খুশিতে ভরে গেল। উত্তর-আকাশের বুক ঘেঁষে কারাকোরামের তুষার প্রাচীরটি এখন আরও স্পষ্ট দেখা যায়—ধূসরবর্ণ ও ভয়াল; শিখরগুলিতে হিমশীতল ঔজ্জ্বল্য; একটা বিরাট গাম্ভীর্য এবং নামহীনতা তাদের করেছে মহান।

মখমলের মত কোমল অন্ধকার বুকে নিয়ে গোধূলি নেমে এলো, কিছু পরে আবার নতুন গরিমায় ফুটে উঠল সে। সে-রঙ ছড়িয়ে পড়ল পর্বতমালাটির সর্ব অংগে। স্বর্গীয় দীপশলাকার মত প্রতিটি শিখর পর পর ছুঁয়ে বাতি

আলো জ্বালিয়ে চাঁদ উঠল,—কালো আকাশের পটভূমিতে দীর্ঘ দিগরেখাটি ঝলমল করতে থাকে।

বাতাস খুব শীতল হলো এবার, এবং এমন বেগে তা বইতে শুরু করল যে বিমানটি ওলট-পালট খেতে শুরু করে। এতে আরোহীরা হতাশ হয়ে পড়ল; আঁধার নামার পরেও যে বিমানটি সমানে ছুটে চলবে তা তারা ভাবতে পারেনি,—এবং এখন একমাত্র আশা যদি পেট্রল ফুরোয়। এবং তা কিছুক্ষণের মধ্যে ফুরবেই। ম্যালিনসন এই নিয়ে আবার বকতে শুরু করলে কনওয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, খুব বেশি যদি হয় তো হাজারখানেক মাইল আমরা অতিক্রম করেছি।—অবশ্য কনওয়ের সে-বিষয়ে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

ম্যালিনসন একেবারে মুষড়ে পড়ল। বলল, কিন্তু কোথায় চলেছি আমরা?

তা বলা শক্ত, তবে খুব সম্ভব তিব্বতের কোন অংশে। ওই পর্বতমালাটি যদি কারাকোরাম হয় তাহলে তিব্বত ঠিক ওর ওপারে। একটা কথা পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতের তালিকায় ওর একটি শৃঙ্গের স্থান দ্বিতীয়।

তার মানে এভারেস্টের পরেই?—বারণার্ড বলল, দেখ দেখ, কী চমৎকার দৃশ্য।

ওখানে অভিযান চালান নাকি এভেরেস্টের চাইতেও শক্ত। আবরুজির ডিউক তো অসম্ভব বলে হাল ছেড়ে দেন।

উফ্‌ ঈশ্বর।—খেঁকিয়ে উঠল ম্যালিনসন।

বারণার্ড কিন্তু হাসতে হাসতে কনওয়েকে বলল, আশা করি আমাদের এ অভিযানে তুমিই পথ প্রদর্শকের কাজ করবে। আর আমার কথা? আমি যদি এক পাত্র মদ পাই তাহ'লে তিব্বতই হোক আর টেনেসিই হোক আমার কিছু যায় আসে না।

কিন্তু কী এখন আমরা করব সেটাও একটু ভাব না।—ম্যালিনসন আবার

বলল, কেন আমাদের এখানে নিয়ে আসা ? কী কারণে ? তোমরা যে কী করে এ নিয়ে হাসিমস্কার করছ আমি তো ভেবেই পাই না।

এ নিয়ে হৈ-চৈ করেই বা কী হবে ? তাছাড়া তুমি যা বলছিলে, লোকটা যদি সত্যি পাগলই হয় তাহ'লে তো কথাই নেই।

পাগল ছাড়া তো আমি ওকে আর কিছু ভাবতে পারছি না। তুমি কি বল কনওয়ে ?

কনওয়ে মাথা নাড়ল।

মিস ব্রিনক্‌লো তাদের দিকে ফিরল,—কোন নাটকাভিনয়ের বিরামকালে যেমন কেউ ফেরে। সে বিনত্র কণ্ঠে বলল আপনারা এতক্ষণ আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করেননি বলে আমিও কিছু বলা উচিত মনে করিনি। দেখুন, মিঃ ম্যালিনসনের সংগে আমিও একমত। আমি জোর করে বলতে পারি এই লোকটার—মানে পাইলটের—নিশ্চয় মাথার গোলমাল রয়েছে। পাগল না হলে কেউ এমন কাণ্ড করে ? বিমানগর্জনের ওপর গলা চড়িয়ে অন্তরঙ্গভাবে আরও বলল সে, আরেকটা কথা কি জানেন ? আকাশ ভ্রমণ আমার এই প্রথম। একবার আমার এক বন্ধু আমাকে লণ্ডন থেকে প্যারি পর্যন্ত বিমানে নিয়ে যাবার জন্যে বহু চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি যাইনি।

আর আজ একেবারে ভারতবর্ষ থেকে তিব্বতে !—বারণার্ড বলল, কোথা থেকে কী যে হয় কিছুই বলা যায় না।

মিস ব্রিনক্‌লো বলল, আমার সংগে একজন মিশনারির একবার আলাপ হয়েছিল, তিনি তিব্বতে গিয়েছিলেন। তাঁর মতে, তিব্বতীরা অদ্ভুত মানুষ। তাদের বিশ্বাস, আমরা নাকি বাঁদর থেকে উদ্ভূত।

তাহলে তো তারা অগ্রগামী।

না না,—আমি আধুনিক মতবাদের কথা বলছি না। এ বিশ্বাস তাদের আজ হাজার বছরের—এটা তাদের কুসংস্কার। অবশ্য আমি নিজে এ সবের

বিরুদ্ধে,—আমার মতে ডারুইন যে কোন তিব্বতীর চাইতে অনেক নিকৃষ্ট। আমি বাইবেল ছাড়া আর কিছু মানি না।

আপনি বোধ হয় ফান্‌ডামেণ্টালিষ্ট ?

কিন্তু মিস ব্রিনক্‌লো কথাটি ঠিক বুঝতে পারল না। বলল, আগে আমি ছিলাম এল, এম, এস-এ কিন্তু শিশু-দীক্ষা নিয়ে তাদের সঙ্গে মতের অমিল হয়।

এল, এম, এস হলো—লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির সংক্ষিপ্ত রূপ। একথা বোঝার পরও ব্রিনক্‌লোর উক্তি কনওয়ের কাছে কেমন হাস্যোদ্দীপক লাগল। যাই হোক তার কী যেন কনওয়ের একটু ভাল লাগে। এমন কি একথাও সে চিন্তা করে রাত্রির জন্যে মিস ব্রিনক্‌লোকে তার পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু দেবে কিনা, কিন্তু হয়তো তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য অনেক ভাল এইকথা ভেবে শেষে নিবৃত্ত হলো।

আসনটায় কুঁকড়ে বসে চোখ বুজল সে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার দুটি চোখ ঘুমে ভরে এলো—

বিমান একভাবে ছুটে চলল।

হঠাৎ বিমানটি এমন কাত হয়ে পড়ল যে তাদের সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল। কনওয়ের মাথা জানালায় এমন ঠুকে গেল যে মুহূর্তের জন্যে সে চোখে অন্ধকার দেখল। তারপর আবার বিমানটি বিপরীত দিকে কাত হলো, কনওয়ে আসনের সারি দুটির মাঝে ছিটকে পড়ল। তখন আরও ঠাণ্ডা। কনওয়ে প্রথমেই যন্ত্রচালিতের মতন ঘড়িটা দেখল। দেড়টা বাজে, তার মানে কিছুটা সময় সে ঘুমতে পেয়েছে। তার কানে আসে উচ্চ একটা ঝটপটানি শব্দ,—প্রথমে ভেবেছিল সে শব্দটা বুঝি কাল্পনিক কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল বিমানের ইঞ্জিন বন্ধ রয়েছে এবং বিমানখানা তীব্রবেগে ঝড়ের মধ্যে ছুটে চলেছে। তারপর সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল,—দেখল মাটি অতি নিকটে,—শামুক-রঙের আবছা মাটি দ্রুতগতিতে অপসৃত হচ্ছে।

ম্যালিনসন চিৎকার করে উঠল, পাইলট নামছে।

বারণার্ড আসনচ্যুত হয়েছিল। শনিতে পাওয়া লোকের মত, বলল যদি ভাগ্যে থাকে।

এই সব উত্তেজনা মিস ব্রিনক্‌লোকে তেমন বিচলিত করতে পারে না। শান্তভাবে সে এমনভাবে তার টুপি ঠিক করে যেন ডোভার বন্দর এসে গিয়েছে।

একটু পরেই বিমান মাটিতে নামল। কিন্তু এবারকার অবতরণ আগের মতন নয়। প্রচণ্ডবেগে যেন সে পৃথিবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারপর দশ সেকেণ্ড ধরে এমন প্রবলভাবে দুলতে ও ধাক্কা খেতে লাগল যে ম্যালিনসন তার আসনটি আঁকড়ে ধরে যন্ত্রণায় অস্ফুটধ্বনি করে উঠল, উফ্ ভগবান !—কোন কিছু খানিকটা ঘষ্‌টে গিয়ে মট করে ভেঙে গেল, আর সংগে সংগে বিকট শব্দে একটি টায়ার ফেটে গেল।—গভীর নিরাশায় খেদোক্তি করে উঠল ম্যালিনসন, যাক আশা ভরসা সব গেল—টেলস্কীডটি ভাঙল। তার মানে, যেখানে রয়েছি সেইখানেই থাকতে হবে।

সঙ্কটমুহূর্তে বেশি কথা বলা কনওয়ের স্বভাব নয়। পা দুটো ছড়িয়ে প্রথমে সে আড়ষ্টভাব দূর করে নেয়, মাথার যেখানটা জানালায় ঠুকে গিয়েছিল সেখানটায় একবার হাত বুলিয়ে দেখে। সামান্য ছড়ে গিয়েছে—বিশেষ কিছু হয়নি। এদের সাহায্য তাকে করতেই হবে। কিন্তু বিমান স্থির হয়ে দাঁড়াবার পর সবার শেষে উঠে দাঁড়াল সে। ম্যালিনসন কেবিনের দরজা খুলে লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিল কনওয়ে বলল, দাঁড়াও।

মোহগ্রস্তের মত সে উত্তর করল, কোন দরকার নেই। পৃথিবীর শেষপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছি আমরা,—আশপাশে কোথাও জনপ্রাণী নেই।

একটু পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে তাদের সকলের সেই একই অনুভূতি হয়। নিজেদের পদশব্দ আর উন্মত্ত-বাতাসের গর্জনধ্বনি ছাড়া কোথা থেকে এতটুকু শব্দ কানে আসে না। আকাশ-বাতাস যেন কেমন একটা গভীর বিষণ্ণতায় ভারী একটা অমোঘ ভয়ঙ্করত্বের হাতে আমরা সবাই যেন ক্রীড়নক।

চাঁদ বুঝি মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে; তাহার আবছা আলোয় একটি বিরাট প্রান্তরের সীমাহীন শূন্যতা, দেখা যায় সেখানে শুধু উন্মত্ত বাতাসের মাতামাতি। কিছু না ভেবেই যে কোন লোক বলবে এই হিমরাজ্যটি পর্বত-উচ্চ, আর তার বুকে পাহাড়গুলি—পাহাড়ের উপর পাহাড়। তাদের একটি সারিকে দেখা যায় দূরে দিগরেখায়,—ঠিক যেন এক সার শ্বাদন্ত।

ম্যালিনসন নেমেই যেন জ্বরের ঘোরে ককপীটের দিকে দৌড়তে দৌড়তে বলে, যে-ই হোক-না কেন মাটিতে আমি কাউকে ভয় করি না। ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব।

অন্য সকলে তার উৎসাহের তীব্রতা দেখে যেন হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ভয়ও পায়। কনওয়ে তাকে বাধা দিতে যায়, কিন্তু তখন সে নাগালের বাইরে।

কয়েক সেকেণ্ড পরে ককপীট হতে নেমে এসে ম্যালিনসন নিজের হাতটা চেপে ধরে অনুচ্চ ধরা গলায় বলে, অদ্ভুত ব্যাপার, কনওয়ে, লোকটা হয় মারা গিয়েছে, নয়তো অজ্ঞান হয়ে গেছে, কিংবা আর কিছু হয়েছে। একটা কথারও জবাব পেলাম না, ভেতরে দেখবে চল।—যাক, আমি ওর রিভলবারটা নিয়ে নিয়েছি।

ওটা আমায় দাও।—মাথার আঘাতের দরুণ তখনও সে আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তবুও সে ককপীটের দিকে এগুল। কিন্তু বাইরে থেকে ঝুঁকে ঘেরা ককপীটের ভেতর বিশেষ কিছু দেখতে পায় না সে।······ পেট্রলের তীব্র গন্ধে সেখান ভরা, দেশলাই জ্বালতে তার ভয় হয়। কেবল সে বুঝতে পারে, পাইলটের শরীরটা কুঁকড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, মাথাটা ঝুলে পড়েছে একেবারে 'কন্ট্রোলের' ওপর। বারকতক তাকে নাড়া দিল সে; তারপর দ্রুতহস্তে তার পোশাক পরিচ্ছদ, মাথার টুপি সব আলগা করে দিয়ে পিছু ফিরে বলল, ম্যালিনসন, ঠিক বলেছ, কিছু হয়েছে বলেই মনে হয়। এখুনি একে বাইরে নিয়ে আসা দরকার।—যে কেউ তখন একটু নজর

করে দেখলেই বুঝতে পারত, কনওয়েরও কিছু একটা হয়েছে। তার কণ্ঠস্বর এখন তীক্ষ্ণ, তীব্র-সংশয়-সন্দেহের দোলা কথাবার্তায় এখন আর পাওয়া যায় না। সময়, স্থান, শৈত্য, ক্লান্তি—কিছুই এখন আর ধর্তব্যের মধ্যে নয়,—তাকে এখন কাজ করতে হবে এবং তা করার জন্যেও সে প্রস্তুত।

বারণার্ড আর ম্যালিনসনের সাহায্যে পাইলটকে ককপীট থেকে টেনে নামিয়ে এনে মাটিতে শুইয়ে দিল। দেখল, মারা যায়নি, সে জ্ঞান হারিয়েছে। ডাক্তারি শাস্ত্রে কনওয়ের বিশেষ জ্ঞান নেই, তবে যারা যাযাবরবৃত্তিতে অভ্যস্ত রোগের সংগে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েই থাকে। অজানা মানুষটিকে পরীক্ষা করে বলল সে, অত উঁচুতে ওঠার জন্যে খুব সম্ভব হৃতপিণ্ড আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখানে আমরা কীই-বা করতে পারি, এই ভীষণ বাতাসের হাত থেকে রক্ষা পাবার মতন একটা আশ্রয়ও নেই। তার চেয়ে চল একে নিয়ে আমরা ক্যাবিনেই যাই। কোথায় আমরা এসেছি কিছুই জানি না, সকাল হবার আগে তা জানবার চেষ্টা করলে বিফলই হতে হবে।

কেউই তার কথার প্রতিবাদ করল না, এমন কি ম্যালিনসন পর্যন্ত নয়। পাইলটকে ক্যাবিনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দু'সারি আসনের মাঝে গ্যাংওয়েতে লম্বালম্বি শুইয়ে দিল। বাইরের চাইতে ভেতরটা এমন কিছু গরম নয়, তবে ঝড়ো হাওয়ার আক্রমণ থেকে একটা আশ্রয় পাওয়া গেল, এই যা। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ভয়াল রাত্রিতে তাদের একমাত্র আলোচ্য হলো—বাতাস। সাধারণ বাতাস তা নয়। জোর বা ঠাণ্ডা বাতাসই কেবল নয়। এ যেন একটা বিকট উন্মত্ততা চলেছে তাদের চারদিক ঘিরে, যেন কোন দৈত্য তার রাজ্য-সীমানায় অবিরত দাপাদাপি করে, অনর্গল প্রলাপ বকে যায়। আরোহাশুদ্ধ বিমানটি যেন থর থর করে কাঁপে, উলটে যেতে চায়। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতে কনওয়ের মনে হয় যেন সেই বাতাসের আঘাতে তারা হতে আলোক-কণা ছিটকে বেরিয়ে আসে।

পাইলট নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। আলোকের স্বল্পতা ও স্থানের সঙ্কীর্ণতা

সত্ত্বেও কনওয়ে কোনরকমে তার যতটুকু জ্ঞান সেই মত তাকে পরীক্ষা করে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারল না। শেষে বলল, হার্ট দুর্বল মনে হচ্ছে।

তখন মিস ব্রিনক্‌লো তার হাতব্যাগ হাতড়ে বেশ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করল। অত্যন্ত নিস্পৃহ ভাবে বলল সে, এতে হয়তো ওর কোন উপকার হতে পারে দেখুন তো। আমি নিজে কোনদিন একটি ফোঁটাও স্পর্শ করিনি, তবে সব সময় সংগে রাখি যদি কোন দুর্ঘটনায় দরকার হয়।

এটাকে তো দুর্ঘটনাই বলা যায়, তাই না?

গম্ভীর ভাবে কনওয়ে জবাব দিল, তাইতো মনে হয়।—তারপর সে বোতলের ছিপি খুলে গন্ধ শুঁকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি পাইলটের মুখে ঢেলে দিয়ে বলল, এরই দরকার ছিল। ধন্যবাদ।

একটু পরে দেশালাই জ্বালাতেই দেখা গেল, তার চোখের পাতাদুটি যেন কাঁপছে।

ম্যালিনসন হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। পাগলের মত হাসতে হাসতে চিৎকার করে উঠল সে, আমরা নির্বোধ, একটা মড়া দেখার জন্যে কেবলই দেশালাই জ্বালিয়ে চলেছি।—কী অপরূপ চেহারা!—ও চীনা ছাড়া কিছু নয়।

তা হতে পারে।—দৃঢ়স্বরে কনওয়ে বলল, কিন্তু এখনও ও মারা যায়নি আমাদের ভাগ্যে বেঁচে উঠতে পারে।

ভাগ্য? ভাগ্য ওর, আমাদের নয়।

ও কথা থাক, এখন একটু চুপ কর।

ম্যালিনসনের ভেতর ছাত্রসুলভ ছেলেমানুষি কাটেনি, উচ্চপদস্থের ক্ক' আদেশ সে অমান্য করতে পারে না। ম্যালিনসনের জন্যে কনওয়ের দুঃখ হ' কিন্তু পাইলট ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নজর দেবার অবকাশ তার ছিল না একমাত্র পাইলটই তাদের এই অবস্থার কারণটি বলতে পারে। মাত্র অনু মানের ওপর নির্ভর করে সে আর কিছু আলোচনা করতে রাজি নয়, পথে ত যথেষ্ট হয়েছে। তার একটানা কৌতুহলের ওপর কেমন একটা অসোয়াি

খয়ে গেছে, কেন না সে বুঝতে পারছিল উত্তেজনার শিহরণ শেষ হয়েছে, এবার শুরু সহনশক্তির কঠিন পরীক্ষা, হয়তো তার পরিণতি নিদারুণ।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাত্রিটি তার জাগরণে কাটে, সে ভাবে, শুধুই ভাবে, কাউকে কিছু বলার ইচ্ছা হয় না। অনুমান করে সে, পশ্চিম হিমালয় পার হয়ে তারা স্বল্পখ্যাত কুয়েন-লুনের দিকে এসেছে। তা যদি হয় তাহলে তারা এসে পৌচেছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ এবং দুর্গম অংশে—তিব্বতী মালভূমি,—এর সর্বনিম্ন উপত্যকাটিও দুমাইল উঁচু। বিশাল জনহীন এই ঝড়ের রাজ্য আজও অনাবিষ্কৃত। তারই কোথাও তারা আটক পড়েছে। এই সময় তার কৌতূহলের জবাবেই যেন একটা চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটল। ভেবেছিল চাঁদ একটা মেঘের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে, হঠাৎ একটা কালো ছায়ার ওপর চাঁদখানা জেগে উঠল। তখনও তাকে ঠিক দেখা যায় না, কিন্তু তার আলোয় সামনের আঁধার সরে গেল। কনওয়ে দেখল, প্রকাণ্ড একটি উপত্যকার বহিঃরেখা, তার দুপাশে খিন্নদর্শন কৃষ্ণবর্ণ অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী রাত্রির উজ্জ্বল নীল আকাশের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে। উপত্যকার শেষ প্রান্তে চোখ পড়তেই তার দৃষ্টি যেন আটকে গেল। সেখানে পর্বতগুলির অন্তবর্তী স্থানটুকুতে চাঁদের আলো মাথায় দাঁড়িয়ে একটি ত্রিকোণ হিমশংকু। তার মানে পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দর পাহাড় সেটি। যে কোন শিশুর আঁকা সরল একটি ত্রিকোণ, তার আকৃতি উচ্চতা বা নৈকট্য কোন কিছু হিসেবে আসে না। তার সারা অঙ্গে এমনই ছটা, এমনই সৌম্য ভাব যে, মুহূর্তের জন্যে কনওয়ের মনে জাগে, এ কি সত্য! একভাবে তাকিয়ে থাকে সে, একসময় পাতলা বাষ্পের ওড়নায় তার প্রান্ত ঢাকা পড়ে যায়, সে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, হিমবাহের অনুচ্চ গম্ভীর ধ্বনি শোনা যায়।

আর সকলকে ডেকে তুলে সেই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখাবার জন্যে তার ভয়ানক ইচ্ছা হয়, কিন্তু তখনই ভাবে, দৃশ্যটির প্রভাব ওদের ওপর অন্যরকমও হতে পারে। হয়তো তারা আরও অশান্ত হয়ে উঠবে। হিমশংকুটির ব্রীড়ানম্র

গরিমা হয়তো তাদের শুধু জানিয়ে দেবে তারা মানুষের জগৎ থেকে কত বিচ্ছিন্ন আর তাদের সামনে কত বড় বিপদ। সব চাইতে কাছাকাছি লোকালয় হয়তো কয়েক'শ মাইল দূরে। তাদের সঙ্গে খাদ্য কিছু নেই, অস্ত্র বলতে একটি রিভলবার, বিমানটি জখম হয়েছে, পেট্রলও বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে,—বিমান-চালনা কারুর জানা থাকলেও কোন লাভ হতো না। দুর্দান্ত শীত আর ভীষণ বাতাসের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করার মতন যথেষ্ট পোশাক তাদের নেই, ম্যালিনসনের মোটরিং কোট আর তার নিজের আলষ্টার কিছুই নয়। এমন কি মিস ব্রিনকলো মেরুযাত্রীর মতো পশমী পোশাক পরে গলায় মাফলার জড়িয়েও (প্রথমে তাকে দেখে কনওয়ের অদ্ভুত মনে হয়েছিল) এমন কিছু আরাম পাবে না। তাদের সকলেই, এক সে ছাড়া, উচ্চবায়ুমণ্ডলে ভ্রমনের দরুণ কাতর। এমন কি, বারণার্ড পর্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। ম্যালিনসন বিড়বিড় করছে,—এইরকম অবস্থা যদি বেশিদিন চলে তাহলে তার কী হবে তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। তাই এ-রকম দুর্বিপাকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কনওয়ে মিস ব্রিনকলোর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে না তাকিয়ে পারল না। তার মনে হয়, সে বোধ হয় অদ্ভুত। এত দৈবদুর্বিপাকে পড়েও সে যেন অস্বাভাবিক রকম স্বাভাবিক। সেজন্যে কনওয়ে তার কাছে কৃতজ্ঞ তার চোখের ওপর চোখ পড়তে কনওয়ে সহানুভূতিভরা কণ্ঠে বলল, আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

জবাব এল, যুদ্ধের সময় সৈন্যদের এর চাইতে অনেক বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

কনওয়ে তার ওই তুলনার তেমন মূল্য দিল না। সত্যি কথা বলতে কি তাকে অন্তত কখনও ট্রেঞ্চে এরকম বিশ্রীভাবে রাত্রি কাটাতে হয়নি।

এবার সে মন দিল পাইলটের দিকে। তার নিশ্বাসে তখনও আছে রয়েছে, সে বায়কতক সামান্য নড়ল। ম্যালিনসনের অনুমানই হয়তো ঠিক লোকটিকে চীনা বলেই মনে হয়। ইংরেজ ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্টের হুবহু

সত্বেও তার মঙ্গোলীয় নাসিকা আর উঁচু চোয়াল সেই কথাই বলে। তবে ম্যালিনসন তাকে যে কুৎসিত বলেছিল কনওয়ে তা মানতে পারে না। সে জানে নিজের দেশে সে স্বচ্ছন্দে মাঝারির পর্যায়ে পড়বে, এখন অবশ্য দেশালায়ের ম্লান আলোকে তার ফ্যাকাশে মুখ বা ব্যদিত বদন কোনটাই সুন্দর বলে মনে হয় না।

রাত্রি যেন আর শেষ হয় না—প্রতিটি মিনিট এত ভারী যেন তাকে জোর করে সরিয়ে আরেকটির আসার পথ করে দিতে হয়। চাঁদের আলো ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে আসে, তার সাথে দূরের দৃশ্যটিও ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে থাকে; তারপর প্রভাত অবধি আঁধার, শৈত্য আর বাতাসের সে কী মাতামাতি। প্রভাতের সংকেত পেয়েই হঠাৎ এক সময় বাতাস বন্ধ হয়ে গেল,—পৃথিবীতে নেমে এল প্রশান্তি। দূরে ফ্যাকাশে আলোয় ত্রিকোণ বন্ধনীর মাঝে আবার সেই পর্বতটি জেগে উঠল ধূসর রূপে ভূষিত হয়ে, তারপর তার অঙ্গে রূপালির ঝলমলানি, তারপর তার শিখর প্রভাতসূর্যের ছোঁয়া পেয়ে লালের আভায় ভরে উঠল। আলো-আঁধারের মাঝে উপত্যকাটিও আত্মপ্রকাশ করতে থাকে, তার বুক কঠিন পাথরের স্তূপ ঢালু হয়ে ক্রমশ ওপরদিকে উঠে গেছে। তা দেখে আনন্দ হবার কথা নয়, কিন্তু কনওয়ের কাছে তা বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দিল,—ভাবাবেগের আবেদন নয়, কোন একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা।

দূরের হিমশংকুটিকে দেখে মনটা নিস্পৃহভাবে ঊর্ধ্বগামী হয়, যেমন হয় ইউক্লিডের উপপাদ্য করতে গিয়ে। ঘননীল আকাশের বুকে সূর্য যখন আরও এগিয়ে যায় তখন আবার কনওয়ের কেমন একটু অসোয়াস্তি ধরে।

বাতাসে যখন উষ্ণতার ছোঁয়াচ লাগল তখন আর সকলের ঘুম ভাঙল। কনওয়ে তাদের বলল যে, পাইলটকে বাইরে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো শুকনো বাতাস আর গরম রোদ্দুরে কিছুটা উপকার হতে পারে। তাকে বাইরে নিয়ে এসে সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। শেষে পাইলট চোখ খুলল, অসংলগ্নভাবে কথাও বলল। এরা সকলেই তার মুখের ওপর ঝুঁকে গভীর

মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলি বোঝার চেষ্টা করে,—কিন্তু এক কনওয়ে ছাড়া আর সকলেরই কাছে তা অর্থহীন মনে হয়। কনওয়ে মাঝে-মাঝে তার কথার জবাব দেয়। ক্রমশ পাইলট আরও দুর্বল হয়ে পড়ল, কথা বলতে তার ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল, অবশেষে মারা গেল।

তখন বেলা হয়েছে।

তারপর কনওয়ে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, পাইলট যা বলল তা অতি সামান্য,—মানে, আমরা যা জানতে চাই তার তুলনায় সামান্য। কেবলমাত্র বলল যে, আমরা তিব্বতে এসে হাজির হয়েছি,—তাতো জানা কথা। কেন যে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে তা বিশেষ কিছু খুলে বলেনি, তবে এদিকটা তার পরিচিত। এমন-এক জাতের চৈনিক ভাষায় ও কথা বলছিল যে সে-ভাষা বোঝা আমার পক্ষে কষ্টকর, কিন্তু কাছাকাছি উপত্যকার ধারে-কাছে কোথায় যেন একটা মঠ আছে বলছিল। সেখানে গেলে আমরা খাদ্য পাব, আশ্রয় পাব। নাম বলছিল, শ্যাঙরি-লা। তিব্বতী ভাষায় লা মানে হচ্ছে গিরিবর্ত্ম। সেখানে যাবার জন্যে ও বারবার বলছিল।

তাহলেই যে আমাদের সেখানে যেতে হবে তার কোন মানে নেই।—ম্যালিনসন বলল, তার হয়তো মাথারই ঠিক ছিল না,—ছিল কী?

সেকথা তো যেমন আমি জানি তেমনি তুমি জান। কিন্তু যদি আমরা সেখানে না যাই তাহলে আর কোথায় যাব বল?

যেখানে খুশি চল, আর ভেবে লাভ কি? আমি শুধু এইটুকু জানি, শ্যাঙরি-লা যদি ওদিকে হয় তাহলে সেখানে যাওয়া মানে সভ্যজগত থেকে আরও কয়েক মাইল বেশি দূরে চলে যাওয়া। দূরত্বটাকে আর না বাড়িয়ে কমাতে পারলেই আমি সুখী হতুম। আচ্ছা, তুমি কি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও না?

ধীরতার সঙ্গে কনওয়ে জবাব দিল, প্রকৃত অবস্থাটা তুমি হয়তো ঠিক

বুঝতে পারছ না ম্যালিনসন। আমরা পৃথিবীর এমন একটি অংশে এসে পড়েছি যেখানকার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, শুধু এটুকু মাত্র বোঝা যায় যে সুসজ্জিত অভিযাত্রীদলের পক্ষেও সে-অংশটি দুর্গম ও বিপদসংকুল। শত শত মাইল বিস্তৃত এই ধরণের এক দুর্গম প্রদেশের মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়ে, এখান থেকে হেঁটে পেশোয়ার ফিরে যাওয়ার বাসনাটা আমার কাছে খুব আশাপ্রদ মনে হচ্ছে না।

মিস ব্রিনক্‌লো গম্ভীরভাবে বলল, আমি অন্তত যেতে পারব বলে মনে হয় না।

বারণার্ড ঘাড় নেড়ে বলল, বরং মঠটা যদি কাছাকাছি কোথাও হয় তাহলে তো আমাদের ভাগ্য বলতে হবে।

তা কিছুটা বলতে হবে বই-কি।—কনওয়ে সায় দিয়ে বলল, মোটের ওপর, আমাদের কাছে খাবার-দাবার কিছু নেই, আর এ-জায়গায় বেঁচে থাকা যে নেহাৎ সহজ কথা নয় তাতো দেখতেই পাচ্ছ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্ষিদেয় অবসন্ন হয়ে পড়ব, তারপর, এখানে থাকলে আজও রাত্তিরে আবার সেই ঝড়ো হাওয়া আর দুর্দান্ত শীত ভোগ করতে হবে। সেটা কী খুব আরামের হবে? আমার তো মনে হয়, এখন কোনরকমে মানুষের সন্ধান করতে হবে, লোকালয় যেখানে আছে বলে জেনেছি সেখানে ছাড়া আর কোথায় সন্ধান করব বল?

আর তাতে যদি কোন ফাঁদে পড়তে হয়?—ম্যালিনসন প্রশ্ন করল।

উত্তর দিল বারণার্ড, তবু তো উষ্ণ আশ্রয়, একটুকরো পণীরও মিলবে নিশ্চয়। সে-ফাঁদে পড়তে আমি রাজি আজি।

ম্যালিনসন ছাড়া আর সকলে হেসে উঠল। তাকে এত বিষণ্ণ, ক্লান্ত দেখায়!

শেষে কনওয়ে বলল, তাহলে আমি ধরে নিতে পারি তো যে আমরা প্রায় সকলেই শ্যাঙরি-লা যেতে এক মত? উপত্যকা ধরে নিশ্চয় কোন পথ রয়েছে আর উপত্যকাটা তত খাড়াই মনে হচ্ছে না, তাহলেও আমাদের সাবধানে

যেতে হবে। মোটের ওপর এখানে এর আমাদের কিছুই করবার নেই, এমন-কি একে সমাধিস্থ করতে হলেও—ডিনামাইট দরকার। তাছাড়া, মঠের লোকেরা হয়তো ফেরার সময় আমাদের কুলি-টুলি দিয়ে সাহায্যও করবে। তাও তো দরকার। আমি বলি কি, এখনই আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত। তাতে বিকেলের মধ্যে যদি মঠটাকে খুঁজে না পাই তাহলে রাত্তিরের জন্তে বিমানে ফিরে আসার মতো সময় আমরা পাব।

ধর, আমরা খুঁজে পেলাম, কিন্তু সেখানে যে আমরা খুন হব না একথা কে জোর করে বলতে পারে?—ম্যালিনসন প্রশ্ন করল। তখনও সে অনমনীয়।

তা কেউ-ই বলতে পারে না। কিন্তু আমার মনে হয়, অনশনে বা শীতে জমে মরার চাইতে এরকম একটা ঝুঁকি নেওয়া অনেক ভাল।—কনওয়ের মনে হলো, এই ধরণের কথা কাটাকাটি করা সময়োপযোগী হচ্ছে না, তবু বলল, কথা হচ্ছে বৌদ্ধমঠে হত্যা—এটা কেউ ভাবতে পারে না। ইংরেজ ক্যাথিড্রালে খুন হওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু বৌদ্ধমঠে নয়।

ঠিক বলেছেন, ক্যাণ্টরবারির সেণ্ট টমাস তো খুন হয়েছিলেন। কনওয়ের কথায় সায় দিয়ে মিস ব্রিনক্‌লো বলল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কনওয়ের কথার খেই হারিয়ে গেল।

ম্যালিনসন কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বিরক্তির সঙ্গেই বলল, বেশ তাহলে শ্যাঙরি-লাতেই চলো, তা সে যা-ই হোক আর যেখানেই হোক না কেন। তবে আশা করা যাক সেটা যেন ওই পাহাড়টার মাঝ পথেই হয়।

তার কথায় সকলেই দূরে উপত্যকাটির গতিপথে আলো-ঝলমল হিমশংকুটির দিকে তাকাল। দিনের পূর্ণ-আলোকে আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। সেই মুহূর্তে তাদের দৃষ্টি হঠাৎ যেন কিসে নিবদ্ধ হয়ে গেল, তারা দেখল, দূরে কয়েকটি মনুষ্যমূর্তি পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে।

মিস ব্রিনক্‌লো অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, ভগবান পাঠিয়েছেন।

তিন

মূর্তিগুলি ওপর হতে নেমে আসতে দেখা গেল যে, তারা বারো জন কিংবা তারও বেশি। একটা ডুলি বয়ে নিয়ে আসছিল তারা। আরও একটু কাছে আসতে ডুলির ভেতর নীল পোষাক পরা আরোহীটিকেও দেখা যায়। কোথায় যে তারা যাচ্ছে কনওয়ে তা কিছুই বুঝতে পারে না, হয়তো মিস ব্রিনক্লো যা বলল তাই,—তারা দৈবপ্রেরিত। তারা আরও কাছে আসলে কনওয়ে এগিয়ে গেল, কয়েক গজ থাকতে সসম্ভ্রমে ডুলির আরোহীটিকে অভিবাদন করে দাঁড়াল। কনওয়ে অবাক হয়ে দেখল, আলখাল্লাধারী লোকটি ডুলি থেকে নেমে গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে সে একটি হাত বাড়িয়ে দিল। কনওয়ে করমর্দন করে দেখতে পেল, সে চৈনিক, বয়স যথেষ্ট হয়েছে, চুল পেকে গিয়েছে, দাড়িগোঁফ কামান, সিল্কের পোশাকটিতে এমব্রয়েডারি কাজ করা। সেও কনওয়েকে আপাদমস্তক দেখে নিল; তারপর বেশ ঝরঝরে এবং আশ্চর্যজনক নির্ভুল ইংরেজিতে বলল, শ্যাংরি-লা মঠ থেকে আমি আসছি।

কনওয়ে আবার অভিবাদন জানাল: তারপর একটু নীরব থাকার পর সে সংক্ষেপে বলে গেল কেমন করে তারা পৃথিবীর এই বিচ্ছিন্ন অংশটিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। তার কথা শেষ হলে চৈনিকটি জখম প্লেনটির দিকে চেয়ে বলল, অদ্ভুত! তারপর না থেমেই বলে গেল, আমার নাম চ্যাং। আপনার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে বাধিত হব।

কনওয়ে একটু মার্জিত হাসি হাসল। সভ্যতা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে তিব্বতে একজন চৈনিক বণ্ড স্ট্রিটের সামাজিক আদব কায়দা

নিখুঁতভাবে বজায় রেখে শুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলছে এই কথাটাই এখন তার মন দখল করেছে। আর সকলেও তখন সেখানে এসে হাজির হয়েছে, —তারাও বিস্মিত হয়ে যায়। তাদের দিকে ফিরে কনওয়ে বলে গেল, মিস ব্রিনক্লো, মিঃ বারণার্ড—ইনি আমেরিকান, মিঃ ম্যালিনসন, আর আমার নাম কনওয়ে। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে 'আমরা খুবই আনন্দিত। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা অবশ্য আমাদের এখানে আমারই মতো বিস্ময়কর। আমরা তো আপনাদের মঠের দিকে যাবার উদ্যোগ করছিলাম, তাই আপনার সঙ্গে দেখা ভাগ্যের কথা, আপনি যদি আমাদের একটু বলে দেন—

তার দরকার হবে না। আপনাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে যেতে পেলে আমি আনন্দিত হব।

কিন্তু আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আপনার উপকার ভুলব না, এখান থেকে যদি তা খুব দূর না হয়—

না, খুব দূর নয়, কিন্তু যাওয়া খুব সহজ নয়। আপনাদের সঙ্গ পেলে আমি ধন্য হব।

কিন্তু সত্যিই—

না, না—আমি আপনাদের সঙ্গে যাবই।

কনওয়ে দেখল স্থান ও কালের দিক থেকে বিচার করলে এই ধরণের ভদ্রতাসুলভ কথা কাটাকাটি যেন হাস্যকর। সে বলল, বেশ, তাই হবে, এর জন্যে আপনার কাছে আমরা খুবই অনুগৃহীত।

ম্যালিনসন গম্ভীর ধৈর্যের সঙ্গে তাদের কথা শুনছিল। এখন নিরস কণ্ঠে বলে উঠল, বেশিদিন থাকব না আমরা। সব খরচ পত্তর আমরা দেব।

আপনাদের ওখান থেকে আমরা জনকতক লোক ভাড়া করতে চাই। যত শিগগির সম্ভব আমাদের সভ্যজগতে ফিরে যেতে হবে।

আপনি কি সত্যসত্যই ভাবেন যে সভ্য জগৎ থেকে নিতান্তই দূরে এসে পড়েছেন?

প্রশ্নটি সে এমনই ভব্যতার সঙ্গে করল যে ম্যালিনসন আরও ক্ষেপে গেল। বলল, আমার তো তাই মনে হয়,—শুধু আমার কেন, আমাদের সকলেরই তাই ধারণা। সাময়িক আশ্রয় পেলে আমরা কৃতজ্ঞ হব, কিন্তু আরও কৃতজ্ঞ হব যদি আপনি আমাদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। ভারতবর্ষে পৌঁছতে ক'দিন লাগবে বলে আপনার মনে হয়?

ঠিক বলতে পারি না।

তাতে বিশেষ কোন অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। কুলি জোগাড় করার অভিজ্ঞতা আমার আছে, আশা করি যাতে আমরা না ঠকি সেটুকু আপনি করবেন।

কনওয়ে ভাবে, ম্যালিনসনের এতটা উগ্রতা নিতান্তই অকারণ। সে কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই চ্যাঙের সসম্ভ্রম উত্তর এল, মিঃ ম্যালিনসন আমি আপনাকে শুধু এটুকু বলতে পারি যে এখানে আপনাদের এতটুকু অসম্মান হবে না এবং পরে আপনার কোন ক্ষোভ করবার কিছু থাকবে না।

পরে?—ম্যালিনসন যেন কথাটা ছুঁড়ে মারল। এই সময় আগন্তুক দল মদ ও ফল পরিবেশন শুরু করায় অপ্রীতিকর দৃশ্যটিতে ছেদ পড়ে গেল। পরিবেশনকারীরা তিব্বতী—বলিষ্ঠ দেহ, পরণে ভেড়ার চামড়া, মাথায় লোমের টুপি, পায়ে চমরী গরুর জুতো। মদের গন্ধ মধুর—ভাল জাতের যেমন হয়; আর ফলের ভেতর ছিল সুপক্ক আম। এত উঁচুতে আম কী করে জন্মাল তা কনওয়ে ভেবে পায় না। উপত্যকাপারের পর্বতটিও তার মন অধিকার করেছে, শিখরটি মোটেই সাধারণ গোষ্ঠীতে পড়ে না, অথচ কোন পরিব্রাজকই তাঁর তিব্বতভ্রমণের বই-এ এটির সম্বন্ধে তেমন কিছু লেখেন নি। তার দিকে তাকিয়ে একটা পথ বেছে নিয়ে সে মনে মনে পর্বতারোহণ শুরু করে দেয়। হঠাৎ ম্যালিনসনের কণ্ঠস্বরে সে আবার বাস্তবে ফিরে এল। চোখ ফেরাতেই দেখল চৈনিকটি তাকে লক্ষ্য করছে। চ্যাং প্রশ্ন করল, পর্বতটির কথা আপনি ভাবছিলেন, তাই-না মিঃ কনওয়ে।

হ্যাঁ। চমৎকার দৃশ্য। ওর নিশ্চয় একটা নাম আছে?

হ্যাঁ, কারাকাল!

কই এ-নাম কখনও শুনেছি বলে তো মনে হয় না। ওটা খুব উঁচু নাকি?

আট শ হাজার ফুটেরও বেশি।

তাই নাকি? হিমালয় শ্রেণীর বাইরে এত উঁচু পর্বত আছে বলে আমি জানতাম না। কিন্তু এর মাপ কি ঠিক? মেপেছিলেন কে?

কার বলে আপনার মনে হয়? সন্ন্যাসধর্ম আর ত্রিকোণমিতি কি এতই পরস্পরবিরোধী?

না তা নয়—তা নয়। কনওয়ে বলল। তারপর কথাশেষে একটু ভদ্রতার হাসি হাসল।

তার কিছু পরেই শ্যাঙরি-লার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হলো।

সারা সকাল ধরে ধীরগতিতে তাদের পর্বতারোহণ চলল; কিন্তু উচ্চতা-রোহণ করার জন্য তাদের শারীরিক পরিশ্রম এত বেশি হয় যে কথা বলার মতন শক্তি কারুর থাকে না। চ্যাং তার ডুলিতে আরাম করে চলেছে; মিস্ ব্রিনক্লোকে ওরকম রাজকীয় আবেশে ভাবা অসম্ভব বলেই চ্যাঙের ওভাবে যাওয়াটা বিসদৃশ ঠেকে না। পাতলা বাতাসে সকলেরই কষ্ট হয়, কিন্তু সব চাইতে কম হয় কনওয়ের। তাই সে ডুলির বাহকদের কথাবার্তা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে। তিব্বতী ভাষায় তার সামান্য দখল ছিল; সে বুঝতে পারে মঠে ফেরার আনন্দে তারা খুশী: তার ইচ্ছে থাকলেও তাদের দলপতির সঙ্গে আলাপ করার উপায় ছিল না; কেন না সে ডুলিতে ওঠার পরই পর্দার আবছা আড়ালে মুখ ঢেকে চোখ বুজেছে,—নিদ্রা তার আজ্ঞাবহ, আসতে এক মুহূর্ত দেরি করেনি।

ইতিমধ্যে বেশ রোদ্দুর উঠেছে। ভরপেট না হলেও ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুটা মিটেছে। বাতাস এত নির্মল যে মনে হয় অন্য কোন গ্রহ থেকে আসছে,—প্রতিটি নিশ্বাসের সঙ্গে তা যেন আরও মহার্ঘ মনে হয়। সজ্ঞানে ও স্ব-ইচ্ছায়

নিশ্বাস নিতে হয়; প্রথমে তাদের বেশ অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল কিন্তু ক্রমে তা যেন তাদের মনে কেমন একটা প্রশ্রান্তি এনে দেয়। সারা শরীরের গতির সঙ্গে নিশ্বাস নেওয়া, হাঁটা, ভাবা সব যেন একটি সুরে বাঁধা। ফুসফুস আর যেন স্বাধীন ও স্বয়ংক্রিয় নয়, তাকে এখন চলতে হয় দেহ-মনের সঙ্গে তাল রেখে। কনওয়ের ভেতর এক দিক থেকে রয়েছে কেমন একটা অতীন্দ্রিয় ভাব, আবার অন্যদিক থেকে সে সংশয়বাদী। এই দুয়ের সমন্বয় তার অনুভূতিকে রহস্যময় করে তোলে। দু-একবার সে ম্যালিনসনকে এক-আধটা কথা বলে উৎসাহ দিতে চায়, কিন্তু ম্যালিনসন তখন পথ অতিবাহনে ভয়ানক ক্লান্ত। বারণার্ডও হাঁপানি রোগীর মতই হাঁপায়; আর মিস্ ব্রিনক্‌লো তার ফুসফুসের যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাটা কোনরকমে চেপে রাখার জন্যে ব্যস্ত।

উৎসাহ দিয়ে কনওয়ে বলল, আর কি আমরা তো প্রায় চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

মিস্ ব্রিনক্‌লো বলল, ট্রেন ধরবার জন্যে একবার আমাকে দৌড়তে হয়েছিল, তখন আমার ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল।

এবার তাদের পথ আরও খাড়াই। এই সময় সূর্য মেঘের আড়ালে সরে গেল, রুপালী কুয়াশার আবরণে সারা দৃশ্য ঢাকা পড়ে গেল। ওপরের তুষার ক্ষেত্র হতে ভেসে আসতে লাগল বজ্রের হুঙ্কার আর হিমবাহের গুরু গুরু ধ্বনি; বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেল এবং একটু পরেই শৈত্যানুভূতি প্রচণ্ড হয়ে উঠল। ছুটে এল হিমেল দমকা বাতাস ও তুহিনের ঝাপ্টা। তাতে তারা সপসপে হয়ে উঠল, তাদের দুর্দশার আর অন্ত থাকল না। এমন কি কনওয়েরও একবার মনে হলো আর বুঝি এগুনো সম্ভব হবে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার মনে হলো তারা যেন পর্বতচূড়ায় পৌঁচেছে, কেন না ডুলি বাহকেরা ভার পরিবর্তনের জন্য দাঁড়াল। বারণার্ড আর ম্যালিনসনের অবস্থা সব চাইতে খারাপ, তাদের জন্যে খানিকটা দেরি হয়ে গেল। কিন্তু

তিব্বতীরা থামতে চায় না, তারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় যে, এবার আর ততবেশি কষ্ট হবে না।

এই আশ্বাস দেওয়ার পর তাদের কতকগুলো দড়ির কুণ্ডলী খুলতে দেখে ওরা হতাশ হয়ে পড়ল। বারণার্ড তো মরিয়া হয়েও কোনরকমে রসিকতা করে ওঠে, কী ব্যাপারে, এখনই ফাঁসি দেবে নাকি? কিন্তু দেখা গেল, অতখানি সাধু উদ্দেশ্য তাদের নয়। পর্বতারোহণের স্বাভাবিক কায়দা মাফিক তারা দলটিকে দড়ির বন্ধনী দিয়ে এক করে রাখতে চায়। কনওয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে গেল। তারাও যখন দেখল কনওয়ে সে-বিষয়ে পারদর্শী, তখন তারা সসম্ভ্রমে তার হাতে ছেড়ে দিল দলটিকে নিজের মতন করে সাজাতে। কনওয়ে দলের প্রথমে দিল কিছু তিব্বতী, তারপর ম্যালিনসন, তারপর নিজে, পিছনে আর কিছু তিব্বতী, তারপর বারণার্ডের সঙ্গে মিস ব্রিনক্‌লো, সবশেষে আরও কিছু তিব্বতী। এর ভেতর সে লক্ষ্য করল, তিব্বতীরা তাদের নিদ্রিত দলপতির অভাবে তাকেই তার স্থলাভিষিক্ত করে নিয়েছে। তার ভেতর জেগে উঠল তার স্বভাবসুলভ কর্তৃত্বব্যঞ্জক প্রত্যয়, সে জানে যত বড় বিপদই হোক না কেন সেই তাদের মনে জাগাতে পারবে বিশ্বাস, তাদের করতে পারবে সংহত। একসময় সে প্রথম শ্রেণীর পর্বতারোহী ছিল, আজ প্রথম শ্রেণীর না-হলেও তাকে ভাল বলা চলে। খানিকটা রসিকতা করে মিস ব্রিনক্‌লোকে বলল সে, বারণার্ডকে একটু দেখবেন।

মিস ব্রিনক্‌লো জবাব দিল, আমি যথাসাধ্য করব। কিন্তু দেখুন, এভাবে কেউ কোনদিন আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধেনি।

তাদের যাত্রাপথের পরবর্তী অংশটুকু উত্তেজনাপূর্ণ হলেও ততটা কষ্টকর নয়, বরং চড়াই ওঠার সময় ফুসফুস ফেটে পড়ার মতন যে কষ্ট তা আর হয় না। পথটি এবার গিয়েছে একটি পর্বতপ্রাচীরকে আড়াআড়িভাবে ভেদ করে। প্রাচীরটির উপরদিক কুয়াশায় ঢাকা। পথের আর এক পাশে অতলস্পর্শী

খাদটিকেও কুয়াশা যেন করুণা করেই ঢেকে ফেলেছে। পথটি কোথাও-কোথাও দুফুটের বেশি চওড়া হবে না,—কিন্তু বাহকেরা যেভাবে ডুলি নিয়ে সেইসব জায়গা পার হলো তাতে সে প্রশংসা না করে পারল না। ডুলির আরোহীরও কম তারিফ করল না সে,—কি নিশ্চিন্ত নিদ্রা! তিব্বতীরা অবশ্য খুবই নির্ভরযোগ্য, কিন্তু পথটি প্রশস্ত ও একটু নিম্নগামী হলে বাহকেরা যেন খুশীই হয়। হঠাৎ তারা গান জুড়ে দিল,—তাদের সুরে আদিমতার ছোঁয়াচ।

বৃষ্টি থেমে গিয়ে বাতাস গরম হতে শুরু করল।

উৎফুল্ল হবার চেষ্টা করে কনওয়ে বলল, এ-রাস্তা আমরা নিজেদের চেষ্টায় কোনদিনই খুঁজে পেতাম না।

ম্যালিনসন কিন্তু তার কথায় মোটেই খুশি হলো না। তিক্তকণ্ঠে বলল সে, তাতে কি খুব বেশি ক্ষতি হতো?

পথ পর্বতের গা বেয়ে এবার আরও ঋজুগতি নেমে গিয়েছে। এক জায়গায় এক রকমের ছোট ছোট গাছ দেখে কনওয়ে বুঝল, যে বাসযোগ্য সমতলভূমি খুব বেশি দূরে নয়। সে-কথা বলতেও ম্যালিনসন বিশেষ সান্ত্বনা পেল না। বলে উঠল সে, আশ্চর্য কনওয়ে তোমার কি মনে হচ্ছে যে তুমি আলপ্‌সে বেড়াচ্ছ? আমি জানতে চাই কোন্ নরকে চলেছি আমরা? সেখানে গিয়ে আমাদের কর্মপদ্ধতি কী হবে, আমরা কি করব?

ধীরকণ্ঠে কনওয়ে বলল, আমার মতন অভিজ্ঞতা থাকলে বুঝতে পারতে ম্যালিনসন, জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন নিষ্ক্রিয়তাই একমাত্র সুখদায়ক মনে হয়। যা ঘটছে তা ঘটতে দাও। যেমন যুদ্ধে হয়েছিল। ঝঞ্ঝাটের মাঝখানে যদি বৈচিত্র্যের ছোঁয়াচ কেউ পায়, যেমন এক্ষেত্রে হয়েছে, তাহলে আমি বলব সে ভাগ্যবান।

তোমার ওসব দর্শনতত্ত্ব আমার বোধগম্য নয়। কনওয়ে, বাসকুলের দুর্যোগের দিনে কই তো তুমি ওরকম ছিলে না।

তাতো ছিলামই না; কেন না তখন আমি জানতাম, ঘটনার মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার আশা করা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব; কিন্তু এখন, অন্তত এই মুহূর্তে, সেরকম আশা করা যায় না। আমরা এখানে কেন—এ-প্রশ্নের যদি কোন উত্তর চাও তাহলে বলতে হয়, যেহেতু আমরা এখানে। এই ভেবে আমি তো সান্ত্বনা পাই।

যে-পথ দিয়ে আমরা এলাম সেই পথে ফিরতে হলে আমাদের কি দুর্ভোগ হবে তা বোধ হয় তুমি খেয়াল করছ। আমি লক্ষ্য করছি যে একটি ঘণ্টা ধরে আমরা একটি সোজা খাড়া পর্বত বেয়ে যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছি।

আমিও লক্ষ্য করেছি।

করেছ?—উত্তেজিত হয়ে কাশতে লাগল সে, আমি বুঝতে পারছি আমি যেন তোমাদের আপদ হয়েছি, কিন্তু আমি নিরুপায়।—ওদের আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে। আমরা যেন বড় বেশী ওদের হাতে গিয়ে পড়েছি। ওরা আমাদের ঘোর বিপদের মাঝে নিয়ে চলেছে।

তাই যদি হয়, তাহলে দ্বিতীয় পথ হচ্ছে এদের আমল না দিয়ে রাস্তায় শুকিয়ে মরা।

যুক্তি হিসেবে ঠিকই বলেছ, কিন্তু তাতে লাভ কিছু নেই। তুমি যেভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে নিচ্ছ অত সহজ করে আমি নিতে পারছি না। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে, দুদিন আগেও আমরা বাসকুল কনস্যুলেটে ছিলাম। তারপর থেকে যা সব ঘটছে তা ভাবতে আমার সারা মন যেন ঝিমঝিম করে ওঠে। আমি দুঃখিত, কনওয়ে, আমি একটু বেশী অভিভূত হয়েছি। এখন বুঝছি, যুদ্ধে যোগদান করার সুযোগ পাইনি সেটা আমার ভাগ্য; পেলে হয়তো পাগল হয়েই যেতাম। আমাদের চারদিকে গোটা পৃথিবীটা যেন একেবারে উন্মত্ত হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে যেভাবে কথা বলছি তাতে মনে হয় আমিও উন্মাদ হয়েছি।

না—না, বন্ধু, তা নয়।—মাথা নেড়ে কনওয়ে বলল, তোমার বয়স মাত্র

চব্বিশ বছর, আর তুমি ভূপৃষ্ঠ থেকে আড়াই মাইল কি তারও বেশি উঁচুতে উঠেছ,—এখন তোমার যা কিছু মনে আসুক না কেন তার ধারণা হচ্ছে ওই দুটি। তুমি যেভাবে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেছ, তোমার বয়সে আমি হয়তো তা পারতাম না।

কিন্তু এসব পাগলামি কি তোমার মনে মোটেই জাগছে না, কনওয়ে? যে ভাবে আমরা সুউচ্চ পর্বতগুলি পার হয়ে এলাম, সারারাত্রি ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে বিশ্রী প্রতীক্ষা করলাম, পাইলটের মৃত্যু হলো, এবং তারপর এইসব লোকগুলির দেখা হলো,—এসব কথা ভাবলে কি তোমার অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয় না?

তা অবশ্য হয়।

তাই আমার জানবার ইচ্ছে হয় কী করে তুমি এত শান্ত হয়ে রয়েছ।

সত্যিই জানতে চাও? যদি তোমার জানবার ইচ্ছে থাকে আমি নিশ্চয় বলব, কিন্তু তাতে হয়তো তুমি আমাকে সমাজ-বহির্ভূত একটি বিচিত্র জীব ভাববে। শান্ত কেন জান? আমার অতীতে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যা ভাবলে দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হয়, তাই। আর পৃথিবীর এই অংশটিই শুধু উন্মত্ত নয় ম্যালিনসন। বাসকুল ছাড়ার ঠিক আগের কথাটা একবার মনে করে দেখ তো। খবর আদায়ের জন্যে বিপ্লবীরা বন্দীদের ওপর কী অত্যাচারই না করছিল। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আগে যে শেষ সংবাদটি এসেছিল তা তোমর মনে আছে? সেটি হচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টারের একটি কাপড়ের কলের বিজ্ঞপ্তি,—তারা জানতে চেয়েছিল বাসকুলে 'করসেটে'র ব্যবসা কী রকম চলতে পারে। সেটাও কি পাগলামি নয়? এখানে এসে কী আর আমাদের খারাপ হয়েছে,—এক পাগলের রাজ্য হতে আরেকটিতে এসে হাজির হয়েছি। আর যুদ্ধের কথা,—যদি যুদ্ধে যেতে তাহলে আমি যা করছি তুমিও তাই করতে, শিখতে কী করে মুখ বুজে সব এড়িয়ে যেতে হয়।

তাদের কথার মাঝে একটি ছোট অথচ সোজা খাড়াই পড়াতে তাদের দম একেবারে বন্ধ হয়ে আসে। আবার সেই পূর্বেকার যন্ত্রণা জাগে। একটু পরেই সমভূমিতে পৌঁছল তারা, কুয়াশার জাল ভেদ করে বেরিয়ে এল রোদে-ভরা নীল আকাশের তলে। সামনে একটু দূরে, বৌদ্ধ-মঠ শ্যাঙরি-লা।

প্রথম দর্শনে কনওয়ের মনে হয় বায়ুশূন্য পৃথিবীর মূক ছন্দের মধ্য থেকে জেগে উঠল সেই দৃশ্য। সত্যিই তা বিচিত্র—প্রায় অবিশ্বাস্য। পাহাড়ের গায়ে এক ঝাঁক রঙচঙে ছোট ছোট কুঠি, যেন যত্নকৃত নয়, বরং আকস্মিক—স্নিগ্ধ কোমল ফুলের পাপড়ির মতো পাথরের বুকে ছড়ানো। ধূসর পাহাড়ের কোলে তাদের দুগ্ধ-নীল ছাদের সার মনেতে আনে বিমিশ্র ভাবের কম্পন। কুঠিগুলির পিছনে কারাকালের তুষারমণ্ডিত চড়াই পিরামিডের মতো উঠে গেছে, তার বুকে আলোর বন্যা। কনওয়ের মনে হয়, এইটিই বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দর্শন পর্বতক্ষেত্র; তার বিরাটত্বকে আরও বিরাট করেছে তুষার আর হিমবাহ,—পর্বতটি যেন প্রাচীরের মতন তাদের ধরে রয়েছে। হয়তো একদিন পর্বতরাজ্যটিতে ভাঙন ধরবে, আর কারাকালের অর্ধেক তুষার-ঐশ্বর্য হুড়মুড় করে নেমে এসে উপত্যকাটি ভরিয়ে দেবে।

হয়তো সুদূর অতীতে ঘটেছিল এমনই কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তার সাক্ষী হয়ে আজও জেগে রয়েছে একটি অতলস্পর্শী খাদ, পর্বতপ্রাচীর প্রায় লম্বভাবে নেমে গিয়েছে তার কোল অবধি। তাদের পথ এই পর্বত প্রাচীরটি ধরে। উপত্যকাটি তখনও বেশ পরিষ্কার দেখা যায় না, তখনও তা দূরে; কিন্তু তার শ্যামলিমা দু'চোখ ভরিয়ে দেয়। চারিদিক পর্বতপ্রাচীর, শীতল বাতাস তাতে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়। ওখানে হয়তো কোন জনবসতি আছে, কিন্তু তাদের সাথে বাইরে পৃথিবীর কোন যোগসূত্র নেই, সু-উচ্চ পর্বতপ্রাচীর তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কেবল মঠের জন্যে হয়তো আছে কোন পথ। কনওয়ের মনে যেন ভীতির মৃদু ছোঁয়াচ লাগে; ম্যালিনসনের কথাগুলি যেন পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারে না। কিন্তু সেভাবটি ক্ষণিকের, অর্ধরহস্যময়

অর্ধদৃশ্যময় এক গভীর অনুভূতির মাঝে তা হারিয়ে যায়,—অবশেষে তারা এমন একটি স্থানে পৌঁচেছে যেখানে আপাতত তাদের পথচলার সমাপ্তি।

কী করে সে এবং আর সবাই মঠে পৌঁছল, কী ধরণের সম্বর্ধনাই বা পেল, কিভাবে তাদের দড়ির বাঁধন খুলে মঠের ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো, সেসব কথা তার বিশেষ মনে পড়ে না। হালকা বাতাসে কেমন যেন স্বপ্নের ছোঁয়া, স্বচ্ছ নীল আকাশের সাথে সে বাতাসের একটা মিল ছিল। প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রতিটি চাহনি তার অন্তরে এমনই একটা মদির প্রশান্তি এনে দিচ্ছিল যে সে যেন সব কিছুর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ম্যালিনসনের অস্বস্তি, বারণার্ডের বাক্-চাতুর্য, মিস ব্রিনক্‌লোর যে কোন অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকার মতো ভঙ্গিমা—কোন কিছুই তার নাগাল পায় না। তার এটুকু মাত্র অস্পষ্ট মনে পড়ে, মঠের প্রশস্ত অভ্যন্তরভাগের উষ্ণতা আর পরিচ্ছন্নতা তাকে বিস্মিত করেছিল।

কিন্তু এ সব লক্ষ্য করার মত সময় তখন ছিল না। কেননা, চৈনিকটি ডুলি থেকে নেমে এসে তাদের পথ দেখিয়ে নানা অলিগলির ভেতর দিয়ে কোথায় নিয়ে চলল। সবিনয়ে বলল সে, পথে আপনাদের কোনরকম তদ্বির-তদারক করতে না পারার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু উপায়ই-বা কী? পথের কষ্ট আর আমার সয় না, আর নিজের শরীরের ওপর আমায় নজর রাখতেই হয়। আপনাদের খুব কষ্ট হয়নি বোধহয়?

না, কোনরকমে চালিয়ে নেওয়া গিয়েছে।—শুষ্ক হাসির সঙ্গে কনওয়ে জবাব দিল।

যাক। এখন চলুন, আপনাদের কামরা দেখিয়ে দিই। স্নান করবেন তো? খুব সাধাসিধে আমাদের ব্যবস্থা, তবে মোটামুটি সবই পাবেন।

বারণার্ড তখনও হাঁপাচ্ছে। হাঁপানি রুগীর মতন মুখবিকৃতি করে বলল সে, আপনাদের দেশের আবহাওয়া এখনও আমার খাপ খাচ্ছে না,—বাতাস যেন বুকে আঠার মতন আটকে গিয়েছে। তবে হ্যাঁ, জানালার বাইরের দৃশ্য সত্যিই চমৎকার। হ্যাঁ, স্নানের জন্যে কি আমাদের সার বেঁধে দাঁড়াতে হবে?

আমার বিশ্বাস, আমাদের ব্যবস্থায় আপনারা খুসীই হবেন, মিঃ বারণাড।

মিস ব্রিনক্‌লো কেতা-দুরস্ত মাথা নেড়ে বলল, আমিও তাই আশা করি।

চৈনিক বলল, পরে আমার সঙ্গে আপনারা ডিনার করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

কনওয়ে ভব্যতার সঙ্গে জবাব দিল। কেবল ম্যালিনসন তখনও সামলে নিতে পারেনি। বারণার্ডের মতন সে-ও আক্রান্ত হয়েছিল। তবু জোর করে বলে উঠল সে, যদি কিছু না মনে করেন, তারপর আমরা ফেরার একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলব। আমার মতে যত তাড়াতাড়ি ফেরা যায় ততই ভাল।

চার

চ্যাং বলল, তাহলে বুঝতেই পারছেন, যতটা অসভ্য আমাদের ভেবেছিলেন ততটা অসভ্য নই।

কনওয়ে কথাটায় প্রতিবাদ করার কিছু পেল না। শ্যাংরি-লার কাছ থেকে সে যা চেয়েছিল সবই পেয়েছে, বরং যা আশা করেনি তাও পেয়েছে। যে যুগে লাসাতে টেলিফোনের প্রবর্তন হতে পারে সে যুগে একটা তিব্বতীয় মঠে কেন্দ্রীয় তাপবিকিরণ ব্যবস্থা থাকাটা এমন কিছু আশ্চর্যের নয়; কিন্তু সে বিস্মিত হচ্ছিল প্রাচ্যের চিরশাশ্বত ধারাটির সঙ্গে পাশ্চাত্যের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যান্ত্রিক ব্যবস্থার অদ্ভুত মিলন দেখে। যেমন বাথটবটিই ধরা যাক না। সবুজ রঙের পোর্সিলেনে খোদাই করা রয়েছে, এ্যাক্রন ওহিও। অথচ দেশীয় ভৃত্যেরা তার অঙ্গপরিচর্যা করল চৈনিক কায়দায়,—তার নাক-কান পরিষ্কার করল, সরু এক খণ্ড সিল্ক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখের তলাকার পাতা সাফ করে দিল। সে সময় কনওয়ে ভাবছিল, তার সঙ্গীরা এদের পরিচর্যা কী ভাবে নিচ্ছে।

প্রায় দশটি বছর সে কাটিয়েছে চীনদেশে,—অবশ্য সব সময়টা যে বড় শহরে কাটিয়েছে তা নয়। সব দিক দিয়ে ভেবে দেখলে তার মনে হয়, সেই তার জীবনের সর্বাপেক্ষা সুখী অংশ। চীনাদের তার ভালই লাগে, চৈনিক কায়দা-করণ তার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে না। বিশেষ করে, চীনাদের রান্না তার খুব ভাল লাগে,—তার স্বাদে কেমন সূক্ষ্ম রসবোধের আমেজ। তাই শ্যাংরি-লাতে প্রথম আহার তার কাছে মোটেই অপরিচিত ঠেকেনি। কিন্তু তার একটা সন্দেহ হয়,—শ্বাসপ্রশ্বাসকে সহজ করার জন্যে খাবারের সঙ্গে হয়তো কোনরকম ভেষজ বা ওষধি মেশান হয়েছে। কেননা, শুধু যে সে নিজে

একটা পরিবর্তন অনুভব করছে তা নয়, সঙ্গীদেরও সে অনেকটা সুস্থ দেখছে। চ্যাং সামান্য একটু স্যালাড ছাড়া কিছুই খায়নি, মদ তো ছুঁলই না। সে ভোজনপর্বের শুরুতেই বলেছিল, মাপ করবেন, আমার খাওয়া-দাওয়া খুব বাঁধাধরা, কারণ নিজের শরীরের উপর আমায় নজর রাখতেই হয়।

একই কারণ সে আগেও দেখিয়েছে। কনওয়ে ভাবে, কী ওর অসুস্থতা। সে তাকে কাছে থেকে ভাল করে দেখল, তার বয়স আন্দাজ করা খুবই শক্ত। তার ছোটখাট বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা, গায়ের চামড়া কেমন মেটেমেটে,—তা'দেখে মনে হয় সে অকালবৃদ্ধ, আর নয়তো বৃদ্ধত্বে পৌঁছেও দেহটিকে অদ্ভুতরকম তাজা রেখেছে। তা বলে আকৃষ্ট করার মত তার কিছু নেই তা নয়, সৌরভের মতোই তাকে সবসময় ঘিরে থাকে ভদ্র আচার-আচরণের একটি সূক্ষ্ম আবরণ, এত সূক্ষ্ম যে চট করে তা ধরা শক্ত। ছুঁচের কাজ করা দুপাশ কাটা নীলরঙের অঙ্গবাসে, আঁটসাঁট পায়জামায় তাকে যেন দেখায় কোন ধাতুর গড়া একটি মূর্তি। অন্যের হয়তো সে চেহারা ভাল লাগবে না, কিন্তু কনওয়ের বেশ ভাল লাগে।

আবহাওয়া বলতে গেলে, ঠিক তিব্বতী নয় বরং যেন চৈনিকই ; কনওয়ের কাছে সেটা বেশ ঘরোয়া মনে হয়। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে আর সকলের ভাল না-ও লাগতে পারে। বুটিদার পরদা আর দুটি একটি গালার সামগ্রী দিয়ে ছিমছাম সাজান ঘরটি তার খুব পছন্দ হয়। আলোকের ব্যবস্থা কাগজের তৈরি আলোকাধারগুলি হতে,—স্থির বাতাসে তারা অচঞ্চল। সব মিলে দেহ-মনে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে সে। কিছু আগে খাবারের সঙ্গে কোনরকম ওষুধ মেশান থাকতে পারে বলে যে সন্দেহ হয়েছিল এখন তাতে আর শঙ্কা জাগে না। যদিই বা কিছু থাকে, তাতে বারণার্ডের হাঁপানি সেরেছে, ম্যালিনসনের উগ্রতা হয়েছে প্রশমিত। তারা দুজনে ভাল করেই খেয়েছে, কথার চাইতে খাওয়াতে পেয়েছে বেশি তৃপ্তি। কনওয়েরও খুব খিদে পেয়েছিল, এবং কাজের কথা তাড়াতাড়ি শুরু করা রুচি-বিরুদ্ধ এজন্যে সে

খুশীই হয়। যাতে আনন্দ সেটা তাড়াহুড়ো করে সেরে নেওয়া তার স্বভাব নয়, তাই এদের ভোজন সম্পর্কিত আদব-কায়দা তার ভালই লাগল। খাওয়া-শেষে সিগারেট ধরিয়ে এইবার সে চ্যাঙের উদ্দেশ্যে বলল, আপনাদের সম্প্রদায়টিকে খুবই সৌভাগ্যশালী বলে মনে হয়, আর অতিথিপরায়ণ তো বটেই,—অবশ্য, এখানে তেমন অতিথি সমাগম হয় বলে ভাবা যায় না।

ক্বচিৎ কখনও। মাপা কথায় বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল চ্যাং, পৃথিবীর এ-অংশটিতে পর্যটকেরা আসেন না।

কনওয়ে হাসল, বলল ওটা আপনি বিনয় করে বললেন। আসতে আসতে যা দেখলাম তাতে মনে হলো পৃথিবী হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই অংশটি। বাইরের পৃথিবীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এখানে আলাদা একটি সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে।

কী বললেন যেন,—ছোঁয়াচ?

ওটা বলেছি অবশ্য নাচ-গান সিনেমা বিদ্যুৎ আলোর ঝলমলানি এই সবের কথা ভেবে। আপনাদের জলনিকাশ প্রভৃতির ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব আধুনিক,—আমার মতে প্রাচ্য কেবল এইটুকুই ভাল পেয়েছে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে। প্রায়ই আমার মনে হয়, রোমানদের ভাগ্য ভাল ছিল,—দেখুন না, যন্ত্রপাতি কলকব্জার সর্বনাশা জ্ঞান না থাকলেও—তাদের সভ্যতায় উষ্ণ-স্নান পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল।

থামল সে।—বিশেষ কিছু না ভেবেই কনওয়ে দ্রুতকণ্ঠে কথাগুলো বলে গেল। সেগুলো যে নিতান্তই মুখের কথা তা নয়; তবে সে চেষ্টা করছিল একটা অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে। আর, সে-বিষয়ে সে খুব পারদর্শী। চ্যাঙের পক্ষ থেকে ভদ্রতার এমনই একটা সূক্ষ্ম আবরণ টেনে রাখা হয়েছিল যে ইচ্ছা থাকলেও কনওয়ে নিজের কৌতূহল খুব বেশি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে পারে না।

মিস ব্রিনক্লোর এসব বালাই ছিল না। সে বলল দয়া করে আপনাদের মঠের কথা কিছু বলবেন কী ?—কথা গুলো খুব যে সবিনয়ে বলল তা নয়।

তার অস্থিরতায় চ্যাং প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ভুরুদুটো একটু তুলে বলল, সানন্দে বলব,—অবশ্য যতটুকু আমি পারি। আপনি ঠিক কী জানতে চান ?

প্রথমত, এখানে আপনারা কতজন আছেন, আর আপনাদের জাতিই বা কী ?—বাসকুলেব 'মিশনে' তার কণ্ঠে যে ভাব ফুটে উঠত এখানে তার চাইতে বেশী সরস শোনাল না।

চ্যাং উত্তর দিল, পূর্ণ লামাত্ব পেযেছেন এমন আছেন প্রায় পঞ্চাশ জন, তাছাড়া আমাদেব মতন আরও জনকতক রয়েছেন,—তাঁদেব এখনও পুরোপুরি দীক্ষা হয়নি। তবে আশা কবা যায়, যথাসময়ে তা হয়ে যাবে। যতদিন না হচ্ছি, ততদিন আপনি আমাদেব অর্ধ-লামা বলতে পাবেন। বহু জাতিরই প্রতিনিধি আমাদের মধ্যে আছেন, তবে চৈনিক আর তিব্বতী সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া স্বাভাবিক।

ভুল হলেও মিস ব্রিনক্লো একটা সিদ্ধান্তে আসবেই। সে বলল, বুঝেছি, তাহলে এটা একেবারে দেশীয় মঠ। আপনাদের প্রধান লামা তিব্বতী না চৈনিক ?

দুটির একটিও নন।

এখানে কোন ইংরেজ আছেন নাকি ?

জনকতক।

বলেন কি,—অদ্ভুত ব্যাপার !—দম নেবার জন্যেই মিস ব্রিনক্লো একটু থেমে আবার বলল, আচ্ছা, আরেকটা কথা, আপনাদের ধর্মমতের মূলকথা কি ?

কনওয়ে হেলান দিয়ে বসে সকৌতুকে উত্তরেব অপেক্ষা করতে লাগল। বিরুদ্ধ মতবাদীদের সংঘর্ষ দেখতে বরাবরই তার ভাল লাগে। লামা-দর্শনতত্ত্বে মিস ব্রিনক্লোর সরল অকপট অভিযান আমোদজনক হবে বলে মনে হয়।

আবার বিব্রত হোক এও সে চায় না। তাই সে মিস ব্রিনক্‌লোকে সামলে নিতে চায়, বলে আপনার প্রশ্নটি কিন্তু গুরুতর।

কিন্তু মিস ব্রিনক্‌লো চুপ করার পাত্র নয়। মদের প্রভাবে সকলেই যেন নিঝুম হয়ে আসে, কিন্তু সে আরও চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বেশ ঔদার্যের সঙ্গে সে বলল, খাঁটী ধর্মমতে আমি বিশ্বাসী, অবশ্য এটুকু স্বীকার করার মতো মনের প্রসারতা আমার আছে যে, বিদেশীরাও প্রায়ই নিজের নিজের ধর্মে অটল বিশ্বাসী। সত্যি বলতে কি মঠের লোকেরা আমার সঙ্গে একমত হবেন এমন আশা আমি করি না।

তার কথায় চ্যাং তাকে একটি কেতাদুরস্ত অভিবাদন জানাল। কেন হবে না? নিখুঁত ইংরেজিতে সে বলে গেল, এই কথাই কি ধরে নিতে হবে যে একটি ধর্মমত সত্য বলে আর সবগুলি আজগুবি?

সেইটেই তো স্বাভাবিক, নয় কি?

আবার কনওয়ে তাদের মাঝে পড়ে বলল, এসব নিয়ে তর্ক না করাই ভাল। কিন্তু এই অপূর্ব প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিস ব্রিনক্‌লো আমার মতই কুতূহলী।

ধীর কণ্ঠে প্রায় ফিস ফিস করে চ্যাং জবাব দিল, সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা পরিমিতি-বোধে বিশ্বাসী। সব কিছুরই আধিক্য এড়িয়ে চলার সাধনা আমরা করি,—হেঁয়ালি মাপ করবেন, এমন-কি ভালরও। যে উপত্যকাটি আপনারা দেখে এসেছেন সেখানে কয়েক হাজার অধিবাসী মঠের শাসনাধীনে বাস করে; আমরা দেখেছি আমাদের নীতি অনুসারে চলে তারা বেশ সুখী। আমরা পরিমিত কঠোরতার সঙ্গে তাদের শাসন করি এবং বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে পরিমিত আনুগত্য পেয়ে খুশী। এবং এ-কথা বললে বোধ হয় বেশি কথা বলা হবে না যে তারা পরিমিতভাবে মিতাচারী, সংযতচিত্ত ও সৎ।

কনওয়ে একটু হাসল। তার মনে হলো কথাগুলি বেশ সুন্দর করে বলা হয়েছে। তাছাড়া তার নিজের প্রকৃতির সঙ্গে যেন অনেকটা মেলে। বলল,

আপনার বক্তব্য বুঝেছি। আচ্ছা, আজ সকালে যাদের আমরা দেখলাম তারা কি সকলেই এই উপত্যকার অধিবাসী ?

হ্যাঁ। কেন, তারা আসবার সময় আপনাদের কাছে কোন দোষ করেনি তো ?

না না, মোটেই নয়। তবে আমি খুশী যে পাহাড়ের ওপর পদচালনে তারা অতিরিক্ত মাত্রাই নিশ্চিত। ভালকথা, আপনি বলছিলেন আপনাদের পরিমিতি-বোধ নীতিটি তাদের জন্যে, সে-নীতি কি আপনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ?

চ্যাং উত্তরে মাথা নেড়ে বলল, মিঃ কনওয়ে, আপনি এমন একটি বিষয় জানতে চান, যা নিয়ে আমি হয়তো কোন আলোচনা করতে পারব না,— সেজন্যে আমি দুঃখিত। এইটুকু শুধু আমি বলতে পারি যে, আমাদের ভেতর বহু মত ও বহু পথ-রয়েছে, আবার আমরা প্রায় সকলেই সেই সব মত ও পথের কিছুটা বিরোধী। এখন এর চাইতে বেশি কিছু বলতে পারলাম না বলে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।

না না—তার জন্যে কিন্তু বোধ করবেন না। কিছুটা আমি অনুমান করে নেব, তাতে আনন্দ আছে। কনওয়ে তার কণ্ঠস্বরে এবং শরীরে এমন একটা অনুভূতি বোধ করে যে তার আবার মনে হয় হয়তো তাকে সামান্য ওষুধই খাওয়ান হয়েছে। ম্যালিনসনেরও সেই একই অবস্থা ; তবুও সুযোগ পেয়ে সে না-বলে পারল না, এসব আলোচনা খুবই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু আমার মনে হয় ফিরে যাওয়ার প্ল্যান সম্পর্কে পরামর্শ শুরু করা দরকার। যত শিগগির সম্ভব আমরা ভারতবর্ষে ফিরতে চাই। আচ্ছা, কতগুলি কুলি পাওয়া যেতে পারে ?

প্রশ্নটি এতই বাস্তব, এতই রুক্ষ যে ক্ষণপূর্বের রম্য আবহাওয়াটি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর চ্যাং বলল, মিঃ ম্যালিনসন, দুর্ভাগ্যক্রমে

ওবিষয়ে আমার কিছু করার নেই। কিন্তু সে যাই হোক, আমার তো মনে হয় না যে এখনই ব্যবস্থা করা সম্ভব।

কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। ফেরার পর আমাদের বহু কাজ, তাছাড়া আমাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলেই আমাদের জন্যে ভেবে অস্থির হচ্ছেন। না, না, আমাদের ফিরতেই হবে। আমাদের জন্যে আপনি যা করেছেন তার জন্যে আমরা আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে হাত পা গুটিয়ে নিষ্কর্মা হয়ে এখানে বসে থাকতে পারি না। যদি সম্ভব হয়, তাহলে কালই আমরা বেরিয়ে পড়তে চাই। আপনাদের অনেকেই আমাদের স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে আশা করি,—অবশ্য তাদের যোগ্য মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত।

কেমন একটা দুর্বল ভঙ্গিতে ম্যালিনসন কথা শেষ করল; যেন সে আশা করেছিল অত কিছু বলার আগেই সে কোন উত্তর পাবে। কিন্তু এত কথার পর চ্যাঙ শান্ত কণ্ঠে যেন একটু কাঠিন্যের সঙ্গেই বলল, বলেছি তো, এসব আমার এলাকার বাইরে।

বাইরে? কিন্তু একটা কাজ আপনি করতে পারেন অন্তত,—এখানকার একটা বড়ো মানচিত্র জোগাড় করে দিলে তাতে আমাদের অনেকটা সাহায্য করা হবে। মনে হয় দীর্ঘ পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে, তাই তো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাই। মানচিত্র নিশ্চয় আপনাদের আছে?

তা অনেক আছে।

যদি কিছু মনে না করেন, আমরা তার কয়েকটি ধার নেব। পরে সেগুলো আপনাদের ফেরত দিতে পারব; বাইরের সঙ্গে আপনাদের নিশ্চয়ই মাঝে-মাঝে যোগাযোগ হয়। ভাল কথা, বন্ধুবান্ধবদের আশ্বস্ত করার জন্যে একটা খবর পাঠিয়ে দিলে তো মন্দ হয় না! টেলিগ্রাফ অফিস এখান থেকে কতদূর হবে, মিঃ চ্যাং?

চ্যাঙের রেখাবহুল মুখটিতে তখন অসীম ধৈর্যের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। কিন্তু কোন উত্তর দিল না সে।

মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করে ম্যালিনসন আবার শুরু করল, আপনাদের কিছু দরকার হলে কোথায় লোক পাঠান?—কিছু মানে সভ্যজগতের কোন কিছু।

তার চোখে আর কণ্ঠস্বরে যেন একটা ভীতির চিহ্ন ফুটে ওঠে। হঠাৎ চেয়ার ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল সে। তখন সে বিবর্ণ হয়ে গেছে, ক্লান্তভঙ্গিতে কপালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে কোনরকমে বলল সে, এত ক্লান্ত লাগছে!—ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে বলে, আপনারা কেউই আমাকে সাহায্য করতে চান না দেখছি। আমার প্রশ্ন অতি সরল, তার উত্তর আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। এই যে স্নানের আধুনিক সাজসরঞ্জাম আপনারা বসিয়েছেন, সে সব এখানে এল কী করে?

আবার সেই নীরবতা।

বলবেন না তা হলে? বোধ করি এটাও এখানকার আর সব কিছুর মতো রহস্যময়। কনওয়ে, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তুমি খুবই ঢিলে। সত্যি ব্যাপারটা তুমি জানার চেষ্টা করছ না কেন? এখনকার মতো যাই হোক কিন্তু কাল, মনে রেখ—কাল আমাদের বেরুতেই হবে।

কনওয়ে যদি সেই সময় তাকে ধরে ফেলে একটা চেয়ারে বসিয়ে না দিত তাহলে হয়তো সে মেঝে লুটিয়ে পড়ত। চেয়ারে বসে একটু সুস্থ হলো সে, কিন্তু আর কিছু বলল না।

মৃদুকণ্ঠে চ্যাং বলল, কাল উনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবেন। এখানকার বাতাস নবাগতদের প্রথমদিকে একটু কষ্ট দেয়, তারপর অভ্যাস হয়ে যায়।

কনওয়ে যেন একটা আচ্ছন্নতা কাটিয়ে জেগে উঠল। কতকটা বিমর্ষ কণ্ঠে বলল সে, ওর কাছে সব কিছু যেন কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তারপর সজীবকণ্ঠে সে বলে চলল, অবশ্য আমাদের সকলকার ক্ষেত্রেই কমবেশি তাই।

যাই হোক, আমার মনে হয় আজকের মতন এ-প্রসঙ্গ মুলতুবি থাক, এখন ঘুমতে যাওয়াই ভাল। বারণার্ড, তুমি ম্যালিনসনের ওপর একটু নজর রেখ; আর মিস ব্রিনক্লো, আপনারও নিশ্চয়ই ঘুমের দরকার হয়েছে?

ইতিমধ্যে বোধ করি ইশারা পেয়েই একজন ভৃত্য এসে ঘরে ঢুকল। কনওয়ে বলল, হ্যাঁ এঁরা শুতে যাবেন—গুড নাইট—গুড নাইট—আমি যাচ্ছি এখুনি। তাদের প্রায় জোর করেই ঘরের বার করে দিয়ে, কোন রকম আড়ম্বর না করেই—তার আগেকার ব্যবহারের তুলনায় সেটা স্পষ্টই চোখে পড়ে—সে চ্যাঙের দিকে ফিরল। ম্যালিনসনের ভৎর্সনায় সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

বলল সে, শুনুন আপনাকে আমি বেশিক্ষণ আটকে রাখতে চাই না, তাই একেবারে কাজের কথা পাড়াই ভাল। আমার বন্ধু অধীর হয়ে উঠেছে, কিন্তু আমি তার দোষ দিই না, কথাবার্তা পরিষ্কার করে নেওয়াই ভাল। আমাদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু আপনার বা এখানকার আর কারুর সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। অবশ্য কালই যাওয়া যে অসম্ভব তা আমি জানি, আর আমার কথা যদি বলেন, দিনকতক এখানে থাকতে আমার ভালই লাগবে। কিন্তু আমার সঙ্গীদের মনোভাব তা নয়। আপনি আমাদের জন্যে কিছু করতে পারবেন না বলছেন; তাই যদি হয় তাহলে দয়া করে এমন কারুর পরিচয় করিয়ে দিন যিনি পারবেন।

চ্যাং বলল, আপনার বন্ধুদের চাইতে আপনি বেশী বুদ্ধিমান, তাই তাঁদের মতো অধীর হয়ে ওঠেন নি,—আমি আনন্দিত হলাম মিঃ কনওয়ে।

ওটা কিন্তু আমার কথার উত্তর নয়।

তার কথায় চ্যাং হাসতে শুরু করল, জোর করে দমক দিয়ে সে হাসে। কনওয়ে বুঝতে পারল এটি চৈনিকদের রীতি। কোন বিশ্রী অবস্থায় পড়লে তারা এই ধরণের রসিকতার ভান করে কোন রকমে মুখ বাঁচায়। কিছু পরে তার উত্তর এল, আপনার চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। আপনাদের

প্রয়োজন মতো যা কিছু সাহায্য আমাদের কাছ থেকে যথাসময়ে নিশ্চয়ই পাবেন। বুঝতেই পারছেন অসুবিধে অনেক; কিন্তু অবুঝ না হয়ে এবং মিছিমিছি তাড়াহুড়ো না করে—

আমি তাড়াহুড়ো করতে বলছি না। আমি শুধু কুলিদের খবর জানতে চাইছি।

দেখুন, ওই তো আর এক সমস্যা। আমার তো মনে হয় না যে, আপনাদের সঙ্গে যেতে রাজি এমন লোক এখানে সহজে পাবেন। ঘর বাড়ি ছেড়ে উপত্যকার বাইরে অত কষ্টকর দূর যাত্রায় ওরা যেতে চায় না।

তাদের রাজি করতে হবে কোনরকমে,—আজই তো সকালে তারা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল।

আজ সকালে? ও, সে আলাদা ব্যাপার।

মানে? দৈবক্রমে আপনার সঙ্গে যখন আমাদের দেখা হয় তখন কি আপনি কোথাও যাচ্ছিলেন না?

এ প্রশ্নের কোনই উত্তর এল না। একটু থেমে কনওয়ে আরও শান্ত স্বরে বলল, বুঝেছি, তাহলে দেখা হওয়াটা আকস্মিক নয়। এই কথাটাই আমি তখন থেকে ভাবছিলাম। আমাদের জন্যেই আপনি তাহলে গিয়েছিলেন। তা'হলে আমাদের আসার খবরটা আপনারা আগেই পেয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: কী করে পেলেন।

তার শেষের কথাগুলি যেন ঘরের জমাট স্তব্ধতা কেটে বসে গেল। লণ্ঠনের আলোয় চ্যাঙের মুখটি দেখা যায়—ভাবলেশহীন যেন পাথরের সে মুখ। হঠাৎ হাতের মৃদু সঞ্চালনে একটা জানালার পর্দা সরিয়ে সে স্তব্ধতাকে চ্যাং ভেঙে দিল। জানালা দিয়ে বারান্দা দেখা যায়। তারপর কনওয়ের হাতে মৃদু আকর্ষণ করে সে তাকে বাইরের জমাট ঠাণ্ডা বাতাসে নিয়ে এল। স্বপ্নালু-কণ্ঠে বলল সে, আপনি খুবই বুদ্ধিমান, কিন্তু একেবারে অভ্রান্ত নন। তাই

বলছিলাম এসব কথা বলে আপনার বন্ধুদের যেন ভাবিয়ে তুলবেন না। বিশ্বাস করুন, শ্যাংগ্রি-লাতে আপনার বা আপনার বন্ধুদের এতটুকু বিপদ হবে না।

বিপদের কথা তো আমরা ভাবছি না, আমরা ভাবছি দেরি হওয়ার কথা।

সে আমি বুঝছি; কিন্তু এটুকু দেরি হয়তো হতে পারে,—অনিবার্য বলেই।

যদি তা সত্যিই অল্পকালের জন্যে হয় আর যদি সেটুকু অপরিহার্যই হয় তাহলে আমাদের যেমন করেই হোক ধৈর্যধারণ করতে হবে।

এই তো ঠিক কথা! আপনি এবং আপনার বন্ধুরা এখানে প্রতিটি মুহূর্ত পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করুন এইটুকু আমরা চাই।

বেশ, ভাল কথা,—আমি তো বলেছি, আমার নিজের দিক থেকে আপত্তি নেই। এক বিচিত্র নতুন অভিজ্ঞতা, তাছাড়া খানিকটা বিশ্রামেরও তো দরকার।

কারাকালের উজ্জ্বল পিরামিডের দিকে সে তাকিয়েছিল। ঠিক এই সময় উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে বিরাট নীল আকাশের কোলে তাকে এত স্পষ্ট দেখাল যে মনে হলো যেন হাত বাড়িয়ে তাকে ছোঁয়া যায়।

চ্যাং বলল, কাল আপনার আরও ভাল লাগতে পারে; আর যদি বিশ্রামের কথা বলেন, এর চাইতে ভাল জায়গা পৃথিবীতে আর কোথাও খুঁজে পাবেন বলে মনে হয় না।

সত্যিই কনওয়ে যতই শৃঙ্গটির দিকে তাকিয়ে থাকে ততই যেন তার সারা শরীরে নেমে আসে গভীর শান্তির পরশ, যেন দৃশ্যটি শুধুই মনকে ভরিয়ে দেয় না, চোখও ভরিয়ে দেয়। গতরাত্রে উচ্চভূমিতে ঝড় মাতামাতি করেছে, আজ রাতে যেন বাতাসে স্পন্দন নেই। তার মনে হয়, যেন উপত্যকাটি স্থলবেষ্টিত একটি বন্দর, সেথায় লাইটহাউসের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে কারাকাল। উপমাটি তার মনে আসে, কেননা সত্যসত্যিই কারাকালের শিখরদেশ থেকে নীলাভ আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হলো

কারাকাল শব্দটির অর্থ কি চ্যাংকে প্রশ্ন করলে হয়। উত্তরে চ্যাং তার স্বভাবসিদ্ধ চাপা গলায় বলল, উপত্যকার ভাষায়, কারাকাল মানে 'নীল চাঁদ'।

শ্যাংরি-লার অধিবাসীরা যে তাদের আসার কথা আগে থেকে জানত একথা কনওয়ে কাউকে বলল না। প্রথমে তার মনে হয়েছিল, এরকম একটা গুরুতর কথা তাদের বলা উচিত। কিন্তু সকাল হতে কথাটা আর তেমন পীড়া দেয় না, তাই কেন আর সে অন্যের পীড়ার কারণ হয়। তার শুধু বারে-বারে মনে হয়, এ জায়গাটির সর্বাংগ ঘিরে জড়িয়ে রয়েছে কি একটা রহস্য, গতরাত্রে চ্যাঙের ভাবগতিকও বিশেষ ভাল ঠেকেনি। এখানকার কর্তৃপক্ষ যদি সাহায্য করতে না চায় তাহলে তারা বন্দী ছাড়া আর কি! তাহলে তার কর্তব্য হচ্ছে তাদের কাছ হতে জোর করে সাহায্য আদায় করা। আর যাই হোক সে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একজন প্রতিনিধি; তার সঙ্গত অনুরোধ রক্ষা না করলে আইনত এদের অপরাধী হতে হবে। এইটেই হচ্ছে স্বাভাবিক ও সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি। এই ধরণের মনোভাব কনওয়ের ব্যক্তিসত্তায় মিশে আছে, প্রয়োজন হলে তার চাইতে শক্তমন কেউ হতে পারে না; ইভাক্যুয়েশনের আগে সেই কঠিন দিনগুলিতে কনওয়ে এমনভাবে সব দিক বজায় রেখে কাজ করেছিল যে তাতে তার নাইটহুড পাওয়া উচিত ছিল কিংবা তাকে নায়ক করে ছেলেদের জন্যে উপন্যাস লিখিত হওয়া উচিত ছিল। বিদেশী-বিরোধীদের উস্কানিতে বাসকুলের রক্তোন্মত্ত বিপ্লবের দিনে শিশু ও নারী সমেত বহু অসামরিক অধিবাসীদের ভার নিয়ে তাদের কনস্যুলেটে আশ্রয় দেওয়া এবং তারপর বিপ্লবীদের ভয় দেখিয়ে খোশামোদ করে তাদের কাছ থেকে পাইকারী ইভাক্যুয়েশনের অনুমতি আদায় করা,—এ-কাজগুলোকে খুব সামান্য বলা যায় না। তেমন লেখালেখি করলে আর ঠিকমতন তদ্বির করতে পারলে আগামী নববর্ষে হয়তো একটা খেতাব জুটে যেত। সে যাই হোক, ম্যালিনসনের অন্তত অকৃত্রিম প্রশংসা সে পেয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়,

এখন হয়তো সে তার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছে। এটা খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু লোকে যে ভুল বুঝেই তাকে ভালবাসে এটা কনওয়ের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। সে জানে সে কিছু একটা বিরাট পুরুষ নয়, যেটুকু সে করেছে তা নিতান্তই যেন ছোট্ট একটি একাঙ্কিকা,—ভাগ্য এবং বৈদেশিক দপ্তরের ইচ্ছাক্রমে সেটি অভিনীত হয় মাঝে মাঝে।

সত্যি কথা বলতে কি, রহস্যময় শ্যাংরি-লা আর তার নিজের সেখানে উপস্থিতি ক্রমেই যেন তার ওপর একটা বিচিত্র মোহ বিস্তার করতে থাকে। ব্যক্তিগত কোন অভিযোগ সে বিশেষ খুঁজে পায় না। চাকরির খাতিরে পৃথিবীর অদ্ভুত স্থানগুলিতে তাকে ঘুরতে হতো ; আর সেই সব জায়গাগুলো যত বেশি অদ্ভুত হতো ততই সে একঘেঁয়েমি থেকে পরিত্রাণ পেত। তাহলে হোয়াইট হলের আদেশের পরিবর্তে একটা দুর্ঘটনা তাকে পৃথিবীর সব চাইতে বিচিত্র দেশে এনেছে বলে তার অভিযোগ কি থাকতে পারে ?

সত্যি কথা, কোনও অভিযোগই তার নেই। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে যখন সে কোমল নীল আকাশ দেখতে পেল তখন তার মনে হলো অন্য কোথাও সে যেতে চায় না—সে পেশোয়ারই হোক, আর পিকাডিলিই হোক। একটি রাত্রি পূর্ণ বিশ্রাম পেয়ে তার সঙ্গীরাও বেশ সহজ হয়ে উঠেছে দেখে সে খুব খুশী হলো। বিছানা, স্নানঘর, প্রাতরাশ এবং আরও সব টুকিটাকি জিনিস নিয়ে বারণার্ড তো সোৎসাহে রসিকতা শুরু করে দিয়েছে। মিস্ ব্রিনক্লো তো স্বীকারই করে ফেলল যে, তার ঘরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে এতটুকু খুঁত বের করতে পাবেনি। এমন কি ম্যালিনসনও, রাগ না কাটলেও, কিছুটা পরিতৃপ্ত মনে হলো। সে বলল, আজ আর দেখছি আমাদের যাওয়া হয়ে উঠবে না। এখানকার লোকগুলি নিতান্তই এদেশী, চটপট করে বা খুঁত না রেখে কোন কাজ এদের দিয়ে করান যেন একটা পর্ব।

কনওয়ে তার মন্তব্য মেনে নিল। এক বছর হতে চলল ম্যালিনসন

ইংলণ্ড ছেড়েছে ; একটা মত গঠনের পক্ষে সেটা কম সময় নয়,—অবশ্য কুড়ি বছর পরেও সে খুব সম্ভব ওই একই কথা বলবে। কথাটা খানিক সত্যও বটে। তাহলেও কনওয়ের মনে হয়, যে ইংরেজ আর আমেরিকানরা যেন অস্বাভাবিক উন্মত্ততায় পৃথিবীময় ছুটে বেড়াচ্ছে ; তাদের তুলনায় প্রাচ্যের লোকেরা দীর্ঘসূত্রী হলেও তারা নিতান্তই অলসপ্রকৃতির নয়। এ-কথা হয়তো তার পশ্চিমী-বন্ধু কেউই স্বীকার করতে চাইবে না, কিন্তু তার বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ-ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে। অবশ্য চ্যাং কথার মারপ্যাঁচের গুরুমশাই, ম্যালিনসনের ধৈর্যচ্যুতি হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কনওয়েরও কেমন যেন অধীর হয়ে ওঠার বাসনা হয় ; ম্যালিনসন কত সহজেই-না অস্থির হয়ে ওঠে। কনওয়ে বলল আজকের দিনটা দেখা যাক-না কী হয়। কাল রাত্তিরেই কিছু একটা আশা করা বড্ড বেশি হতো।

ম্যালিনসন রাগতভাবে বলে উঠল, অত অস্থির হয়ে আমি নির্বুদ্ধিতা করেছি বলে তোমরা ঠাউরেছ, না ? কিন্তু অস্থির না হয়ে আমি পারিনি, চীনাটাকে আমার সন্দেহ হয়। কাল আমি শুতে যাবার পর তুমি তার কাছ হতে কোন কথা বার করতে পেরেছ ?

বেশিক্ষণ আমাদের কথা হয়নি। তার অনেক কথাই কেমন যেন অস্পষ্ট, তাছাড়া বহু প্রশ্ন সে এড়িয়ে যেতে চায়।

আজও আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

নিশ্চয় ।—সায় দিয়ে কনওয়ে বলল, এখন তো প্রাতরাশে মন দেওয়া যাক—চমৎকার প্রাতরাশ।

প্রাতরাশে ছিল পয়েলো, চা আর চাপাটি—নিখুঁতভাবে তৈরী, নিখুঁত পরিবেশন।

খাওয়ার শেষদিকে চ্যাং প্রবেশ করে ঈষৎ নত মস্তকে বিনীতভঙ্গিতে যথারীতি সম্ভাষণ জানাল,—ইংরেজি-ভাষায় তার সে-সম্ভাষণ একটু বাড়াবাড়িই মনে হলো। তার সঙ্গে চৈনিক ভাষাতে কথা বলার ইচ্ছা হয় কনওয়ের,

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো, প্রাচ্যের কোন ভাষায় তার দখল আছে একথা যখন ওরা জানে না তখন তা না জানানই ভাল, দরকারের সময় অনেক কাজ দেবে। চ্যাঙের কথাগুলি গম্ভীর হয়ে শোনার পর বলল যে, রাত্তিরে তার ঘুম মন্দ হয়নি, আর এখন অনেকটা ভাল বোধ করছে। তাতে আনন্দ প্রকাশ করে চ্যাং বলল, সত্যি, আপনাদের কবি ঠিকই বলেছেন, নিদ্রা সর্বকষ্টহর।

কিন্তু তার এ পাণ্ডিত্যটুকুকে কেউই ভালভাবে গ্রহণ করল না। কবিতার উল্লেখে যে কোন বলিষ্ঠমন ইংরেজ যুবকের মনে যে ভাবের উদয় হয় ম্যালিনসন ঠিক সেইরকম অবজ্ঞার সঙ্গেই বলল, উদ্ধৃতিটা কোথাকার তা ঠিক মনে করতে না পারলেও বোধহয় আপনি শেক্সপীয়র থেকেই বললেন। কিন্তু আমি একটি জানি, সেটি হচ্ছে, 'কারুর আদেশের জন্যে অপেক্ষা না করে এই মুহূর্তে যাত্রা শুরু কর'। এবং আমরা ঠিক তাই-ই করতে চাই। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি এই মুহূর্তে আজই সকালে কুলি সন্ধানে বেরতে চাই।

চ্যাং অবিচলিত। শেষে সে বলল, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আমি জানাচ্ছি যে, তাতে বিশেষ কোন ফল হবে না। ঘরবাড়ী ছেড়ে আপনার সঙ্গে যেতে কেউ স্বেচ্ছায় রাজি হবে বলে মনে হয় না।

এটা উত্তর হলো নাকি ?

আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু এ ছাড়া আর কীই-বা বলতে পারি।

বারণার্ড বলে উঠল, কাল রাত্তির থেকেই বোধহয় কথাটা ভেবে রেখেছেন। তখনও তো আপনি এখনকার মতন নিশ্চিত হতে পারেন নি।

আপনাদের ভয়ানক পরিশ্রান্ত দেখে কাল আপনাদের হতাশ করার ইচ্ছা হলো না। এখন এক রাত্রির বিশ্রামের পর, আপনারা সব কিছু যুক্তি-সঙ্গত-ভাবে বিচার করতে পারবেন মনে হয়।

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে কনওয়ে বলে উঠল শুনুন। ধোঁয়াটে প্যাঁচানো কথা আমরা চাইনে। আপনি জানেন, আমরা অনির্দিষ্টকাল ধরে এখানে

থাকতে পারি না, আবার আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমাদের ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়,—তাহলে আপনারা কী করতে চান বলুন ?

চ্যাঙের মুখ হাসিতে ভরে উঠল, কিন্তু তা যেন শুধু কনওয়র জন্যেই। বলল সে, আমার কথা তাহলে খুলে বলাই ভাল। আপনার বন্ধুর বাচনভঙ্গিতে আমার উত্তর দেবার কিছুই নেই, কিন্তু সঙ্গত দাবির জবাব আমাকে দিতেই হবে। আপনার বোধহয় মনে আছে, কাল আপনার বন্ধুই বলেছিলেন যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের মধ্যে মধ্যে যোগাযোগ করতেই হয়। সে কথা সত্যি। দূরদেশ থেকে কোন-না কোন জিনিষ আনার দরকার আমাদের প্রায়ই হয় এবং তা আমরা সময় মতন পেয়ে থাকি। কী করে তা আনাই তা বিস্তারিত করে বলে আপনাদের কষ্ট দেব না। কথা হচ্ছে, মালপত্তর নিয়ে এক-দল লোক এখানে খুব শিগগির পৌছবে আশা করা যায়; তারা মালপত্তর বুঝিয়ে দিয়ে আবার চলে যাবে। আমি বলি কি আপনারা তাদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে নিন। এছাড়া তো আর অন্য উপায় মাথায় আসছে না; আশা করি তারা যখন এসে পৌছবে—

রুক্ষকণ্ঠে বাধা দিল ম্যালিনসন, কবে তারা আসবে ?

আগে থেকে সঠিক তারিখ বলা অসম্ভব। কত বিপদ মাথায় করে এদিকে আসতে হয় তা তো আপনারা জানেন। পথে কত কী ঘটতে পারে—আবহাওয়া—

এবার কনওয়ে বাধা দিল, ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। আপনি বলছেন, মাল নিয়ে যাদের আসবার কথা রয়েছে তাদের সঙ্গেই আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু এ সম্পর্কে আরও একটু জানার আছে। প্রথম, আপনাকে আগেই সে প্রশ্ন করা হয়েছে, কবে তারা আসবে ? আর দ্বিতীয়, আমাদের তারা কোথায় নিয়ে যাবে ?

ওকথা আপনি তাদের কাছেই জেনে নেবেন।

তারা কি আমাদের ভারতবর্ষে নিয়ে যাবে ?

তা আমি কী করে বলব।

বেশ, এবার তাহলে অন্য প্রশ্নটায় আসা যাক। তারা কবে আসবে তার সঠিক তারিখ আমি চাই না, শুধু মোটামুটি জানতে চাই তারা পরের সপ্তাহে আসবে, না পরের বছর আসবে।

আজ থেকে মাসখনেক হতে পারে। মাসদুয়ের বেশি হবে না।

উগ্রকণ্ঠে ম্যালিনসন বলে উঠল, কিম্বা তিন, চার, পাঁচ মাস লাগতে পারে। আর আপনি আশা করেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা অনির্দিষ্ট-কাল ধরে এখানে বসে থাকব ?

অনির্দিষ্ট বলছেন কেন। নিতান্ত কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে আমি যতদিন বললাম তার বেশি আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে না।

কিন্তু দু'মাস! এই জায়গায়। অসম্ভব! কনওয়ে তুমিও বোধহয় ভাবতেই পারছ না ? দুসপ্তাহ যথেষ্ট।

চ্যাং ওঠার জন্যে তার অঙ্গবাস গুছিয়ে নিয়ে বলল, আমি দুঃখিত। আপনাদের কোনরকম আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তবে যতদিন এখানে থাকার দুঃখ আপনাদের বরাতে আছে, শ্যাংরি-লা আপনাদের সমাদরেই রাখবে।—আর কিছু আমার বলার নেই।

বলার দরকারও নেই।—ঝাঁঝিয়ে উঠল ম্যালিনসন, যদি ভেবে থাকেন যে আমাদের কায়দায় পেয়েছেন তাহলে বলব ভুল ভেবেছেন। আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না, প্রয়োজন মতো কুলি আমরাই জোগাড় করে নেব। আপনি সেলাম ঠুকুন, যা খুশি বলুন—

তার কাঁধে হাত দিয়ে কনওয়ে তাকে থামিয়ে দিল। রেগে গেলে ম্যালিনসন যেন ছেলেমানুষ হয়ে যায়, ভব্যতা বিচারবোধ সব ভুলে গিয়ে যা তার জিভের ডগায় আসে তাই বলতে শুরু করে। অবশ্য এরকম পরিবেশে সে ক্ষমার্হ; কিন্তু তার ভয় চৈনিকের সূক্ষ্ম অনুভূতি অপমান বোধ করতে পারে। সৌভাগ্যবশত ব্যাপারটা আরও অপ্রীতিকর হবার আগেই চ্যাং বুদ্ধিমানের মতো সেখান থেকে সরে যায়।

পাঁচ

বাকি সকালটুকু তাদের এই সব আলোচনাতেই কেটে গেল। চ্যাঙের কথায় তারা সকলেই যে বেশ একটু ঘাবড়ে গেল তা বলাই বাহুল্য। কোথায় তারা এখন পেশোয়ারের ক্লাবে বা মিশন হাউসে আনন্দ করবে, তা নয় এখন তাদের দুটি মাস কাটাতে হবে একটা তিব্বতী মঠে। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আসার প্রথম ধাক্কাটা সামলাবার পর ক্রোধ বা বিস্ময় বড় একটা থাকে না। ম্যালিনসনেরও হলো তাই। অত তর্জন গর্জনের পর সে যেন কেমন বিহ্বল হয়ে নিজেকে বুরাতের ওপর ছেড়ে দিল। বলল, কনওয়ে আর আমি তর্ক করতে পারছি না।—সিগারেটে কয়েকটি দুর্বল টান দিয়ে বলল সে, আমার যে কী হচ্ছে তা তুমি বুঝতেই পারছ। বরাবরই তো আমি বলছি ব্যাপার গোলমেলে। আমি এই মুহূর্তে এ-চক্রান্ত থেকে মুক্তি পেতে চাই।

তোমার কোন দোষ নেই ম্যালিনসন—কনওয়ে বলল, আমরা কি চাই সেটা কিন্তু প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কী দুর্ভোগ সইতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এরা যদি আমাদের দরকারমতো লোক দিয়ে সাহায্য না করে বা করতে না চায়, তাহলে যে-দলটি আসছে তাদের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া করার কিছু দেখিনে। আমরা সত্যি একেবারে নিরুপায়।

তার মানে, দু মাস আমাদের এখানে থাকতে হবে?

তাছাড়া আর কী করতে পারি বল।

জোর করে সহজ হবার চেষ্টা করে সিগারেটের ছাই ফেলতে ফেলতে বলল ম্যালিনসন, বেশ তাহলে তাই হোক। দু মাস তো। তাহলে এস আনন্দধ্বনি করা যাক।

কনওয়ে বলল, পৃথিবীর অন্য কোন নির্বান্ধব অংশে কাটানর চাতে এখানেই যে আরও খারাপ লাগবে বলে তো আমার মনে হয় না। আমার মতো যাদের বৃত্তি তারা তো পৃথিবীর অদ্ভুত জায়গাগুলিতে যেতেই অভ্যস্ত। অবশ্য যাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন রয়েছেন তাদের খারাপ লাগবে। সেদিক থেকে আমার ভাগ্য ভাল—এমন কারুর কথা তো আমার মনে পড়ে না যে আমার জন্যে চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠবে। আর কাজ, তা যে রকমই হোক-না, অন্য যে কোন লোককে দিয়ে অক্লেশে চালান যাবে।

সে অন্য সকলের দিকে তাকাল যেন তাদের বক্তব্য শুনতে চায়। ম্যালিনসন কোন কথা বলল না; কিন্তু কনওয়ে তার কথা মোটামুটি জানে। ইংলণ্ডে তার মা-বাবা আছেন, আর আছে প্রিয়া, তাইতো তার কষ্ট।

আর বারণার্ড তার স্বভাবসুলভ পরিহাসের ভেতর দিয়ে অবস্থাটাকে স্বীকার করে নিল। সে বলল, এই আমার তো মনে হয় আমার বরাত ভাল, মাস দুই চিত্তশোধনাগারে কাটালে আমি কিছু মরে যাব না। বাড়ির কেউ আমার কথা ভুলেও ভাববে না,—তারা জানে চিঠিপত্তর লেখা আমার ধাতের বাইরে।

কনওয়ে বলল, কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ আমাদের নাম কাগজে বেরুবে। আমরা নিখোঁজ, তা পড়ে লোকে খারাপটাই ধরে নেবে।

পলকের জন্যে বারণার্ড চমকে উঠল তারপর একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, তা সত্যি, কিন্তু তাতেও আমার কিছু যাবে-আসবে না।

তার উত্তরটা অস্পষ্ট হলেও কনওয়ে খুশি হলো। তারপর সে মিস ব্রিনক্লোর দিকে তাকাল। চ্যাং যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কোন কথাই সে বলেনি, এখনও সে চুপচাপ। কনওয়ের মনে হয়, হয়তো তারও ভাবনার বিশেষ কারণ নেই। বেশ সজীবকণ্ঠেই বলল সে, মিঃ বারণার্ড যা বললেন ঠিকই,—দুটো মাস, তা নিয়ে হৈ চৈ করার কী আছে! ঈশ্বরের কাজ—তা

সে পৃথিবীর যেখানে হোক-না কেন কিছু যায়-আসে না। ঈশ্বরই আমাকে এখানে এনেছেন—এ তাঁরই নির্দেশ।

কনওয়ে ভাবে, এই রকম অবস্থায় এ-ধরণের মনোভাবে সুবিধে আছে। সে আরও উৎসাহ দিয়ে বলল, আপনি ফেরার পর দেখবেন 'মিশন' আপনার ওপর খুশী হয়েছে। তাদের আপনি কত প্রয়োজনীয় সংবাদ দিতে পারবেন। আমরা সকলেই কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরব,—তবু যা হোক এইটুকু সান্ত্বনা।

তারপর তাদের আলোচনা সাধারণের পর্যায়ে নেমে এল। মিস ব্রিনক্লো আর বারণার্ড যেভাবে তাদের অবস্থাটাকে মেনে নিয়েছে তাতে কনওয়ে বিস্মিত হয়। তার দুর্ভাবনাও কিছুটা কমে। এখন তার ভাবনা শুধু ম্যালিনসনকে নিয়ে। এতক্ষণের উত্তেজনার পর যেন তার মনে একটু প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে; এখনও সে বিচলিত, কিন্তু এখন যেন সে ভাল দিকটাও দেখবার চেষ্টা করছে। সে বলল, ঈশ্বর জানেন, আমরা এখানে কী করব।—এই ধরণের মন্তব্যটি শুনে মনে হয় সে যেন নিজেকে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করছে।

কনওয়ে বলল, প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যাতে আমরা পরস্পরের বিরক্তির কারণ না হই। ভাগ্যক্রমে, এ জায়গাটা দেখছি বেশ বড়, আর লোকজনও বিশেষ নেই। চাকর-বাকর বাদ দিয়ে এ-পর্যন্ত আমরা একজন ছাড়া আর কাকেও দেখিনি।

বারণার্ড আরেকটি আশার বাণী শুনল। বলল, এ-পর্যন্ত যে আহার্য আমাদের দেওয়া হয়েছে তাই যদি নমুনা হয় তাহলে আমাদের অন্তত উপোস করতে হবে না। দেখ কনওয়ে, টাকাকড়ি এদের যথেষ্ট আছে। স্নানের ঘা ব্যবস্থা দেখলাম তাতে তো রীতিমত খরচ হয়েছে। অথচ এখানে কেউ যে তেমন রোজগার করে বলেও তো আমার মনে হয় না,—উপত্যকার লোকদের হয়তো কাজকর্ম আছে, কিন্তু তা হলেও তারা এমন কিছু উৎপন্ন করে না যে

বাইরে চালান দিতে পারে। খনি-টনি কিছু আছে কিনা আমার জানার ইচ্ছে হচ্ছে।

এখানকার সব কিছু রহস্যময়।—ম্যালিনসন উত্তর দিল, জেসুইটদের মতন এদের ঘড়া ঘড়া লুকনো টাকা আছে বলে মনে হয়। স্নানঘরের কথা যদি বল, হয়তো ওদের কোন ক্রোড়পতি অনুগামী করিয়ে দিয়েছে। যাকৃগে, একবার এখান থেকে সরে পড়তে পারলে আর আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। অবশ্য এ-কথা বলব যে এখানকার দৃশ্য বেশ ভালই। ঠিক জায়গায় অবস্থিত হলে স্থানটি শীতকালীন খেলাধূলার পক্ষে চমৎকার হতো। সামনের ওই ঢালগুলোয় স্কিইং করা যায় না ?

সকৌতুকদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করে বলল, কাল গোটা কতক ইডেলউইসের চারা আবিষ্কার করেছিলাম বলে তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে যে এটা আল্পস্ নয় ; আজ একই কথা বলার পালা আমার।—দেখো, এখানে স্কিইং-এর খেল দেখাবার উৎসাহ আসে না যেন।

এখানকার কেউ কখনও স্কি-জাম্প দেখেছে বলে আমার মনে হয় না। আর আইস-হকি ম্যাচও দেখেনি নিশ্চয়।—রসিকতা করে কনওয়ে বলল, এক কাজ কর-না ম্যালিনসন, গোটাকতক টীম তৈরি করে ফেল। একটা জেণ্টেলমেন বনাম লামা খেলা হলে কেমন হয় ?

তাতে অন্তত এরা খেলাটা শিখতে পারবে।—অপরূপ গাম্ভীর্যের সংগে মিস ব্রিনক্লো বলল।

এর ওপর কিছু বলা বেশ শক্ত হতো, কিন্তু বলার দরকার হলো না। মধ্যাহ্নভোজের পরিবেশন শুরু হলো,—তার বৈশিষ্ট্যে তাদের কথা বন্ধ হলো। তারপর চ্যাং যখন এলো তখন আর তর্ক করার মতন উৎসাহ কারুর নেই। সুচতুর চ্যাং এমন ভংগিতে তাদের সাথে কথাবার্তা বলল যেন কারুর সংগে তার সম্প্রীতি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি, আর এরা চারজন তা বুঝেও কোন প্রতিবন্ধকতা করল না। এমন কি যখন সে বলল যে, যদি তারা মঠটি ঘুরে ফিরে

দেখতে চায় তাহলে সে আনন্দের সংগে তাদের পথপ্রদর্শক হতে রাজি, তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রস্তাবে সম্মত হলো।

কেন দেখব না? নিশ্চয় দেখব।—বারণার্ড বলল, যতক্ষণ আছি ততক্ষণ সব দেখে নেওয়া যাক-না। আবার এখানে কে কবে আসব কে জানে।

মিস ব্রিনকৃলো আরও গভীর তত্ত্ব আওড়াল। চ্যাঙের সংগে যেতে যেতে অস্ফুটকণ্ঠে বলল সে, বাসকুলে যখন প্লেনে উঠি তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই-রকম একটা জায়গায় এসে হাজির হব।

সংগে সংগে ম্যালিনসন ফোঁস করে উঠল,—এবং এখনও অবধি জানি না, পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এখানেই বা এলাম কেন!

জাতি বা বর্ণবিদ্বেষ কনওয়েয় কোনকালেই নেই। তবে ক্লাবে বা রেল গাড়িতে লালমুখ ও টুপির অজুহাতে যখন কষ্ট থেকে রেহাই পেয়েছে তখন কিছুটা অভিনয় করেনি এমন নয়;—যেমন বিশেষ করে ভারতবর্ষে। কিন্তু চীনে তাকে এ-অবস্থায় বিশেষ পড়তে হয়নি; সেখানে তার অনেক চৈনিক বন্ধু রয়েছে, আর কোনদিন মুহূর্তের জন্যেও তাদের সে কোন অংশে নিকৃষ্ট মনে করেনি। তাই চ্যাঙের সঙ্গে আলাপে সে তাকে একজন সভ্যভব্য চৈনিক ভদ্রলোক হিসেবেই দেখেছে,—তবে হ্যাঁ, হয়তো ততটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা অনস্বীকার্য। ম্যালিনসন তাকে যেন একটা কল্পিত খাঁচার মধ্যে গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখেছিল; মিস ব্রিনকৃলো দেখেছিল অজ্ঞান অন্ধকারের আচ্ছন্ন এক বিধর্মীরূপে; আর বারণার্ডের হালকা কথাগুলি যেন গৃহের পরিচারকের প্রতি উদ্দিষ্ট।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্যাংরি-লার সৌন্দর্য তাদের সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। কনওয়ে যে এই প্রথম সন্ন্যাসমঠ দেখল তা নয়। কিন্তু আর সবগুলির তুলনায় এটি নিশ্চয়ই অনেক বড়, এবং এর অদ্ভুত সংস্থান বাদ দিলেও, অসাধারণ।

শ্যাংরি-লার প্রাংগণ আর ঘরগুলি ঘুরতেই তাদের রীতিমত ব্যায়াম হয়ে গেল ; তবুও তো, কনওয়ে লক্ষ্য করছিল, চ্যাং অনেকগুলি ঘরেই তাদের নিয়ে গেল না। তবে যেটুকু তারা দেখল তাতে তাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ধারণা আরও দৃঢ়বদ্ধ হলো। লামারা যে প্রচুর ধনের অধিকারী সে-বিষয়ে বারণার্ডের আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইল না ; তারা যে দুর্নীতিপরায়ণ তার স্বপক্ষে মিস ব্রিনক্লো অসংখ্য প্রমাণ পেল। আর ম্যালিনসন, নূতনত্বের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাওয়ার পর, নিম্নভূমিতে দৃশ্য দেখে বেড়ানর মতই ক্লান্তি অনুভব করল ; লামাদের জন্যে তার মনে এতটুকুও শ্রদ্ধা জাগল না।

একমাত্র কনওয়েই তার ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়ে যায়। কোন বিশেষ বস্তু এককভাবে যে তাকে মোহিত করে তা নয়,—সৌন্দর্যের ক্রমপ্রকাশ, কোমল নিষ্কলঙ্ক রুচি, শুদ্ধশান্ত ছন্দোময়তা কনওয়ের চোখ দুটিকে আটক করে না, পরিতৃপ্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। সে তার শিল্পীমনকে জোর করে সরিয়ে সমালোচকের কোঠায় নিয়ে এলো। তখন দেখল, শ্যাংরি-লার ঐশ্বর্য পাবার জন্যে পৃথিবীর যে কোন ম্যুজিয়ম, যে কোন ক্রোড়পতি তার সব কিছু ধরে দিতে পারে।—মুক্তানীল সুংদেশীয় মৃন্ময় পাত্র, রঙিন তুলিতে আঁকা হাজার বছরের পুরাতন ছবি, লাক্ষাশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন—যেন রূপকথার বৈচিত্র্যময়তা শুধু রূপে ধরা দেয়নি, সুরেও বাঁধা পড়েছে। চীনামাটি আর লাক্ষার অনবদ্য শিল্পচাতুর্য মানুষকে ভাবিয়ে তোলার আগে তার মনকে পলকের জন্যে দোলা দিয়ে যায়। এতটুকু অহমিকা মিশে নেই শিল্পনিদর্শনগুলির সঙ্গে, কিছুই জোর করে চায় না তারা, শিল্পমানসকে করে না আঘাত। সেই সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য যেন ফুলের ঝরা দলেরই মত। যে কোন সংগ্রাহককে তারা পাগল করে তুলবে,—কিন্তু কনওয়ে সে-দলের নয়, তার অর্থও নেই, সংগ্রহ করার বাতিকও নেই। চৈনিক শিল্প সে ভালবাসে,—সেটা তার মনের ব্যাপার ; জগতের ক্রমবর্ধমান কোলাহল আর বিপুলতার মাঝে সে কোন সময়ে অতি সংগোপনে ভালবাসতে শুরু করে—শান্ত সূক্ষ্ম ছোট ছোট বস্তুকে। ঘরের পর ঘর অতিক্রম করতে করতে সে

যতই কারাকালের বিশালত্বের পাশে ভঙ্গুর সৌন্দর্যের কথা ভাবছিল ততই তার মনে কেমন একটা অস্পষ্ট বেদনা জেগে উঠছিল।

যাই হোক চৈনিক শিল্প ছাড়াও মঠটির আরও পুঁজি ছিল। তার একটি হোল বিরাট এক গ্রন্থাগার। চারদিকে অসংখ্য বই খাঁজে খাঁজে এমনই গুছিয়ে সাজান যেন সেখানে প্রকট হয় উঠেছিল প্রজ্ঞা—পঠন নয়, ফুটে উঠেছিল রুচির আবেদন—বিদ্যার্জনের প্রেরণা নয়। শেলফের ওপর চোখ বুলতেই কনওয়ে বিস্মিত না হয়ে পারল না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কিছুই প্রায় বাদ নেই; তাছাড়া আরও অনেক দুর্বোধ্য ও অদ্ভুত গ্রন্থও রয়েছে—তাদের গুণগ্রাহী হবার সাধ্য তার নেই। ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মানী ও রুশ ভাষায় বহু গ্রন্থ তো আছেই, তা ছাড়া চৈনিক এবং অন্য প্রাচ্যভাষারও অনেক বই। একটি অংশ তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করল,—সেখানটিতে রয়েছে কেবল তিব্বতী বই। অনেক দুষ্প্রাপ্য বইয়েরও দেখা পেল সে। বেলিগাত্তির লেখা "রিলেজিওন ইনেডিটা ডাই ওন ভিয়াগিও অল টিবেট" বইটি নিয়ে পাতা উলটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ সে লক্ষ্য করল চ্যাং কৌতূহলের দৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন করল সে, আপনি খুব সম্ভব পণ্ডিত, না?

চট করে কোন উত্তর কনওয়ের মুখে জোগাল না। অকস্‌ফোর্ডে তার অধ্যাপনাকালটি ধরলে তার কথায় কনওয়ের সায় দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু সে তা পারল না, কেন-না, চৈনিক সমাজে কথাটা বিশেষ সম্মানীয় হলেও ইংরেজ সমাজে কথাটায় কেমন যেন দাম্ভিকতার ছোঁয়াচ আছে। তার ওপর পাশেই রয়েছে তার সংগীরা। তাই একটু ইতস্তত করে বলল, না, তা নয়, তবে পড়াশোনা আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু চাকরীর খাতিরে গত ক'বছর ভাল করে পড়াশোনা করার সুযোগ মেলেনি।

এখনও আপনার সে ইচ্ছা আছে?

আছে একথা বলি কেমন করে,—তবে পড়াশুনার আকর্ষণ আমার সুপরিচিত।

ম্যালিনসন একটি বই দেখছিল, এই সময় বাধা দিয়ে বলল, কনওয়ে এই নাও তোমার পাঠ্যজীবনে কাজে লাগবে,—এখানকার মানচিত্র।

ও আমাদের এখানে শত শত রয়েছে।—চ্যাং বলল, তাদের যেটা খুশি দেখতে পারেন, কিন্তু একটা বিষয়ে আপনাদের পরিশ্রম বাঁচিয়ে দেওয়া সঙ্গত ভাবি। তাদের কোনটিতেই শ্যাংরি-লার উল্লেখ পাবেন না।

আশ্চর্য।—কনওয়ে বলল, কেন বলুন তো?

কারণ আছে, কিন্তু মাপ করবেন এর বেশি আমি বলতে পারব না।

কনওয়ে একটু হাসল। কিন্তু ম্যালিনসন আবার রেগে উঠল, বলল, ফের সেই রহস্য। এতক্ষণ তো আমরা এমন কিছু দেখলাম না যা গোপন রাখার জন্যে কেউ অস্থির হয়ে উঠতে পারে।

হঠাৎ যেন মিস্ ব্রিনক্‌লো স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে বলল, কর্মরত লামাদের দেখাবেন না আমাদের?

তা সম্ভব হবে না বলে আমি দুঃখিত।—চ্যাং জবাব দিল, লামাদের দর্শন বাইরের লোকের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে থাকে।

তাহলে আর সে আশা করে লাভ কি।—বারণার্ড বলল, কিন্তু সত্যিই এটা খুব দুঃখের কথা। আপনি জানেন না, আপনাদের প্রধান লামার সাথে পরিচিত হবার জন্যে আমি কত উৎসুক।

শান্ত গাম্ভীর্যের সংগে চ্যাং তার কথা মেনে নিল।

মিস্ ব্রিনক্‌লো তখনও নিরুৎসাহ হয়নি। প্রশ্ন করল, আচ্ছা লামারা কী করেন?

অনুধ্যান ও জ্ঞানসাধনা তাঁদের ব্রত।

কিন্তু তাকে কিছু করা বলে না।

তাহলে তাঁরা কিছুই করেন না।

আমিও তাই ভেবেছিলাম।—মিস্ ব্রিনক্লো বলল, মিঃ চ্যাং, আপনাদের মঠ দেখে আমার খুব আনন্দ হলো, কিন্তু এখানে কাজের কিছু হয় বলে মনে হয় না।—মানে, আমি বাস্তব দিকের কাজের কথা বলছি—

এখন একটু চা খাবেন নাকি?

কনওয়ের কানে তার কথাটা প্রথমে বিদ্রূপাত্মক শোনায়; কিন্তু পরমুহূর্তেই তার ভুল ভেঙে গেল। বিকেলটি কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছে তা সে বুঝতেই পারেনি, চ্যাং স্বল্পভোজী, কিন্তু চৈনিকদের মতো চায়ের ওপর তার ভারি টান, ঘন ঘন চা তার খাওয়া চাই। মিস ব্রিনক্লো বলল, আর্ট গ্যালারি আর ম্যুজিয়মে গেলেই তার মাথা ধরে। শেষে সকলেই চ্যাঙের প্রস্তাব সমর্থন করল। চ্যাঙের সংগে কয়েকটি প্রাংগণ পার হয়ে হঠাৎ তারা একটি অতুলনীয় সৌন্দর্যরাজ্যে প্রবেশ করল। সারি সারি থামের কোল দিয়ে একসার সিঁড়ি নেমে গিয়েছে একটি বাগানে। বাগানের মধ্যস্থলে একটি পদ্মদীঘি;—কী করে যে সেটি সেখানে খনন করা সম্ভব হলো তা সত্যই বিস্ময়। দীঘির জল দেখা যায় না,—পদ্মপাতায় আচ্ছন্ন, মনে হয় যেন আর্দ্র-সবুজ পাথরের তৈরি একটি মেঝে। দীঘির পাশে এখানে-ওখানে পিতলের তৈরি কয়েকটি সিংহ-ড্রাগন-য়ুনিকর্ণ মূর্তি—তাদের প্রত্যেকটিতে ভয়ংকরতা মাখান, কিন্তু তাতে পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং আরও সুন্দর হয়েছে। সারা দৃশ্যটা সামঞ্জস্যের সূত্রে এমনই গাঁথা যে ধীরেসুস্থে প্রতিটি খুঁটিনাটি দেখতে ইচ্ছে যায়। কোথাও বাড়াবাড়ি নেই, কেউ কারও সঙ্গে পাল্লা দেয় না। নীল টালি ছাওয়া ছাদগুলির ওপর দেখা যায় কারাকালের শুভ্র শৃঙ্গ।—অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির বন্ধনীতে কারাকালও যেন ধরা দিয়েছে। চ্যাঙের সঙ্গে একটি উন্মুক্ত প্যাভিলিয়নে যেতে যেতে বারণার্ড বলে উঠল, নাঃ জায়গাটা বেশ চমৎকার।

প্যাভিলিয়নে একটি হার্প সিকর্ড আর একটি আধুনিক পিয়ানো দেখে কনওয়ের আরও আনন্দ হলো। সেদুটি দেখে তার অবাক লাগে,—

বিস্ময়কর বৈকালিক অভিযানের মতন বিস্ময়। চ্যাং কনওয়েরের প্রতিটি প্রশ্নের সরল উত্তর দেয়, কিন্তু একটি সীমা সে লঙ্ঘন করে না। সে বলল, পাশ্চাত্য সংগীতের প্রতি, বিশেষ করে মোজার্টের প্রতি, আমাদের খুব শ্রদ্ধা; য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পীদের সুররচনা তাঁদের সংগ্রহে আছে এবং কয়েকজন দক্ষ শিল্পীও আছেন।

বারণার্ড তখন পরিবহন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। বলল, আচ্ছা একটা কথা, কাল আমরা যে পথ ধরে এসেছি এই পিয়ানোটাও কি সেই পথ দিয়ে আনা হয়েছে ?

ও ছাড়া তো আর দ্বিতীয় পথ নেই।

না, এ দেখছি সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেল। এবার একটা গ্রামোফোন আর একটা রেডিও আনান, তাহলেই সব অভাব মেটে। আধুনিক গানের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হয়নি হয়তো ?

খবর আমরা সবই রাখি, তবে রেডিওর একটু অসুবিধে রয়েছে। এ-রকম পাহাড়ে জায়গা—এখানে রেডিওতরংগ ধরা অসম্ভব। গ্রামোফোনের প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক আগেই এসেছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলেন, তাড়াহুড়ো করার কী দরকার।

সংগে সংগে বলে উঠল বারণার্ড, থাক, আপনি না বললেও আমি বুঝেছি। আপনাদের মূলমন্ত্র 'ধীরে বন্ধু ধীরে'—তাই না ?—উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল সে। তারপর আবার বলল, যাকগে। যা বলছিলাম, ধরুন আপনাদের কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন যে একটি গ্রামোফোনের দরকার,—তখন সেটি এখানে আনার ব্যবস্থা কী হবে ? কোম্পানির লোক নিশ্চয় তা এখানে এসে দিয়ে যাবে না,—তাহলে ? নিশ্চয়ই পিকিন বা সাংহাই বা আর কোথাও আপনাদের কোন এজেণ্ট আছে আপনাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যে, আর এ-সব ব্যাপারের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয় তো বটেই।

আগের মতই এবারও চ্যাং এড়িয়ে গেল। বলল, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, মিঃ বারনার্ড কিন্তু এ-প্রসঙ্গ আলোচনা করা সম্ভব নয়।

কী বলা উচিত আর কী উচিত নয় তার সীমারেখায় পৌছে চ্যাং থেমে গেল। অদৃশ্য সেই রেখাটিকে কল্পনায় আঁকতে কনওয়ের খুব বেশী সময় লাগবে না, কিন্তু ঠিক তখনই আরেকটি নতুন বিস্ময়ের আবির্ভাব হওয়ায় তখনকার মত সে-চিন্তা মুলতুবি রাখতে হলো। তিব্বতী ভৃত্যেরা সুগন্ধ চায়ে ভরা পাত্রগুলি নিয়ে এল, আরও তাদের সঙ্গে প্রবেশ করল চৈনিক পোশাক পরিহিতা একটি তরুণী। কারুর দিকে না তাকিয়ে সে একেবারে হারপ্‌সি-কর্ডের কাছে গিয়ে রামোঁর একটি গাভোতে বাজাতে শুরু করল। মোহময় সুরের প্রথম ঝঙ্কারেই কনওয়ের বিস্ময় আনন্দে পরিণত হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স যেন বর্তমান যুগে জেগে উঠল; তার বর্ণাঢ্য রূপ সুংপাত্রগুলির সঙ্গে অপূর্ব লাক্ষাশিল্পের সঙ্গে দূরের পদ্মদীঘির সঙ্গে মিশে একীভূত হয়ে গেল। তারপর সে তাকাল তরুণীটির দিকে। কৃশ নাসিকাটি দীর্ঘ, গণ্ডাস্থি উঁচু এবং মাঞ্চুদের মতো সে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। কালো চুলের রাশ টান করে বিনুনী বাঁধা,—তার ছোট্ট দেহটিতে নিখুঁত পারিপাট্য। তার ওষ্ঠ দুটি যেন গোলাপী ফুলের দুটি পাপড়ি। নিস্তব্ধ যেন একটি মূর্তির মত বসে সে হারপ্‌সিকর্ডটি বাজায়,—জীবনের সাড়া মেলে শুধু তার দীর্ঘ আঙুলগুলির গতিছন্দে। গাভোতে শেষ হতেই সে ছোট্ট একটি অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল।

তার গমনপথের দিক থেকে হাসিভরা মুখটি ফিরিয়ে চ্যাং কনওয়ের দিকে তাকিয়ে হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে প্রশ্ন করল কেমন লাগল আপনার?

কনওয়ে কোন উত্তর দেবার আগেই ম্যালিনসন প্রশ্ন করল, কে ও?

ওর নাম লো-সেন। পাশ্চাত্য সংগীতে ওর চমৎকার হাত। আমার মতন আজও ওর পূর্ণ দীক্ষালাভ ঘটেনি।

না হওয়াই তো উচিত।—মিস্ ব্রিনক্‌লো বলল, ওকে তো এখনও শিশু বললেও চলে! আপনাদের এখানে তাহলে মহিলা লামাও আছে?

এখানে স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই।

আপনাদের লামা পর্বটি সত্যিই অদ্ভুত।—একটু নীরব থাকার পর গম্ভীর চালে ম্যালিনসন বলল।

তারপর নীরবে চা-পান চলল।

তখনও যেন হারপ্‌সিকর্ডের ঝঙ্কার বাতাসে অনুরণিত হচ্ছে, অপসৃয়মাণ সুরের আবেশে সবারই মন ভারী।

কিছু পরে প্যাভিলিয়ন হতে ফেরার পথে চ্যাং বলল, আশা করি আমাদের মঠ দেখে আপনারা কিছুটা আনন্দ পেয়েছেন।

অন্য সকলের হয়ে কনওয়ে তাকে ভব্যতাসূচক ধন্যবাদ জানাল।

চ্যাং বলল তাদের মতো সেও আনন্দ পেয়েছে। তারপর আরও বলল, আপনারা যতদিন এখানে আছেন ততদিন ম্যুজিক হল আর লাইব্রেরী আপনাদের ইচ্ছে মত ব্যবহার করতে পারেন।

কনওয়ে তাকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, কিন্তু লামারা? তাঁদের কখনো দরকার হয় না?

তাঁদের কাছে সম্মানিত অতিথিদের প্রয়োজন অগ্রগণ্য।

যাক, একথাটা ভালই লাগল।—বারণার্ড বলল, আমাদের অস্তিত্বটুকু যে লামারা জানেন তা বোঝা গেল।—এটা কম কথা নয়। এখানটা আপনাদের চমৎকার সাজান গোছান, আর ওই ছোট্ট মেয়েটির পিয়ানোয় চমৎকার হাত। আচ্ছা ওর বয়স কত?

আমি বলতে পারব না।

মেয়েদের বয়স বলতে আপত্তি, তাই তো!—হাসতে হাসতে বারণার্ড বলল।

তাই।—জবাব দেবার সময় চ্যাঙের মুখে ক্ষীণ হাসিটুকু যেন ঢেকে গেল।

সেই রাত্রেই, খাওয়া-দাওয়ার পর, কনওয়ে, কোনরকমে সকলের নজর এড়িয়ে বাইরে চাঁদের আলোর শান্ত প্রাঙ্গণটিতে এসে হাজির হলো। শ্যাংরি-লাকে তখন আরও অপরূপ দেখায়, সৌন্দর্যের রহস্যে ঘেরা মনে হয়। নিথর বাতাসে শীতলতার আমেজ; কারাকালের বিরাট শিখরটিকে দিনের চাইতে যেন আরও অনেক কাছে মনে হয়। কনওয়ে সুখী, তার ভাববেগ শান্ত হয়েছে, মনে চাঞ্চল্য নেই; কিন্তু মস্তিস্ক মনের মত ভরে উঠে কই,—সেখানে চলে মৃদু আলোড়ন! একটি ঘন প্রহেলিকায় পড়েছে সে। কল্পনায় গোপনতার যে সীমারেখাটি সে আঁকতে শুরু করেছিল তা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে—কিন্তু তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আরও দুজ্ঞেয় এক পশ্চাৎপট। তার এবং তার হঠাৎ পাওয়া সঙ্গীদের জীবনে পর পর যে সব অদ্ভুত ঘটনাগুলি ঘটে গেল এখন তার প্রত্যেকটিই একটি বিশেষ কেন্দ্রাভিমুখী বলে তার মনে হয়; তাদের সে বুঝতে পারে না; কিন্তু যে-কোনরকমে হোক বুঝতে তাকে হবেই।

একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠ পার হয়ে ছাদে পৌছল সে। নীচে উপত্যকা। কত স্মৃতি নিয়ে ভেসে এল রজনীগন্ধার সুবাস। চীনদেশে রজনীগন্ধার সুবাসকে বলে চাঁদের আলোর সৌরভ। হঠাৎ তার মনে হলো, চাঁদের আলোর কোন ভাষা থাকলে তা হয়তো রামেঁার গাভোতির মতোই শোনাত। গাভোতির কথা মনে হতেই মাঞ্চুতরুণীটিকে মনে পড়ল। শ্যাংরি-লাতে কোন তরুণীকে সে আগে কল্পনাও করেনি আর সাধারণ সন্ন্যাসধর্মের সঙ্গে কোন তরুণীর উপস্থিতি লোকে ভাবে না। তাহলেও এটা অবাঞ্ছনীয় নূতনত্ব বলে মনে হলো না; বরং যে সমাজ চ্যাঙের কথায়, নাতিপ্রখর ধর্মিষ্ঠ সেই সমাজের পক্ষে একজন নারী সুরকার রীতিমত মূল্যবান সংগ্রহ।

ঘন কালো শূন্যতার দিকে তাকাল সে। সেখান থেকে উপত্যকা প্রায় এক মাইল নীচে, শূন্যতার প্রেতায়িত মূর্তি। ভাবে সে, উপত্যকা সভ্যতার কথা। তা নিয়ে চ্যাঙের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সেদিন। এরা কী আর তাকে নীচে নেমে সে-সভ্যতা পরিদর্শনের সুযোগ দেবে। অজ্ঞেয় পর্বতমালার মাঝে লুকায়িত

এবং একটি অস্পষ্ট ধর্মমত দ্বারা শাসিত এক অদ্ভুত সভ্যতা ; মঠের অঙ্গীভূত বিচিত্র রহস্যজাল হিসেবে তার আকর্ষণ কম নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে কনওয়ে তার প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হয়।

অকস্মাৎ একঝলক বাতাসের সঙ্গে অনেক নীচ থেকে আওয়াজ ভেসে এলো। একটু উৎকর্ণ হতেই সে শুনতে পেল, ঘণ্টাধ্বনি, ঢাকের বাজনা আর হয়তো মিলিত কণ্ঠের বিলাপধ্বনি। বাতাসের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে ধ্বনিগুলিও মিলিয়ে গেল, আবার পরক্ষণে ভেসে এলো—আবার মিলিয়ে গেল। কিন্তু অবগুণ্ঠন-ঢাকা উপত্যকায় জীবনের সাড়া উঠে শ্যাংরি-লার জমাট বাঁধা শান্ততা আরও বাড়িয়ে দিল। তার পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠগুলি এবং পাণ্ডুর পটমণ্ডপগুলি নিঝুম হয়ে পড়েছে, যেন কোথাও জীবনের স্পন্দনটুকু পর্যন্ত নেই, —সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ তার নজর পড়ল ছাদ হতে বেশ কিছু উঁচুতে একটা জানলায়,—লণ্ঠনের সোনালি আলো দেখা যায় সেখানে। ওইখানেই কি তবে লামারা অনুধ্যান ও জ্ঞানের অনুশীলন করেন ? এখন কি তাঁরা তাই করছেন ? পাশের দরজা দিয়ে কয়েকটি কক্ষ এবং অলিন্দ পার হতে পারলেই তার প্রশ্নের জবাব মিলবে ; কিন্তু সে জানে এটুকু স্বাধীনতা তার কাছে মরীচিকা। তার প্রতিটি কাজের ওপরে কড়া নজর রয়েছে। দু'জন তিব্বতী ধীর নিঃশব্দ পদে ছাদটুকু পার হয়ে আলিসার ধারে গিয়ে অলসভংগিতে দাঁড়াল। তাদের ভাল মানুষ বলেই মনে হয়, তাদের নগ্ন গায়ে রঙিন অঙ্গাবাস শিথিলভংগিতে জড়ান। আবার ঘণ্টাধ্বনি আর ঢাকের শব্দ ভেসে এলো,—কনওয়ে দেখল, সে শব্দ শুনে একজন তিব্বতী আরেকজনকে কী প্রশ্ন করল। উত্তর সে শুনতে পেল, টালুর সমাধি হলো। তিব্বতী ভাষায় কনওয়ের দখল খুবই সামান্য, তবু সে চায় তাদের কথাবার্তা চলুক। একটিমাত্র কথা হতে সে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারেনি। একটু পরে প্রশ্নকারী আবার প্রশ্ন শুরু করল, প্রশ্নগুলি অবশ্য কনওয়ে শুনতে পায় না কিন্তু উত্তর শুনে যা বুঝল তা হচ্ছে—

এখানে সে মারা যায়নি।

শ্যাংরি-লার প্রধানদের আদেশ পালন করেছে সে।

একটা পাখিতে চড়ে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে আকাশপথে ফিরে আসে।

জনকতক বিদেশীও তার সঙ্গে ছিল।

বাইরের বাতাসে বা ঠাণ্ডায় টালু ভয় পায়নি।

এখান থেকে বাইরে গিয়েছিল সে অনেকদিন আগে, কিন্তু নীল চাঁদের উপত্যকা তাকে ভোলেনি।

তারপর কনওয়ে আর কিছু ঠিক বুঝতে পারল না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে তার ঘরের দিকে ফিরে চলল। তিব্বতী দু'জনের আলাপের যেটুকু সে শুনল রহস্যের বদ্ধ দ্বারে আঘাত করার পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট। ঘটনাটা ঠিক এইভাবে সে ভেবে দেখেনি কেন? অবশ্য এই ধরণের কথা তার মনে আসেনি এমন নয়, কিন্তু তা অদ্ভুত অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল। এখন সে বুঝতে পারছে যে যুক্তিগুলি যত অদ্ভুতই হোক-না কেন তখন সেগুলি গ্রহণ করাই উচিত ছিল। বাসকুল থেকে তাদের ওইভাবে নিয়ে আসা কোন উন্মাদের অর্থহীন দুঃসাহসিকতা নয়; তা ছিল পূর্বকল্পিত এবং সুব্যবস্থিত, আর তার মূলে ছিল শ্যাংরি-লা। এখানকার সকলেই তাকে চেনে, বলতে গেলে এদেরই একজন ছিল সে,—তার মৃত্যুতে উপত্যকা আজ শোকসন্তপ্ত। তার প্রতিটি কাজের পিছনে দেখা যায় তীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে তা দুর্বার গতিতে কাজ করে চলেছে। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য? কী কারণে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বিমানের এই চারজন আরোহীকে এভাবে দূর হিমালয়ের নির্জনতার মাঝে নিয়ে আসা হলো?

সে প্রশ্ন মনে জাগতেই কনওয়ে কেমন একটু বিহ্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু তাই

বলে সে অখুশী হয় না। এ যেন তার শক্তিপরীক্ষা, যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান। তার বুদ্ধিদীপ্ত মন সাড়া দেয়, কর্মমুখী হয়ে ওঠে।

সংগে সংগে সে একটি বিষয় স্থির করে ফেলল ; এই ভীতিকর আবিষ্কারের কথা এখন সে কাউকে বলবে না,—তার সঙ্গীদেরও নয়, শ্যাংরি-লার কাকেও নয়। তার সঙ্গীরা তাকে কোনই সাহায্য করতে পারবে না আর শ্যাংরি-লা কেউ সাহায্য করবে না।

ছয়

শ্যাংরি-লাতে তাদের একটি সপ্তাহ কাটতে চল্‌ল।

সপ্তাহের শেষদিকে বারণার্ড একদিন বলল, আমার তো মনে হয় এর চাইতে খারাপ জায়গার সঙ্গে অনেককে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

এটি নিঃসন্দেহে খাঁটি কথা ; এবং শ্যাংরি-লাতে অনেক কিছু শেখা আর জানার এটি অন্যতম।

এই কটি দিনে তারা নিজেদের জীবনকে ধরাবাঁধা একটা প্রাত্যহিক ছকের মধ্যে এনে ফেলেছে, আর চ্যাঙের সাহচর্যে দিনগুলিও তত বেশি একঘেঁয়ে লাগে না। জলহাওয়া তাদের বেশ সহ্য হয়ে এসেছে, আর ভারী পরিশ্রম না করলে সে জলহাওয়া বেশ স্বাস্থ্যকর মনে হয়। আরও কত কথা জেনেছে তারা।—শ্যাংরি-লার দিনগুলি গরম, রাত্রি ঠাণ্ডা ; মঠটির অবস্থিতি এমনই যে দুর্দান্ত বাতাস তার কিছুই করতে পারে না, কারাকালের বুকে হিমবাহ নামে বেশিরভাগ দুপুরের দিকে ; উপত্যকায় খুব ভাল একজাতের তামাক জন্মায় ; খাদ্য ও পানীয়ের ভেতর কোন্‌টি খেতে সুস্বাদু কোন্‌টি নয় তাও তারা চিনেছে, আর এও জেনেছে খাদ্য ও পানীয় সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব রুচি ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বলতে গেলে, যেন চারটি নতুন ছাত্র রহস্যজনকভাবে অনেকদিন স্কুল হতে অনুপস্থিত থাকার পর আবার নতুন করে পরস্পরকে চিনল, জানল। শ্রান্তিহীন চ্যাঙের একমাত্র চেষ্টা যেন কোন অসুবিধে না হয়। উদ্যোগী হয়ে সে তাদের ভ্রমণে নিয়ে গেছে, কী করে তারা সময় কাটাবে তার আঁচ দিয়েছে, ভাল ভাল বইয়ের সুপারিশ করেছে, আবার খাওয়ার সময় কখনও বিশ্রী নীরবতা নেমে এলে নিজস্ব ধীর ও সতর্ক

বাকপটুতায় তা দূর করেছে। সব সময়ই তার ব্যবহার অতি অমায়িক, অতি ভদ্র এবং সব সময়ই সে সহৃদয়বুদ্ধি। তাদের প্রশ্নের উত্তর কোন সময় সে খুশি হয়ে উৎসাহের সঙ্গে দেয়, আবার কোনসময় সবিনয়ে এড়িয়ে যায়। কিন্তু এই দুয়ের মাঝের বিভেদ রেখাটি সে এমনই নিপুণভাবে টানে যে কোন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলেও এক ম্যালিনসন ছাড়া আর কেউই বিশেষ উত্তেজিত হয় না। কনওয়ে বরং তার নিয়ত বর্ধমান উপায়ে আরও একটি টুকরা সংগ্রহ করতে পেরে খুশি হয়। বারণার্ড আবার মাঝে-মাঝে চ্যাঙের সাথে মধ্য-য়ুরোপীয় ভবঘুরেদের কায়দায় রসিকতা জুড়ে দেয়।

বলে সে, দেখ চ্যাং এ হোটেলটা অতি রাবিশ। তুমিই বল, কোনকালে এখানে একটা খবরের কাগজ আসে? আমায় যদি কেউ আজকের 'হেরাল্ড ট্রিবিউন' এনে দিতে পারে তো আমি তাকে তোমাদের গোটা লাইব্রেরিটা দিয়ে দিতে রাজি।

প্রতি প্রশ্নের উত্তরই চ্যাং গুরুত্বপূর্ণস্বরে দেয়; তাই বলে সব প্রশ্নই যে সে গুরুত্বের সংগে নেয় তা নয়। সে বলে কয়েক বছর আগে অবধি 'টাইমসে'র ফাইল আমাদের রয়েছে; তাও আবার সব 'লণ্ডন টাইমস'।

কনওয়ে সেদিন শুনল, উপত্যকা তাদের পক্ষে 'নিষিদ্ধ এলাকা' নয়; সেখান হতে উপত্যকায় অবরোহণ রীতিমত কঠিন ব্যাপার, সংগী ছাড়া উপত্যকায় যাওয়া অসম্ভব;—তাহলেও কথাটা শুনে কনওয়ের বেশ আনন্দ হলো।

চ্যাঙের সংগে একদিন সকাল হতে প্রায় সন্ধ্যা অবধি তারা শ্যামল উপত্যকাটিতে কাটাল। ওপর হতে, পাহাড়ের কিনারা থেকে, তাকে কত নয়নমুগ্ধকর দেখায়। সকলেই ঘুরে ফিরে উপত্যকাটি দেখে, কনওয়ে দেখে গভীর মনোযোগের সংগে। যাবার সময় তারা বাঁশের তৈরি ডুলিতে গেল। বাহকেরা এমনই একটি খাড়া পথ বেছে নিল যে, তারা এক একটি তুঙ্গ অতিক্রম করে আর প্রবল দোলানিতে এদের দুর্দশা চরমে ওঠে। ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায় যারা তাদের কাছে সে পথ একেবারে অচল। যাই হোক,

শেষে যখন পর্বতপাদদেশে শ্যামলিমার রাজত্বে তারা পৌঁছল তখন তারা বুঝতে পারে সৌভাগ্যশালী স্যাংরি-লার অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী। নাতিশীতোষ্ণ উর্বর উপত্যকাটি চারিদিক ঘেরা যেন ছোট্ট একটি স্বর্গরাজ্য ;—কয়েক হাজার ফিটের খাড়াই ব্যবধানে তাপমানের কী পার্থক্য! চারিদিকে নানান ফসলের অপরিমিত প্রাচুর্য ; কোথাও এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদী পড়ে নেই। আবাদী জমি দৈর্ঘ্যে প্রায় বারো মাইল, প্রস্থে এক হতে পাঁচ মাইলের মধ্যে। তার বিস্তার এত সঙ্কীর্ণ পরিসর হলে কি হয়, দুপুরের পরিপূর্ণ সূর্যালোক পায়। রৌদ্র না থাকলেও আবহাওয়া মনোরম উষ্ণ। কিন্তু যে সব ছোট ছোট নদীগুলির দ্বারা জমিতে জলসেচন করা হয় তাদের তুষারগলা জল বরফ-শীতল। মাথা তুলে বিরাট পর্বতপ্রাচীরটির দিকে তাকিয়ে কনওয়ের মনে হলো, প্রকৃতি যদি উপত্যকাটিকে রক্ষা না করতো তাহলে হয়তো এই দৃশ্যের পরিবর্তে এক ভীষণ এবং ভয়াবহ দৃশ্য তাদের দেখতে হতো,—চারদিকের তুষারপর্বত হতে প্রতিনিয়ত জলধারা নেমে এসে উপত্যকাটিকে একটি বিরাট হ্রদে পরিণত করেছে। কিন্তু তার পরিবর্তে কতকগুলি কলমুখর নদী নেমে এসে জলাধারগুলি ভরিয়ে দিচ্ছে, সারা জমিতে জলসেচের কাজ করছে।—দেখে মনে হয়, যেন কোন বিজ্ঞানীর পরিকল্পনা মতো সুশৃঙ্খলে কাজ চলেছে।—যতদিন না ভূমিকম্প হয়ে বা পাহাড় ধ্বসে গিয়ে কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন সত্যিই সব মিলে স্থানটি একটি অপূর্ব চিত্র।

অজানিত ভবিষ্যতের ভয় বর্তমানের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তোলে। সৌন্দর্যের শিল্পাঙ্গনে কনওয়ের চোখের পলক পড়ে না,—তার চীনপ্রবাসের দিনগুলি এমনই মধুর হয়ে উঠেছিল। চারিদিকের বিরাট পর্বতমালার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ, পরিচ্ছন্ন বাগান, নদীর ধারে রঙীন কুটিরগুলি আর খেলাঘরের মতই পলকা গৃহগুলি কতো অদ্ভুত। কনওয়ের মনে হয় যে সেখানকার চীনা ও তিব্বতীয় সংকর সংস্করণ। তবে চীনা বা তিব্বতীদের চাইতে এরা অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দেখতে সুন্দর। এই রকম একটা

ছোট্ট সমাজে অন্তপ্রর্জনন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাতে কোন কুফল হয়েছে বলে মনে হয় না।

ডুলির পাশ দিয়ে যাবার সময় অপরিচিতদের দেখে তারা মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানায়, চ্যাঙের সঙ্গে প্রীতিভরা কথার আদান-প্রদানও কিছু হয়। তারা বেশ সৎপ্রকৃতির, ভদ্র, তাদের অহেতুক কৌতূহল নেই, কোন দুঃখ-চিন্তা নেই, —সদাই নানান কাজে রত, কিন্তু ব্যস্ত নয়। সব মিলিয়ে কনওয়ের মনে হয় এরা পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী সমাজের একটি। মিস্ ব্রিনক্লো গোড়া থেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করছিল—তাদের সমাজে পৌত্তলিকতার কুশ্রীতা মেলে কি-না, শেষ অবধি তাকেও স্বীকার করতে হলো, যে বাইরে থেকে কোন খুঁত ধরার উপায় নেই। যখন সে দেখল যে তারা পুরোপুরিই পোশাক-পরিচ্ছদ পরে এবং মেয়েরা গোড়ালি-চাপা চৈনিক পায়জামা পরে, তখন সে কিছুটা আশ্বস্ত হলো। একটি বুদ্ধ মন্দির অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে লিঙ্গ-পূজার কিছু নিদর্শন বার করল,—তাও তার বিচারে ভুল হয়নি বলা চলে না।

চ্যাং বুঝিয়ে বলে, এ মঠটির পৃথক লামা রয়েছেন। শ্যাংরি-লার তাঁবে তিনি, কিন্তু তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই, আর তাঁর ধর্মমতও আলাদা। আর একটু এগলে আপনারা তাওধর্মী ও কুনফুসীয় ধর্মী মঠও দেখতে পাবেন। পলকাটা পাথরের মতো ধর্মমত অনেক এবং প্রায় সব ধর্মেই কিছুটা সত্য আছেই।

আমিও তাই বলি।—আন্তরিকতার সংগে বারণার্ড বলে উঠল, সাম্প্রদায়িক হিংসাকে আমি কখনও সমর্থন করি না। চ্যাং, তুমি দার্শনিক। প্রায় সব ধর্মে কিছুটা সত্য আছেই—তোমার এ-কথা আমার মনে থাকবে। পাহাড়ের ডগে বসে তোমরা এত বড় একটা কথা ভাবতে পেরেছ,—তোমরা সত্য-সত্যিই জ্ঞানী। ঠিক বলেছ তুমি, চ্যাং, এতে কোন ভুল নেই।

স্বপ্নাচ্ছন্ন কণ্ঠে চ্যাং বলল, কিন্তু আমরা পরিমিতভাবে নির্ভুল।

মিস্ ব্রিনক্লো ওসব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে তখন ভাবছিল অন্য কথা। এখন গম্ভীর গলায় বলল, আমি ফিরে গিয়েই এখানে একজন মিশনারী পাঠাবার জন্যে সোসাইটিকে অনুরোধ করব। সোসাইটি যদি খরচের ভয়ে ইতস্তত করে,—আমি তাদের জোর করে রাজি করাব।

মিস্ ব্রিনক্লোর মনোভাব প্রশংসনীয়। মিশন ব্যাপারে ম্যালিনসনের তেমন মাথাব্যথা নেই, কিন্তু সে-ও মিস্ ব্রিনক্লোর প্রশংসা না করে পারল না। বলল, আপনার সোসাইটির উচিত আপনাকেই পাঠান।—অবশ্য যদি জায়গাটা আপনার পছন্দ হয়।

পছন্দ-অপছন্দর কথাই আসে না।—মিস্ ব্রিনক্লো বলল, এ জায়গা কি কারুর পছন্দ হতে পারে? কিন্তু কথা তা নয়, করণীয় কি সেই হচ্ছে প্রশ্ন।

কিন্তু আমি যদি মিশনারি হতাম তাহলে পৃথিবীর আর সব জায়গার ভেতর এইটিকেই বেছে নিতাম।—কনওয়ে বলল।

কিন্তু তাতে খুব একটা মস্ত কাজ করা হতো না।—ফস করে মিস্ ব্রিনক্লো বলল।

আমি তা ভাবিনি।

তাহলে আরও খারাপ। ইচ্ছে গেল বলেই কোন কাজ করার কোন মানেই হয় না। এই সব মানুষদের দিকে একবার দেখুন তো!

তাদের খুব সুখী মনে হয়।

হ্যাঁ তাই।—একটু ঝাঁঝের সংগে মিস্ ব্রিনক্লো বলল। তারপর চ্যাঙের দিকে ফিরে বলল, দেখুন আপনাদের ভাষা শিক্ষা থেকে আমি শুরু করতে চাই, এবিষয়ে আপনি কোন সাহায্য করতে পারেন মিঃ চ্যাং? কোন বই দিয়ে—

নিশ্চয় পারি। আপনাকে সব রকমে সাহায্য করতে পেলে আমি ধন্য হব।—চ্যাং গলায় মধু মিশিয়ে বলল, আর এ কথাও বলব যে আপনার উদ্দেশ্য সাধু।

সন্ধ্যার দিকে শ্যাংরি-লাতে ফিরেই চ্যাং মিস্ ব্রিনক্লোকে সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মিস্ ব্রিনক্লো কিন্তু ঊনবিংশশতকের একজন অতি পরিশ্রমী জার্মানের লেখা বিরাট গ্রন্থটি দেখে একটু যেন ভয় পেল। সে ভেবেছিল সামান্য একটা চটি বই পড়লেই চলবে। যাই হোক, চ্যাঙের সাহায্যে এবং কনওয়ের উৎসাহে সে ভাল ভাবেই পাঠ শুরু করল এবং কিছু-দিনের মধ্যে তাকে পাঠাভ্যাস থেকে গুরুতর রকমের আনন্দ পেতে দেখা গেল।

সামনের সমস্যা ছাড়া কনওয়ের দিন বেশ আনন্দেই কাটে। রৌদ্রভরা উষ্ণ দিনগুলির অধিকাংশ সময়ই সে কাটায় লাইব্রেরিতে বা ম্যুজিক হলে। শিগ্‌গিরই সে বুঝতে পারল যে লামাদের সম্পর্কে তার ধারণা অভ্রান্ত,—তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি খুবই উঁচু স্তরের। তবে পুস্তক নির্বাচন ব্যাপারে তাঁরা একটু গোঁড়া; গ্রীকভাষায় প্লেটোর বইয়ের সঙ্গে রয়েছে ইংরেজি ওমর-খৈয়ম; আবার, নিট্সের পাশে নিউটন; টমাস মোর, হ্যানা মোর, টমাস মুর, জর্জ মুর, এমন কি ওল্ড মুর পর্যন্ত রয়েছেন। সব-শুদ্ধ, কনওয়ে মোটামুটি একটা হিসেব করে দেখে প্রায় বিশ-তিরিশ হাজার বই রয়েছে। কী ভাবে সেগুলি নির্বাচিত ও সংগৃহীত হলো তা জানার ইচ্ছা স্বাভাবিক, কনওয়ের সে-ইচ্ছা হয়। তাছাড়া সে খুঁজে দেখল কোন্ বই সবশেষে এসেছে। আবিষ্কার করল একমাত্র 'ইম ওয়েষ্টার্ণ মিষ্টস্ নিউজ'-এর একটা সস্তা-সংস্করণের পর আর কোন বই আসেনি।

চ্যাং প্রায়ই তার সংগে দেখা করে। একদিন বলল, আরও অনেক বই এসে পৌঁচেছে;—১৯৩০ সালের মাঝামাঝি অবধি প্রকাশিত অনেক বই। সেগুলিও কিছুদিনের ভেতরই লাইব্রেরিতে আসছে।—শেষে বলল, তাহলেই দেখছেন আমরা খুব বেশি পিছিয়ে নেই।

কিন্তু এমন লোকও রয়েছে যে আপনার কথা মানবে না চ্যাং।—একটু হেসে কনওয়ে বলল, গত একটি বছরে পৃথিবীতে বহু ঘটনা ঘটে গেছে।

কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি যা ঘটবে বলে ১৯২০ সালে বোঝা যায়নি বা বা ১৯৪০ সালে আরও ভালভাবে বোঝা যাবে না।

পৃথিবী আজ একটি সঙ্কটের ভেতর দিয়ে চলেছে, তার গতি-প্রকৃতি আপনারা জানতে চান না তাহলে ?

সময় হলেই জানব বই কি।

দেখুন চ্যাং, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আপনাদের কিছু কিছু বুঝতে পারছি। পৃথিবীর সকল মানুষ হতে আপনারা যেন একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তাদের তুলনায় সময়ের দাম আপনাদের কাছে অনেক কম। আমি লণ্ডনে থাকলে খবরের কাগজের শেষসংস্করণটি পাবার জন্যে খুব ব্যগ্র হতাম না, আপনারাও ঠিক তেমনই এক বছর আগেকার পুরণো কাগজ পাবার জন্যে বেশি ব্যগ্র নন। আমার কাছে উভয় মনোভাবই সঙ্গত। আচ্ছা একটা কথা চ্যাং, আপনাদের এখানে শেষ অতিথি এসেছেন কতদিন আগে ?

মিঃ কনওয়ে, ক্ষমা করবেন, আপনার ও-প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না।

এইভাবে আলাপ-আলোচনায় ছেদ নেমে আসাটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, কনওয়ে তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। তার পূর্বজীবনে তাকে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে—আলাপ-আলোচনায় ছেদ টানার চেষ্টা করেও সফল হতো না, যেন তার শেষ নেই। চ্যাঙের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত যতই বাড়তে থাকে তাকে তার ততই ভাল লাগে। কিন্তু একটি বিষয় সে বুঝে উঠতে পারে না, মঠের আর কারুর সংগে তার দেখা হয় নি। লামারা না হয় অন্তরালে থাকতে ভালবাসেন, কিন্তু চ্যাং ছাড়া কি আর কোন উপলামাও নেই ?

আরেকজন আছে বটে, সেই ছোট্ট মাঞ্চু তরুণীটি। মু্যজিক-রুমে বার কয়েক সে তাকে দেখেছে। কিন্তু সে তো ইংরেজি জানে না, আর সে-ও যে চীনাভাষা জানে তা এখনও প্রকাশ করতে রাজি নয়। সে ঠিক বুঝতে

পারে না তরুণীটি শুধু আনন্দলাভের জন্যই বাজনা বাজায়, না এখনও তার শিক্ষাকাল শেষ হয়নি। তার বাজনা, শুধু বাজনা কেন প্রতিটি ব্যবহারও কায়দাদোরস্ত। সে প্রসিদ্ধ সুরগুলিই বাজায়—বাক্, কোরেলি, স্কারলাত্তি আর কখনও কখনও মোজার্ট। পিয়ানোর চাইতে হারপ্সিকর্ডই সে বেশি পছন্দ করে, কিন্তু কনওয়ে যখন পিয়ানো বাজায় তখন সে পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে শোনে—যেন শোনা তার কর্তব্য। তার মনের কথা জানা অসম্ভব,—আরও অসম্ভব তার বয়স অনুমান করা। কনওয়ে ভাবে সে তিরিশের বেশি বা তেরোর কম নয় নিশ্চয়; অথচ আশ্চর্য এই যে উদ্ভট অনুমান দুটি নিতান্ত অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না।

আর কিছু করার না থাকলে ম্যালিনসন মাঝে মাঝে বাজনা শুনতে আসে। তরুণীটিকে সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। কনওয়েকে কতবার বলেছে সে, দেখ কনওয়ে ও যে এখানে কী করতে আছে তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। চ্যাঙের মতন বুড়োর না-হয় বুঝলাম লামাত্বের মোহ থাকতে পারে, কিন্তু ওর কী আকর্ষণ? কতদিন যে ও এখানে আছে তাই-বা কে জানে?

আমিও তাই ভাবি ম্যালিনসন, কিন্তু অনেক কিছুর ভেতর এও একটা যা আমাদের জানতে দেওয়া হবে না।

তুমি কি মনে কর, ও এখানে থাকতে চায়?

কিন্তু চায় না তারও তো চিহ্ন কিছু দেখিনি।

অনুভূতি বলে ওর কিছুই নেই। ও যেন মানুষই নয়, যেন গজদন্তের পুতুল।

কিন্তু মন টানে।

কতকটা।

কতকটা নয় ম্যালিনসন, অনেকটা। যাই বল, তোমার গজদন্ত-পুতুলটি ভব্যতা জানে, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে তার রুচিবোধ মার্জিত, তার চাহনি

মিষ্টি, হারপ্সিকর্ডে অদ্ভুত হাত, সে ঘর দিয়ে চলে যায় কিন্তু শব্দ হয় না। আমার মনে হয় পশ্চিম য়ুরোপে এরকম গুণবতী মেয়ে খুব কমই আছে।

তুমি নারীবিদ্বেষী কনওয়ে।

এ অভিযোগ নতুন নয়। বলতে গেলে নারীসমাজের সংগে তার কোন দিনই বিশেষ সংস্রব ছিল না। তবুও, অনেকগুলি নারীর সংগে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল ; সে যদি তাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করত তাহলে তারা নিশ্চয়ই তার জীবনসংগিনী হতে রাজি হতো, কিন্তু সে-প্রস্তাব সে করেনি। একবার 'মর্ণিং পোস্টে' তার বিবাহের কথা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু শেষ অবধি তার ভাবী বধূ পিকিনে বাস করতে রাজি হয়নি এবং সে-ও টানব্রিজ ওয়েল্স-এ যেতে চায়নি,—তাদের পারস্পরিক অনিচ্ছা শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল। নারীদের সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা অস্পষ্ট এবং এক রকম অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাই বলে তাকে নারীবিদ্বেষী বলা চলে না।

হাসতে হাসতে কনওয়ে বলল, আমার বয়স সাঁইতিরিশ—তোমার চব্বিশ। এইজন্যেই যা কিছু তফাত।

একটুখানি নীরব থেকে হঠাৎ ম্যালিনসন প্রশ্ন করল, আচ্ছা চ্যাঙের বয়স কত হবে ?

হালকাসুরে কনওয়ে জবাব দিল, উনপঞ্চাশ ও একশো উনপঞ্চাশের ভেতর।

তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু গোপন করলেও আবার অনেক কিছু চ্যাং নিজে থেকে জুগিয়ে দেয়। যেমন, উপত্যকার অধিবাসীদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি সম্পর্কে সে কোনরকম গোপনতা করল না, এবং কনওয়ে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এত কিছু জানতে পারল যা দিয়ে একটা প্রথমশ্রেণীর থিসিস লেখা চলে। রাজনীতির ছাত্র হওয়ায় উপত্যকার শাসনব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক ; এবং সে অনুসন্ধান করে দেখল শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় মঠ থেকে,—শিথিল স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা,

যাতে রয়েছে কল্যাণের শুভ ইঙ্গিত। এই শাসনব্যবস্থা যে সফল হয়েছে তার প্রমাণ উপত্যকায় নামতে প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করা যায়। আইন ও শৃঙ্খলার ভিত্তি অনুসন্ধান করতে গিয়ে কনওয়ে সমস্যায় পড়ল; কোনরকম সৈন্য বা পুলিশ ব্যবস্থা নেই, কিন্তু তাহলেও স্বভাব দুর্বৃত্তদের জন্যে একটা কিছু ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়। চ্যাংকে সেকথা বলতে সে বলল যে, তাদের দেশে অপরাধের সংখ্যা অত্যন্ত কম; তার দুটি কারণ, প্রথমটি হচ্ছে খুব গুরুতর অপরাধ ছাড়া আর কিছুকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ প্রয়োজন মাফিক সব কিছু পর্যাপ্ত পেয়েছে। তাদের সমাজের চরম এবং ভয়াবহ দণ্ড হলো উপত্যকা হতে বহিষ্কৃত করে দেওয়া; তবে এই চরম দণ্ডের ব্যবস্থা কালেভদ্রে হয়ে থাকে। চ্যাং আরও বলল যে, তাদের গভর্ণমেন্টের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মনে ভব্যতা-বোধ অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া,—তাতে তাদের বিচার করার শক্তি হবে কোন্ কাজ করা উচিত নয়, অর্থাৎ কী করলে তারা পতিত হবে।

কনওয়ে প্রশ্ন করল, নারীঘটিত কোন বিবাদ-বিসংবাদ কি কখনও হয়নি?

খুব কম। কেননা, অন্যে যে নারীকে চায় তাকে পাবার চেষ্টা ভব্যতার বাইরে।

কিন্তু এও তো হতে পারে যে কেউ কোন মেয়ের সম্বন্ধে এমনই পাগল যে ভব্যতার তোয়াক্কাই রাখে না।

তখন অপর ব্যক্তির পক্ষে ভব্যতা হবে অপরকে তার অধিকার ছেড়ে দেওয়া, এবং মেয়েটিরও পক্ষে ভব্যতা হবে তাতে সম্মত হওয়া। আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন একটু ভব্যতাবোধকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করে আমরা কত সমস্যার সমাধান করি।

উপত্যকায় বার কতক যাবার পর চ্যাঙের কথা কনওয়ের সত্য বলে মনে হলো। প্রতিটি মানুষই সুখী; সন্তুষ্ট—গভীর শান্তিতে বাস করছে

তারা। তা দেখে কনওয়ের খুব আনন্দ হলো, কেননা সে জানে শাসনবিধি সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়া অকল্প্য।

তাদের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করতে চ্যাং বলল, আমাদের কি ধারণা জানেন? আমরা বিশ্বাস করি শাসন-ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে অতি-শাসন বর্জনীয়।

আপনাদের সমাজে কোনরকম গনতান্ত্রিক কায়দাকরণ নেই?—যেমন ধরুন ভোট বা ওই রকম কিছু।

না, নেই। একেবারে সঠিক বা একেবারে বেঠিক এই ধরণের মত দিতে হলে এখানকার লোকেরা হতভম্ব হয়ে পড়বে।

কনওয়ে একটু হাসল। এই মতবাদে তার মন যেন সায় দেয়।

মিস্ ব্রিনক্‌লো তিব্বতী ভাষা শিক্ষায় ব্যস্ত; ম্যালিনসনের অভিযোগ-অনুযোগের অন্ত নেই; বারণার্ড আশ্চর্যরকম শান্ত। তার শান্ততা স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যাই হোক না কেন, অদ্ভুত।

ম্যালিনসন বলল, সত্যি কথা বলতে কি কনওয়ে, ওকে আমি কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারছি না। চুপচাপ থাকে না-হয় বুঝি, কিন্তু ঠাট্টা-ইয়ার্কি করলেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে। ওর ওপর নজর না রাখলে আমরা ঝঞ্ঝাট পড়তে পারি।

কনওয়ে নিজেও বারণার্ডের এই সহজভাব একাধিকবার লক্ষ্য করেছে। উত্তর দিল সে, ও যে এভাবে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে সেটা তো আমাদের পক্ষে ভাল।

আমার কিন্তু ভাল ঠেকে না। আচ্ছা, তুমি ওর বিষয়ে কী জান বলতো? মানে ও কে, কী ওর পরিচয় এসব কিছু জান তুমি।

তোমার চাইতে বেশি কিছু জানি না! শুনেছি ও নাকি পারস্য থেকে এসেছিল আর পেট্রল সংক্রান্ত কী সব কাজকর্ম করত। সব কিছু সহজভাবে

গ্রহণ করা ওর স্বভাব, তাই ইভাক্যুয়েশনের সময় ওকে সংগে নিতে আমায় বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যখন বললাম, বিপ্লবীদের গুলি আমেরিকান পাসপোর্টকেও রেহাই দেবে না তখন আসতে রাজি হয়।

তুমি ওর পাসপোর্ট দেখেছ ?

হয়তো দেখেছি, ঠিক মনে নেই। কেন ?

ম্যালিনসন হাসল। বলল, তোমার হয়তো মনে হবে আমি পরচর্চা করছি। কিন্তু না করেই বা পারি কৈ ? আমাদের কারুর কোন গোপন কিছু থাকলে এ রকম জায়গায় দু'মাসে তা প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। মনে রেখ, আমি যা জেনেছি তা নিতান্ত আকস্মিক ছাড়া কিছুই নয়, আর এখনও অবধি কাউকে একটি কথাও বলিনি। তোমাকেও হয়তো বলতাম না, কিন্তু এখন আর না বলে উপায় নেই।

তা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু তুমি কী বলতে চাইছ ?

বলতে চাই, বারণার্ডের পাসপোর্ট জাল আর প্রকৃত বারণার্ডও সে নয়।

কনওয়ে বিস্ময়ের সংগে ভুরুদুটি তুলে তার দিকে তাকাল, কিন্তু তাকে বিচলিত মনে হলো না। বারণার্ডকে এমনি তার ভালই লাগে। কিন্তু সে কে বা কে-নয় তা নিয়ে মাথা ঘামান অসম্ভব। বলল, তাহলে সে কে তোমার মনে হয় ?

চামার্‌স্ ব্রিয়াণ্ট।

চামার্‌স্ ব্রিয়াণ্ট ! সেই শয়তানটা ? তুমি কী করে জানলে ?

আজ সকালে তার পকেটবুকটি কুড়িয়ে পেয়ে চ্যাং আমায় এনে দেয়, সে ভেবেছিল সেটা আমারই। সেটা হাতে পেয়ে না খুলে পারলাম না, দেখলাম, খবরের কাগজের কাটিংয়ে সেটি ঠাসা ; খুলতেই কতকগুলো পড়ে গেল, এবং সেগুলো না পড়ে পারলাম না। খবরের কাগজের কাটিং তো কারুর গোপন জিনিস নয়, অন্তত হওয়া উচিত নয়। পড়ে দেখলাম, তাদের প্রত্যেকটি

ব্রিয়াণ্টকে নিয়ে, বা তার অনুসন্ধানের খবর নিয়ে। একটিতে তার ছবিও দেখলাম, এক গোঁফ ছাড়া বারণার্ডের সংগে তার হুবহু মিল রয়েছে।

বারণার্ডকে একথা বলেছ?

না, আমি কোন কথা না বলে তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

সে যে ব্রিয়াণ্ট সে-ধারণা তোমার তাহলে খবরের কাগজের ওই ছবিটা দেখেই হয়েছে?

তা—হ্যাঁ।

শুধু এইরকম একটা প্রমাণের ওপর নির্ভর করে আমি কিন্তু কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারতাম না, ম্যালিনসন। অবশ্য তুমিও হয়তো ঠিক, আমি একথা বলছি না যে সে ব্রিয়াণ্ট হতে পারে না। তাই যদি সে হয় তাহলে অবশ্য তার এই আশ্চর্যরকমের শান্ততার একটি কারণ অন্তত পাওয়া যায়—লুকিয়ে থাকার জন্যে এর চাইতে ভাল জায়গা সে পেত কিনা সন্দেহ।

এইরকম ভীষণ উত্তেজক একটি খবরকে কনওয়ে এমন সহজভাবে গ্রহণ করায় ম্যালিনসন একটু হতাশ হলো, বলল তাহলে এ ব্যাপারের কী করছ তুমি?

মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে কনওয়ে বলল, কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। হয়তো কিছুই করব না। তাছাড়া কী-ই বা করা যায়?

ওসব কথা ছাড়, ও যদি সত্যিই ব্রিয়াণ্ট হয়—

ম্যালিনসন, ও যদি নীরোও হতো তাহলে উপস্থিতের মতো আমাদের কিছুই যেত-আসত না। সাধুই হোক আর তস্করই হোক, যতক্ষণ আমরা এখানে রয়েছি ততক্ষণ আমাদের পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে, কারুর প্রতি কোন রকম দোষারোপ করে অবস্থার উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। অবশ্য যদি ওকে বাসকুলে কোনরকম সন্দেহ করতাম, তাহলে দিল্লীতে খবর পাঠাতাম নিশ্চয়ই—সেটা ছিল আমার কর্তব্যের মধ্যে। কিন্তু এখানে আমার ছুটি, আমি তো তাই ভাবি।

এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারকে লঘুভাবে দেখা হচ্ছে না কি?

হলেই বা ক্ষতি কি যদি তা নিবুর্দ্ধিতা না হয়?

তার মানে, তুমি বলতে চাও, তার সম্বন্ধে আমি যা জেনেছি তা ভুলে যেতে হবে।

তা হয়তো তুমি পারবে না, তবে একথা আর কারুর কানে না ওঠাই ভাল। তার পরিচয়ের সত্যাসত্য ভেবে আমি একথা বলছি না, আমি বলছি এখান থেকে যাবার পর আমরা এই নিয়ে যেন কোন অপ্রীতিকর অবস্থায় জড়িয়ে না পড়ি।

তাহলে হাতে পেয়েও ওকে আমরা ছেড়ে দেব?

আমি এই কথাই একটু ঘুরিয়ে বলতে চাই, তাকে ধরার উল্লাসটা অন্ত কেউ পাক না, আমরা কেন? কয়েক মাস একজনের সংগে বন্ধু হিসেবে কাটাবার পর তার হাতে কি হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া যায় ম্যালিনসন!

তোমার কথা আমি মানতে পারছি না। লোকটা প্রকাণ্ড একটা চোর ছাড়া কিছুই নয়, আমি জানি ও বহু লোককে সর্বস্বান্ত করেছে।

কনওয়ে তার কথায় কাঁধে একটা ঝাঁকনি দিল শুধু। ম্যালিনসনের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই; তা রূঢ় হলেও সত্য। আইনভঙ্গকারীকে বিচারের জন্য আইনের হাতে তুলে দেওয়াই সাধারণের কর্তব্য—অবশ্য এটাও দেখতে হবে সেই আইন ভঙ্গ করা অন্যায় কিনা। এবং চেক, শেয়ার, ব্যালান্সসীট এইসব সংক্রান্ত আইন ওই দলেই পড়ে। ব্রিয়ান্ট সেই আইন ভঙ্গ করেছে—কনওয়ে সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানলেও এটুকু জানে, ব্রিয়ান্ট খুব গুরুতর অপরাধ করেছিল। নুইয়র্কে ব্রিয়ান্টদল ব্যবসা গুটলে লাখ-লাখ ডলার ক্ষতি হয়েছিল—এরকম ক্ষতি নাকি পৃথিবীতে আগে কখনও হয়নি। যে কোনরকমে হোক (কীভাবে কনওয়ে জানে না, সে তো আর অর্থনীতিবিদ্ নয়) ব্রিয়ান্ট ওআল ষ্ট্রিটকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিল, তার ফলে তার নামে বেরুল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। তারই ফলে সে য়ুরোপে পালায়,

এবং পলাতক আসামীকে আইনের হাতে তুলে দেবার জন্যে প্রায় ছটি দেশ অনুরোধ পেয়েছিল।

শেষে কনওয়ে বলল, আমার কথা শোন যদি, এখন কিছু প্রকাশ না করাই উচিত—ওর জন্যে বলছি না, বলছি নিজেদের জন্য। সে তো অন্য লোকও হতে পারে—যতক্ষণ না তুমি নিঃসন্দেহ হচ্ছ আশা করি ততক্ষণ তুমি মুখ খুলবে না।

কিন্তু সে যে ব্রিয়াণ্টই সেকথা সেইদিনই সন্ধ্যায় ডিনারের পর প্রকাশ পেল। ডিনার শেষ হতে চ্যাং বিদায় নিল ; মিস্ ব্রিনক্লো তিব্বতী ব্যাকরণ নিয়ে বসল ; বাকী তিনজনে কফি আর সিগার নিয়ে নীরবে বসে থাকে। খাওয়ার সময় আলাপ-আলোচনা বার বার ঝিমিয়ে পড়ছিল, কিন্তু চ্যাং প্রতি-বারই সামলে নিয়েছে। এখন সে না-থাকায় নিস্তব্ধতা নেমে এল। এই প্রথম দেখা গেল, বারণার্ড যেন হাসি-ঠাট্টা ভুলে গেছে। কনওয়ে বেশ বুঝতে পারে, ম্যালিনসনের সাধ্য নেই যা ঘটেছে তা ভুলে গিয়ে বারণার্ডের সংগে স্বাভাবিক ব্যবহার করে ; আর একটা যে কিছু ঘটেছে চতুর বারণার্ডও নিশ্চয়ই বুঝতে পারে।

হঠাৎ সিগার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বারণার্ড বলল, আমি কে তা বোধ হয় তোমরা সকলেই জানতে পেরেছ।

ম্যালিনসন মেয়েদের মত লাল হয়ে উঠল। কিন্তু কনওয়ে শান্তস্বরে বলল, ম্যালিনসন আর আমি জানি বলেই মনে হয়।

আমার অসতর্কতার জন্যেই জানতে পেরেছ। আমি যদি কাগজের টুকরাগুলো ওভাবে না রাখতাম।

সময়ে সময়ে সকলেই অসতর্ক হয়ে পড়ে।

তুমি তো দেখছি খবরটা জেনেও উত্তেজিত হওনি।—যাক এটা তবু আশার কথা।

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

মিস ব্রিনক্লো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল, মিঃ বারণার্ড আপনি যে তা আমি জানি না; কিন্তু গোড়া থেকেই আমার মনে হয়েছে যে আপনার এটা ছদ্মবেশ।—সকলেই তার দিকে জিজ্ঞাসুনয়নে তাকাল। সে বলল, কেন মনে হয়েছিল জানেন? মিঃ কনওয়ে যখন বলেছিলেন যে, আমাদের সকলের নাম খবরের কাগজে বেরুবে তখন আপনি বলেছিলেন যে তাতে আপনার কিছু যায়-আসে না। তখনই আমার মনে হয়েছিল, হয়তো বারণার্ড নামটি আপনার আসল নাম নয়।

বারণার্ড আরেকটি সিগার ধরিয়ে মৃদু একটু হাসল। তারপর বলল, আপনি যে শুধু একজন দক্ষ গোয়েন্দা তাই নয়, আমার বর্তমান অবস্থার বেশ ভদ্র নামকরণ করেছেন,—ছদ্মবেশে চলেছি আমি। ঠিকই বলেছেন। আর তোমরা—তোমরা যে আমার পরিচয় জানতে পেরেছ তাতে আমি দুঃখিত নই। তোমরা আমাকে চিনতে না পারলে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থায় এসে ঠেকেছি তাতে তোমাদের সঙ্গে চালবাজি করা শোভা পায় না। তোমরা আমার সংগে অতি চমৎকার ব্যবহার করেছ, আমিও তোমাদের কোনরকম অসুবিধায় ফেলতে চাই না। ভালোই হোক আর মন্দই হোক আরও কিছুকাল আমাদের একসঙ্গে কাটাতে হবে; এবং বর্তমানে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পরস্পরকে সাহায্য করা। ভবিষ্যতে কি হবে না-হবে তা নিয়ে এখন মাথা না ঘামানই ভাল।

তার কথাগুলি কনওয়ের এত যুক্তিপূর্ণ মনে হয় যে সে বারণার্ডের দিকে সাগ্রহে তাকাল;—এবং, অদ্ভুত ঠেকলেও তার দৃষ্টিতে প্রশংসা ফুটে উঠল। ওই মাংসল, হাসিখুশি, বয়স্ক লোকটিকে পৃথিবীর একজন নামজাদা জোচ্চর হিসেবে ভাবতেও কী রকম লাগছিল; আর একটু লেখাপড়া জানলে সে হয়তো প্রাথমিক ইস্কুলের ভাল হেডমাস্টার হতে পারত। তার হাসিঠাট্টার আড়ালে আবছা ফুটে ওঠে বর্তমানের দুশ্চিন্তার ছায়া,—তাই বলে তার রসিক

মনটি জোর করে তৈরি তা বলা চলে না। তাকে দেখে লোকে বলবে 'ভালো লোক,'—প্রকৃতিতে সে মেষ, কিন্তু পেশায় হাঙর—।

কনওয়ে বলল, আমারও তাই মনে হয়।

বারণার্ড তখন একটু হাসল। যেন তার ঝুলিতে আরও রসিকতা রয়েছে, এইবার সেইগুলি একে একে বের করবে। চেয়ারে সমস্ত শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বলল সে, কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার,—মানে আমার কথা বলছি। সোজা গেলাম য়ুরোপে তারপর তুর্কি পারস্য—সবসময়ই পিছনে পুলিশের তাড়া, ভিয়েনায় তো প্রায় ধরেই ফেলেছিল! গোড়ার দিকে এর ভেতর বেশ একটা উত্তেজনা আছে, কিন্তু কিছুদিন পরে কষ্টকর হয়ে ওঠে। বাসকুলে বেশ কিছুটা বিশ্রাম পেয়েছিলাম,—বিপ্লবের মাঝে নিরাপদে কিছুদিন কাটান যাবে ভেবেছিলাম।

তা কাটাতে পারতে—কিন্তু বুলেটের ভয় ছিল, এই যা।—একটু হেসে কনওয়ে বলল।

হ্যাঁ, শেষকালে তাই আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল। ওই অবস্থায় বাসকুলে থাকব কি তোমাদের সংগে সরকারী বিমানে যাব তাই স্থির করতে আমায় তখন রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। কেন না, তোমাদের সংগে যাওয়া মানে পৌছে লোহার বালা হাতে পরা। বাসকুলে থাকারও ইচ্ছা ছিল না, আবার তোমাদের সংগে যাবারও উৎসাহ ছিল না।

মনে পড়ছে বটে।

আবার হেসে বারণার্ড বলল, ওই তো হলো ঘটনা, তাহলে বুঝতেই পারছ যে এখানে আসার জন্যে আমি এতটুকু দুঃখিত নই। এটা খুবই রহস্যপূর্ণ ব্যাপার, কিন্তু নিজের দিক থেকে বলতে গেলে, এর চাইতে ভালো জায়গা আমি আর পেতাম না। সুবিধেই যখন হয়ে গেল, খুঁতখুঁতনি করে লাভ কি?

আন্তরিকতার হাসি ফুটে উঠল কনওয়ের মুখে। বলল, খুব ভালো কথা,

কিন্তু তোমার খুসী থাকাটা যেন একটু মাত্রা অতিক্রম করেছিল। আমরা তো ভাবতাম কী করে তুমি এমন নির্ভাবনায় রয়েছে।

হ্যাঁ, নির্ভাবনায়ই আছি। অভ্যাস হলে দেখবে জায়গাটা মোটেই খারাপ নয়। প্রথম প্রথম বাতাসটা একটু কষ্টকর ঠেকবে, কিন্তু সব সুবিধে কি একসংগে পাওয়া যায়। তারপর দেখ বায়ুপরিবর্তনের পক্ষে জায়গাটা চমৎকার ; ঠিক যে রকম জায়গায় ডাক্তার আমায় যেতে বলেছেন এ জায়গাটি ঠিক সেইরকম। আমার ভালই লাগছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা, কাজকর্মের চিন্তা নেই, আর টেলিফোন নেই যে দালাল কেবলই জ্বালাতন করবে।

পারলে সে ছাড়ত না বোধ হয়।

নিশ্চয় ছাড়ত না। অনেক কিছু গোলমাল মেটাবার রয়েছে যে।

এমনই সরলভাবে সে বলল যে কনওয়ে না বলে পারল না, তোমাদের উঁচু স্তরের অর্থনীতি আমি বিশেষ বুঝি না।

সংগে সংগে বারণার্ড বলল, ও সব লোক-ঠকান ব্যাপার।

আমারও অনেক সময় সেই সন্দেহ হয়।

আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধর কোন লোক বহু বছর কোন কাজ করে আসছে যা আরও বহু লোকে করে থাকে ; হঠাৎ এক সময়ে বাজার হলো প্রতিকূল। বাজার অনুকূল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া তখন আর কিছু করার থাকে না। কিন্তু ধর, বাজার ফেরা স্বাভাবিক হলেও কোন কারণে আর ফিরল না ; তখন কোটিখানেক ডলার লোকসান দিয়ে সে একদিন কাগজে পড়ল যে কোন সুইডিস প্রফেসর বলেছেন, এইবার পৃথিবীর শেষ। আচ্ছা, তুমিই বল এতে বাজারের কোন অবস্থান্তর হতে পারে ? সে খানিকটা ধাক্কা খেল ঠিকই, কিন্তু করার কিছুই থাকে না। তারপরও যদি সে অপেক্ষা করে তো অপেক্ষা করতে হবে পুলিশের জন্যে। আমি কিন্তু অপেক্ষা করিনি।

তুমি তাহলে বলতে চাও যে, নিতান্ত দুর্ভাগ্য ছাড়া সেটা কিছুই নয় ?

তাতে আমারও তো মোটা টাকা ছিল।

আরও অনেকের টাকাও ছিল।—তীক্ষ্ণতার সংগে ম্যালিনসন বলল।

তা ছিল। কিন্তু কেন ছিল ? তার কারণ, তারা কিছু না করে কিছু কামাবার চেষ্টায় ছিল, নিজের চেষ্টায় উপায় করার মতন মস্তিষ্ক তাদের ছিল না।

বাজে কথা। তারা তোমায় বিশ্বাস করত তাই টাকা দিয়েছিল, তারা জানত তাদের টাকা নিরাপদ।

কিন্তু নিরাপদ ছিল না। থাকতে পারে না। নিরাপত্তা কোথাও নেই। গুচ্ছের খানেক লোকের একটি মাত্র ছাতায় মাথা দিয়ে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করাও যা, টাকা নিরাপদ ভাবা তেমনই নির্বুদ্ধিতা।

কনওয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে। বলল, আমরা স্বীকার করছি, ঘূর্ণিবাত্যা তুমি ঠেকাতে পারনি।

ঠেকাবার নামে হৈচৈও করিনি,—যেমন বাসকুল ছাড়ার পর যা ঘটল তা নিয়ে তুমি অকারণ হৈচৈ করনি। এরোপ্লেনে ম্যালিনসন ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু তুমি আশ্চর্য রকম শান্ত ছিলে,—তোমায় দেখে তখন আমার ওই কথাই মনে হচ্ছিল। তুমি জানতে করবার তোমার কিছুই নেই, তাই ধিক্কারেও কিছু মনে করনি। বাজার যখন পড়ে যায় আমারও অবস্থা হয়েছিল ওইরকম।

যত সব বাজে কথা!—ম্যালিনসন চিৎকার করে উঠল, ইচ্ছে থাকলে জোচ্চুরি না করা চলে। এটা নিয়ম মেনে খেলার প্রশ্ন।

যখন গোটা খেলাটাই টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তখন নিয়ম মেনে চলা খুবই শক্ত। তা ছাড়া, সারা পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে বলতে পারে সেই

নিয়মগুলি কী। হার্ভার্ড আর ইয়েলের সব কটি অধ্যাপক তা বলতে পারবে না নিশ্চয়।

বিদ্রূপের সুরে ম্যালিনসন বলল, আমি প্রাত্যহিক আচরণের অতি সাধারণ নিয়মকটির কথাই বলছিলাম।

তাহলে আমি বলব যে, তোমার ওই প্রাত্যহিক আচরণের আওতায় ট্রাস্ট কোম্পানি আসে না।

যাকগে, তর্ক করে কী হবে।—তাড়াতাড়ি কনওয়ে বলে উঠল, তুমি যে তোমার আর আমার অবস্থার তুলনা করলে বারণার্ড, তাতে আমার এতটুকু আপত্তি নেই। আমরা সত্যিসত্যিই অন্ধভাবেই চলেছিলাম,—কথাটা সরলার্থেই বল বা অন্য যে কোন অর্থেই বল। কিন্তু উপস্থিত আমরা এই জায়গায় এসে হাজির হয়েছি,—আর সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। এবং আমি এখানেও তোমার সংগে একমত যে, আমাদের আরও বেশি অনুযোগের হেতু সহজেই ঘটতে পারত। এ-কথাও তো ভাবতে অবাক লাগে, যে-চারজন মানুষকে দৈবক্রমে হাজার মাইল দূরে বন্দী করা হয়েছে তাদের ভেতর অন্তত তিনজনের কিছুটা সান্ত্বনা রয়েছে। তুমি চাও বিশ্রাম এবং লুকোবার জায়গা; মিস ব্রিনক্লো চান পৌত্তলিক তিব্বতীদের আলোকের পথে নিয়ে যেতে।

আর তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?—বাধা দিয়ে ম্যালিনসন বলল, নিশ্চয় আমি নই?।

না, তৃতীয় ব্যক্তিটি আমি নিজে।—কনওয়ে উত্তর দিল, এবং আমার কারণটি মনে হয় সব চাইতে সরল—আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে।

রোজ সন্ধ্যায় কনওয়ে হয় ছাদে আর নয়তো পদ্মদীঘির ধারে একলা একটু বেড়ায়। সেদিনও সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে তার মনে হলো, তার দেহ ও মনের একটা অদ্ভুত স্থৈর্য এসেছে। সে যে শ্যাংরি-লাতে থাকতে চায় তা খুব খাঁটি কথা। শ্যাংরি-লার আবহাওয়া দেয় শান্তির প্রলেপন, তার রহস্য আনে

উদ্দীপনা—এবং সব মিলিয়ে কি চমৎকার একটা অনুভূতি! আজ কয়েকদিন ধরে, ধীরে ধীরে এবং পরীক্ষামূলকভাবে মঠ এবং তার অধিবাসীদের সম্পর্কে সে একটি অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে। এখনও তার মস্তিষ্ক তাই নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু তাকে মোটেই বিচলিত দেখায় না। যেন একজন গণিতবিদ জটিল একটি সমস্যা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন,—কিন্তু তাঁর উদ্বেগ শান্ত ও নৈর্ব্যক্তিক।

আর ব্রিয়ান্ট,—সে স্থির করেছে, তাকে সে বারণার্ড বলেই জানবে, এবং সেই নামেই ডাকবে। তার কৃতকর্ম, তার পরিচয় সব কিছু কনওয়ের মন হতে মুছে যায়, শুধু তার একটি কথা মনে থাকে, 'গোটা খেলাটাই টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে'। বারণার্ড সে কথাটি যে অর্থে বলেছিল তার চাইতে আরও অনেক ব্যাপকার্থে কনওয়ে ভাবে। কথাটি যে শুধু আমেরিকান ব্যাঙ্ক ব্যবসা আর ট্রাস্ট কোম্পানি পরিচালনা ব্যাপারেই প্রযোজ্য তা নয়। বাসকুল, দিল্লী এবং লণ্ডন সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে; যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্রাজ্য স্থাপন, দূতাবাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা, গভর্ণমেণ্ট হাউসের ডিনার সব কিছুর সম্বন্ধেই এই কথাটি খাটে। সবেতেই আজ ভাঙনের আভাস, শুধু বারণার্ডের পতন হয়তো একটু বেশী নাটকীয়। গোটা খেলাটাই টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ভাগ্যক্রমে যে-সব খেলোয়াড় সে টুকরোগুলি রক্ষা করতে পারছে না তাদের বড় একটা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হচ্ছে না। সে-তুলনায় অর্থবিনিয়োগকারীদের বরাত খারাপ বলতে হবে।

কিন্তু এখানে, শ্যাংরি-লাতে সব কিছুর মধ্যে গভীর প্রশান্তি। আকাশে চাঁদ নেই, তারায় ভরা আকাশ, কারাকালের শৃঙ্গটিকে ঘিরে ম্লান নীল আলোর আভা। কনওয়ের মনে হয়, বাইরে থেকে যে সব কুলিদের আসার কথা তারা যদি কোন কারণে এখনি এসে হাজির হয় তাহলে প্রতীক্ষা থেকে রেহাই পেয়ে সে বিশেষ আনন্দিত হবে না। বারণার্ডও হবে না,—তার কথা মনে হতে সে মনে মনে একটু হাসে। এটা সত্যিই কৌতুকপ্রদ;—হঠাৎ তখনই তার মনে হলো সে এখনও বারণার্ডকে ভালবাসে, নইলে তার কথা ভেবে সে কৌতুক

বোধ করত না। যেমন করেই হোক, একজন মানুষকে আটক করার পক্ষে দশ কোটি ডলারের ক্ষতিটা বড় বেশি; কারুর একটা ঘড়ি চুরি করলে বরং সেটা সহজ হতো।

তারপর সে ভাবে সেইদিনটির কথা, যেদিনটিতে শাংরি-লা থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল দীর্ঘ দুর্গম যাত্রা পথ,—সে-পথের শেষে হয়তো সিকিম কিংবা বালটিস্থানে কোন চা-বাগানের বাংলোয় পৌঁছবে। আনন্দময় সেই ক্ষণটি, কিন্তু হয়তো হতাশার সুরও মিশে থাকবে তার সাথে। তারপর চলবে করমর্দন আর আত্মপরিচয় দানের পালা; ক্লাবের বারান্দায় পানোৎসব; রোদে-পোড়া মুখগুলি চাপা অবিশ্বাসের চাহনিতে তাকিয়ে থাকবে তাদের দিকে। দিল্লীতে বড়লাট আর জঙ্গীলাটের সঙ্গে নিশ্চয় একটি সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা হবে; পাগড়ি-আঁটা ভৃত্যেরা সেলাম জানাবে; অসংখ্য বিবরণী তৈরি হবে এবং দেশ-বিদেশে পাঠান হবে। হয়তো ইংলণ্ড ও হোয়াইট হলে ফিরতে হবে; পি এ্যাণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে ডেকে কত খেলাধুলা; কোন আণ্ডার-সেক্রেটারির মাংসল হাতের স্পর্শ; সাংবাদিকদের আনাগোনা; নীরস বিদ্রূপাত্মক গলায় মহিলাদের প্রশ্ন—'এ কথা কি সত্য মিঃ কনওয়ে যে, আপনি যখন তিব্বতে ছিলেন···?' একটি বিষয়ে সে স্থিরনিশ্চিত, তার গল্পের খাতিরে বহুদিন সে বাইরে বাইরে ডিনার সারতে পারবে। কিন্তু তাতে কি সে আনন্দ পাবে? খারটোয়ামে থাকার শেষের দিকে গর্ডনের বলা একটি কথা মনে পড়ল—লণ্ডনে প্রতি রাত্রে বাইরে ডিনার করতে যাওয়ার চাইতে আমি বরং দরবেশের মত মাহদির সঙ্গে জীবন যাপন করব। কনওয়ের অনিচ্ছা অবশ্য অত তীব্র নয়—কিন্তু অতীত দিনের গল্প বলতে তার বিরক্তি ধরবে এবং মনে লাগবে ব্যথার ছোঁয়াচ এই আশঙ্কায় বাইরে ডিনার করার ইচ্ছা তার নেই।

হঠাৎ চিন্তার মাঝেই সে শুনতে পেল চ্যাঙের পায়ের শব্দ। পরক্ষণেই চ্যাং বলল;—তার ধীরে ধীরে কথা বলার ভংগিটি ক্রমে দ্রুততর হয়ে ওঠে,

মিঃ কনওয়ে, একটি সুখবর বহন করে এনেছি বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কথাটা শুনেই কনওয়ে ভাবল, তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কুলিরা এসে পৌঁচেছে; আশ্চর্য, এইমাত্র সে যে ওই কথাই ভাবছিল! এর জন্যে সে অতটা প্রস্তুত ছিল না, তাই যেন মনের মাঝে কোথায় ব্যথা অনুভব করে। প্রশ্ন করল, মানে?

চ্যাংকে প্রায় উত্তেজিত দেখায়, অবশ্য তার পক্ষে যতটা উত্তেজিত হওয়া সম্ভব। বলল, আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি মিঃ কনওয়ে। আর এ ব্যাপারে আমার যে একটু হাত আছে তার জন্যে আমি সুখী। আমিই একাধিকবার বিশেষভাবে সুপারিশ করায় প্রধান লামা সিদ্ধান্তে আসেন। তিনি এখনই আপনার সংগে দেখা করতে চান

ঈষৎ ঠাট্টার ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে কনওয়ে বলল, আপনি যেন একটু অসংলগ্ন হয়ে পড়েছেন, চ্যাং। কী ব্যাপার বলুন তো?

প্রধান লামা আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে আদেশ দিয়েছেন।

তাতো শুনলাম। তা এতে হৈ চৈ করার কী আছে?

কারণ এটি এক অদ্ভুত অভূতপূর্ব ঘটনা,—এমন কি আমি যে এ বিষয়ে এত উপরোধ করেছিলাম, আমি পর্যন্ত আশা করতে পারিনি যে এত তাড়াতাড়ি এরকম ঘটনা ঘটবে। আপনারা এখানে এসেছেন পনেরদিনও হয়নি, আর এরই মধ্যে তিনি আপনার সংগে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এ রকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

আমার তো এখনও সব ঘোলাটে লাগছে। আপনাদের প্রধান লামার সংগে আমায় দেখা করতে হবে—এটুকু তো বেশ ভালই বুঝলাম। কিন্তু আর কিছু আছে নাকি?

এইটাই কি যথেষ্ট নয়?

কনওয়ে হাসল। বলল, তা বটে, ভাববেন না যেন আমি অভদ্র। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমে আমি সম্পূর্ণ আলাদা কথা ভেবেছিলাম—যাকগে, ওকথা এখন থাক। আপনাদের প্রধান লামার সংগে সাক্ষাৎ করে আমি নিশ্চয় ধন্য এবং আনন্দিত হব। দেখা হওয়ার সময় কখন স্থির হয়েছে?

এখনই আপনাকে নিয়ে যাবার জন্তেই আমি এসেছি।

এখন যে অনেক রাত্তির হয়ে গিয়েছে?

তাতে কী হয়েছে। মিঃ কনওয়ে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন। এবং এই সংগে আমার ব্যক্তিগত আনন্দের কথাও না জানিয়ে পারছি না—বিশ্বাস করুন, আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর আমায় এড়িয়ে যেতে হতো, তাতে আমার খুবই বিরক্তি লাগত। এই ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা আর ঘটবে না ভাবতে সত্যি আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

আপনি একটি বিচিত্র মানুষ, চ্যাং।—কনওয়ে বলল, যাক, এখন ওসব কথা থাক। চলুন যাওয়া যাক। আমি প্রস্তুত,—আর আপনার চমৎকার মন্তব্যগুলির আমি তারিফ করি। চলুন।

সাত

কনওয়ে এমনিতে বেশ শান্ত, কিন্তু তার সারা শরীরে ঔৎসুক্যের ছায়া ফুটে ওঠে, চ্যাঙের সঙ্গে নির্জন প্রাংগণটি অতিক্রম করার সময় তা আরও তীব্র হয়। চ্যাঙের কথা থেকে এইটুকুই মনে হয় যে রহস্যের দ্বারদেশে এসে পৌঁচেছে সে ; কিছুক্ষণের ভেতরই সে জানতে পারবে তার ধারণা কতটুকু সত্য।

ওকথা বাদ দিলেও, সাক্ষাৎকারটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কাজের খাতিরে তাকে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত রাজা-মহারাজার সংগে দেখা করতে হয়েছে ; সে তাদের নিঃস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখেছে, চতুরতার সঙ্গে তাদের গুণাগুণ বিচার করেছে। আরেকটি গুণ ছিল তার, যে সব ভাষায় তার জ্ঞান খুবই কম সে সব ভাষাতেও সে চমৎকার ভদ্রভব্য কথা বলতে পারত। অবশ্য, এখানে হয়তো সে প্রধানত শ্রোতার অংশ গ্রহণ করবে।

সে লক্ষ্য করল, চ্যাং তাকে যে সব ঘরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলি সে আগে দেখেনি। প্রত্যেকটি ঘরই লণ্ঠনের আলোছায়ায় অপরূপ। তারপর একটি ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে উঠে চ্যাং সামনের দরজায় আঘাত করল। তিব্বতী ভৃত্য এমন তৎপরতার সঙ্গে দরজা খুলে দিল যে কনওয়ের মনে হলো সে সেইখানেই অপেক্ষা করছিল। উঁচুতলায় মঠের এই অংশটি-রুচিকর আলঙ্কারিক কাজে অন্য অংশ থেকে এতটুকু হীন নয়, বরং এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সর্বাংগ ঘিরে রয়েছে একটা শুষ্ক উষ্ণতা—যেন সব জানালাগুলি বন্ধ রেখে ভেতরে একটি তাপবিকিরণ যন্ত্র পূর্ণশক্তিতে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যতই সে এগিয়ে যায়, বায়ুশূন্যতা ততই বাড়ে, শেষে চ্যাং আরেকটি দরজার সামনে পৌঁছে দাঁড়াল। কনওয়ে সেখানে আরও বেশি উষ্ণতা অনুভব করে।

চাপাকণ্ঠে চ্যাং বলল, প্রধান লামা কেবল আপনারই সংগে দেখা করবেন। সে দরজাটি খুলে দাঁড়াল, তারপর কনওয়ে প্রবেশ করলে এমনই নিঃশব্দে দরজাটি বন্ধ করে দিল যে কিছু একটা ঘটল বলে বোঝা গেল না।

সংশয়াকুল চিত্তে দাঁড়িয়ে রইল কনওয়ে। ঘরের ভেতরের আবহাওয়া গুমোট, শুধু তাই নয়-তরল আঁধারে ভরা। কয়েকটি মুহূর্ত তার গেল সে আঁধার চোখে সইয়ে নিতে। তারপর ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারল কালো পর্দা দেওয়া নীচু-ছাদ একখানি ঘর, টেবিল চেয়ার দিয়ে অনাড়ম্বর ভাবে সাজান। একখানি চেয়ারে ক্ষুদ্রাকৃতি বিশীর্ণ রেখাবহুল একটি মানুষ—নিষ্কম্প ছায়ার মতো, যেন শাদা-কালোয় আঁকা বিবর্ণ-হয়ে-আসা একটি প্রাচীন চিত্র। প্রাচীন চোখ দুটির দৃষ্টিতে কনওয়ে কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল, সে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থামল। চেয়ারে উপবিষ্ট মানুষটি এবার একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল, কিন্তু তখনও তাকে দেহী বলে মনে হয় না। ক্ষুদ্রাকৃতি বৃদ্ধ মানুষ, অঙ্গে চৈনিক পোশাক,—পোশাকটি তাঁর বিশীর্ণ কাঠামোয় ঢল ঢল করছে।

পরিষ্কার ইংরেজিতে ফিস ফিস করে বললেন তিনি, আপনিই মিঃ কনওয়ে?

আশ্চর্য কোমল কণ্ঠস্বর, তাতে যেন বিষাদের একটু ছোঁয়াচ,—কনওয়ের কেমন অলৌকিক সুখানুভূতি হলো। কিন্তু তার যুক্তিবাদী মন দায়ী করতে চাইল ঘরের তাপমানকে। উত্তর দিল সে, আমিই কনওয়ে।

তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুব আনন্দিত হয়েছি মিঃ কনওয়ে। আমাদের মধ্যে একটা আলাপ হওয়া ভাল ভেবে আপনাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। আমার পাশে বসুন দয়া করে। কোন ভয় নেই, আমি বৃদ্ধ, আমার দ্বারা কারুর অনিষ্ট হবে না।

কনওয়ে বলল, আমার মতন ব্যক্তিকে আপনি আহ্বান করায় আমি বিশেষ ধন্য বোধ করছি।

ধন্যবাদ বন্ধু কনওয়ে,—তোমাকে ওই বলেই আমি সম্বোধন করব। আমার আজ বড় আনন্দের দিন। আমার দৃষ্টি খুবই ক্ষীণ, কিন্তু বিশ্বাস কর, চোখ দিয়ে ছাড়া অন্তর দিয়েও আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। আশা করি শ্যাংরি-লাতে তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

মোটেই না।

শুনে সুখী হলাম। চ্যাং অবশ্য তোমাদের জন্য সাধ্যমত করছে। তাতে সে খুবই আনন্দিত। সে বলছিল, তুমি আমাদের সম্প্রদায় ও কার্যাবলী সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছ।

আমি খুবই উৎসুক।

তোমার যদি তেমন অসুবিধে না হয় তাহলে আমি তোমাকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের কাহিনী সংক্ষেপে শোনাতে পারি।

তার মতন আনন্দ আমি আর কিছুতে পাব না।

আমিও তাই ভেবেছিলাম—এবং আশাও করেছিলাম। কিন্তু আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে—

তাঁর একটি হাত সামান্য একটু নড়ল, কনওয়ের কাছে সে-সংকেত দুর্বোধ্য, কিন্তু তখনই একজন ভৃত্য এসে চায়ের ব্যবস্থা করতে লাগল। তাঁদের কাছে চা-পান একটি রমণীয় অনুষ্ঠান। ছোট ছোট ছিমছাম কয়েকটি পাত্র লাক্ষামণ্ডিত একটি ট্রের ওপর স্থাপিত হলো, পাত্রগুলি প্রায় বর্ণহীন তরল পদার্থে পূর্ণ। এ প্রথা কনওয়ের কাছে নতুন নয়, তাই তার মোটেই খারাপ লাগে না।

প্রধান লামা বললেন, আমাদের প্রথা দেখছি তোমার পরিচিত?

কনওয়ের মনে একটি আবেগের উদয় হলো যেটা সে বিশ্লেষণও করতে পারে না, আবার নিবৃত্ত করারও ইচ্ছা হয় না। বলল সে, কয়েক বছর আমি চীনদেশে কাটিয়েছি।

তুমি চ্যাংকে তো একথা বল নি?

না।

তাহলে আমাকেই বা বললে কেন?

নিজ উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করতে কনওয়ে কখনও বিব্রত বোধ করে না, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে কোন কারণই খুঁজে পায় না। শেষে বলল, সত্যি কথা বলতে, কেন যে বললাম তা আমি জানি না, হয়তো আপনাকেই আমি বলতে চেয়েছিলাম।

যারা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছে তাদের মধ্যে এইটেই সবার বড কারণ, এখন বল তো গন্ধটা খুব মিষ্টি না? চীনদেশে নানান জাতের চা জন্মায়, তাদের সৌরভও চমৎকার, কিন্তু আমাদের উপত্যকায় বিশেষভাবে উৎপন্ন এই চা, আমার মতে চীনের চায়ের সমকক্ষ।

পাত্রটি মুখে তুলে কনওয়ে স্বাদ নিল। অদ্ভুত আস্বাদন, বোঝা যায় তো ধরা যায় না, জিবের ওপর কেমন এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। সে বলল, সত্যিই চমৎকার এবং আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন।

হ্যাঁ, উপত্যকার বহু রকম ওষধির মতো এটিও অপূর্ব অমূল্য জিনিস। শুধু শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে নয়, পূর্ণ আনন্দ পেতে হলে এর স্বাদ নিতে হবে অতি ধীরে ধীরে। কৌ কাই চৌর কাছ থেকে আমরা একটি বিখ্যাত আপ্তবাক্য শিখতে পারি। প্রায় পনের শো বছর আগে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি আখ খাবার সময় রসাল সারাংশটি পৌছতে ইতস্তত করতেন, বলতেন, 'আনন্দরাজ্যে আমি ধীরে ধীরে প্রবেশ করব'। প্রাচীন চৈনিক সাহিত্য তুমি কিছু পড়েছ নিশ্চয়?

কনওয়ে বলল অতি সামান্যই পড়েছে সে। সে জানে, যতক্ষণ না চায়ের পাত্রগুলি অপসারিত হচ্ছে ততক্ষণ এই প্রসঙ্গ চলবে—এটাই হচ্ছে রীতি। শ্যাংরি-লার ইতিহাস শোনার জন্যে সে উৎসুক হলেও এসব

আলোচনাতেও তার মোটেই বিরক্তি ধরে না। কৌ কাই চৌ-এর মন্থরতা তার ভেতর নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণ আছে।

অবশেষে একসময় পূর্বেকার মতই দুর্বোধ্য সংকেত পেয়ে ভৃত্যটি নিঃশব্দে এসে সরঞ্জামগুলি নিয়ে গেল।

শ্যাংরি-লার প্রধান লামা তারপর কোনরকম ভূমিকা না করে শুরু করলেন :

বন্ধু কনওয়ে, তিব্বতের ইতিহাসের সংগে হয়তো তোমার মোটামুটি একটা পরিচয় আছে। চ্যাঙের কাছে আমি শুনেছি, তুমি আমাদের গ্রন্থাগারটির যথেষ্ট সদ্‌ব্যবহার করেছ এবং আশা করি তুমি নিশ্চয়ই এ-অঞ্চলের স্বল্প অথচ চিত্তাকর্ষক ইতিকথা পাঠ করেছ। তুমি জান যে, মধ্যযুগে একসময় সারা এশিয়ায় নেস্টোরীয় খ্রীষ্ট ধর্মের বন্যা এসেছিল। সে-স্রোত চলে যাবার পরও বহুকাল তার স্মৃতিটুকু থেকে গিয়েছিল। তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমের প্রেরণায় কয়েকজন অসমসাহসী জেসুইট মিশনারির প্রচেষ্টায় খ্রীষ্টধর্মের পুনরভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। তাঁদের পর্যটন-কাহিনী, আমার মতে, সেন্ট পলের ভ্রমণকাহিনীর চাইতে আরও বেশি চিত্তাকর্ষক। যাই হোক, ক্রমে প্রকাণ্ড একটি জায়গা জুড়ে চার্চের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, লাসাতে আটতিরিশ বছর ধরে একটি খ্রীষ্ট মিশন ছিল; —অনেক য়ুরোপীয় আজ এ কথা জানেন না। ১৭১৯ সালে লাসা থেকে নয়, পিকিন থেকে চারজন কাপুশীনপন্থী সন্ন্যাসী বেরুলেন উচ্চভূমিতে কোথাও নেস্টোরীয় ধর্মমতের অবশিষ্ট কিছু আছে কিনা তারই অনুসন্ধান করতে।

ল্যানচাউ আর কোকো-নর দিয়ে নিদারুণ দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তাঁরা মাসের পর মাস চললেন দক্ষিণ-পশ্চিমে। পথেই তিনজনের মৃত্যু হলো। আরেক-জনেরও মুমূর্ষু অবস্থা—হঠাৎ দৈবক্রমে তিনি একটি গিরিসঙ্কটে গিয়ে পড়লেন। সেই গিরিসঙ্কটটি আজও রয়েছে এবং নীলচাঁদের উপত্যকায় আসার সেইটিই একমাত্র সম্ভাব্য পথ। সেখানে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের

সঙ্গে তিনি আবিষ্কার করলেন একটি সহৃদয় ও সমৃদ্ধিশালী জনপদ। অধিবাসীরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এল অতিথিকে সম্বর্ধনা জানাতে—কেননা সেইটেই হচ্ছে এখানকার চিরাচরিত ঐতিহ্য। অল্পদিনের ভেতরই তিনি নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন এবং প্রচারকার্য শুরু করলেন। এখানকার অধিবাসীরা ছিল বৌদ্ধ, কিন্তু তাঁর কথা শুনতে তাদের অনিচ্ছা ছিল তা নয়, এবং তিনি বেশ কিছুটা সফল হলেন। এই পাহাড়েই তখন একটি প্রাচীন মঠ ছিল, কিন্তু তখন সেটির বাহ্য এবং অধ্যাত্ম পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কাপুশীনপন্থীর প্রতিষ্ঠা আরও বৃদ্ধি পেলে তিনি স্থির করলেন সেই বর্ণোজ্জ্বল স্থানটিতেই একটি খ্রীষ্টীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রাচান গৃহ সুসংস্কৃত হলো এবং অনেক কিছু নতুন করে তৈরি করা হলো। ১৭৩৪ সালে যখন তাঁর বয়স তিপ্পান্ন বৎসর তিনি এইখানেই বাস করতে শুরু করলেন।

এই সন্ন্যাসীটির সম্পর্কে তোমাকে আরও কিছু বলব। তাঁর নাম পেরেন্ট, তাঁর জন্ম লুক্সেমবুর্গে। দূরপ্রাচ্য মিশনে যোগদান করার পূর্বে তিনি প্যারি, বোলন এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁকে বিবুধ ব্যক্তি বলা চলে। তাঁর প্রথম জীবনের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়—সেগুলি তাঁর বয়স এবং বৃত্তির দিক থেকে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। শিল্পকলা এবং সংগীতকলায় তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল এবং তিনি অনেকগুলি ভাষা জানতেন। যাজকবৃত্তি গ্রহণের আগে তিনি পার্থিব সব সুখ আস্বাদ করে গিয়েছিলেন। তিনি যখন যুবক তখন মালপ্লাকোয়েটের যুদ্ধ হয়, এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যুদ্ধ ও অভিযানের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছিলেন। খুব কর্মঠ ছিলেন তিনি। প্রথম কটি বছর তিনি এখানে যে-কোন লোকের সমান শারীরিক পরিশ্রম করতেন। নিজের বাগানের কাজ নিজেই করতেন; তাছাড়া এখানকার অধিবাসীদের অনেক কিছু শেখাতেন, আবার তাদের কাছ থেকেও শিখতেন। উপত্যকায় তিনি স্বর্ণখনি আবিষ্কার করেন, কিন্তু তাতে লুব্ধ হননি, তিনি বেশি উৎসাহী ছিলেন স্থানীয় গাছগাছড়া

ও ওষধি সম্পর্কে। তিনি বিনয়ী ছিলেন, কোনরকম গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। বহুবিবাহের বিরোধী ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঙ্গাসে ফলের জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে নিন্দার কিছু পাননি। ওই ফলগুলিতে ভেষজ গুণ হয়তো কিছু ছিল, কিন্তু সেগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল তাতে মৃদু নেশা হতো বলে। পেরল্ট নিজেও সেই ফলের কিছুটা ভক্ত হয়ে পড়েন, তাঁর স্বভাবই ছিল স্থানীয় জীবনের নির্দোষ এবং আনন্দময় যা কিছু সবই গ্রহণ করা এবং পরিবর্তে পাশ্চাত্যের আত্মিক সম্পদ স্থানীয় অধিবাসীদের দেওয়া। পেরল্ট বিবাগী তপস্বী ছিলেন না; পৃথিবীর যা ভালো তিনি উপভোগ করতেন, এবং তাঁর অনুগামীদের যেমন তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন, তেমনই আবার রন্ধনকার্যও শেখাতেন। আমি তোমাকে একজন স্থিরসঙ্কল্প, কর্মব্যস্ত, বিদগ্ধ, অকপট এবং উৎসাহী ব্যক্তির চিত্র দেবার চেষ্টা করছি, যিনি তাঁর যাজকীয় কর্তব্যের সঙ্গে এই ঘরগুলি গড়ে তোলার কাজেও সাধ্যমত সহায়তা করার জন্যে রাজমিস্ত্রির পোশাক পরতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেননি। সে-কাজ ছিল খুবই কঠিন, কিন্তু তাঁর অহমিকা আর দৃঢ়চিত্ততাই সব কিছু জয় করেছিল। অহমিকা বললাম, কেননা গোড়ার দিকে একটা প্রচণ্ড অহমিকাই তাঁকে কর্মে প্ররোচনা দিয়েছিল—সে-অহমিকা তাঁর নিজ ধর্মমতের, সে-অহমিকা তাঁকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছিল যে যদি গৌতম শ্যাংরি-লার উন্নত শৈলস্তবকে একটি মঠ প্রতিষ্ঠায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তাহলে রোমও পারবে নিশ্চয়।

দিন এগিয়ে চলল, এবং এই মনোভাব যে ক্রমে অনুগ্র শান্ততায় পর্যবসিত হবে এটাই স্বাভাবিক। প্রতিযোগিতা যুবধর্ম; মঠ প্রতিষ্ঠা সুসম্পূর্ণ হতে হতে পেরল্টের বয়স হয়ে গিয়েছিল অনেক। একটা কথা মনে রেখ, কঠোর দৃষ্টিতে বিচার করলে তিনি যে যথাযথ নিয়ম মেনে চলতেন তা নয়। কিন্তু কিছুটা স্বাধীনতা তাঁর দরকার, কেননা তাঁর ঊর্ধ্বতন যাজকেরা ছিলেন বহুদূরে—সে দূরত্বের পরিমাপ মাইল দিয়ে নয়, বছর দিয়ে। কিন্তু উপত্যকার অধিবাসী বা মঠের সন্ন্যাসী কারও তাঁর সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না, বরং তারা

তাঁকে ভালবাসত, তাঁর আদেশ পালন করত, এবং যত দিন যেতে লাগল তিনি ততই তাদের ভক্তিভাজন হয়ে উঠলেন। তিনি একটি কাজ করতেন,—কিছুদিন অন্তর অন্তর পিকিনের বিশপের কাছে তাঁর কাজের একটি বিবরণী পাঠাতেন, কিন্তু সেগুলি তাঁর কাছে প্রায়ই পৌছত না। বোঝা যেত যে নিদারুণ পথকষ্ট সহ্য করতে না পেরে পত্রবাহকেরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তাই তিনি তাদের জীবন আর বিপন্ন করতে চাইলেন না, এবং ওই শতকের প্রায় মধ্যভাগ হতে তিনি বিবরণী পাঠান ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর গোড়ার দিকের কয়েকটি বিবরণী যে করেই হোক বিশপের হাতে গিয়ে পৌচেছিল, এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁদের মনে সন্দেহ জেগেছিল, কেন-না ১৭৬৯ সালে হঠাৎ একজন বিদেশী একটি চিঠি নিয়ে আসে, চিঠিটি বারোবছর আগে লেখা। তাতে পেরল্টকে অবিলম্বে রোমে ফেরার আদেশ ছিল।

চিঠিটি যদি দেরি না করে ঠিক সময়ে এসে পৌছত তাহলেও তখন পেরল্টের বয়স হতো সত্তরের বেশি; যখন এসে পৌছল তখন তাঁর বয়স উননব্বুই। পাহাড়পর্বত এবং মালভূমি অতিক্রম করে অত দীর্ঘ পথ যাওয়া তখন কল্পনারও অতীত; বাইরের দুর্দান্ত বাতাস আর প্রচণ্ড শীত সহ্য করার মত শক্তি তখন তাঁর নেই। কাজেই তিনি অবস্থা বিস্তারিত করে একটি বিনীত উত্তর লিখে পাঠালেন; কিন্তু সে-উত্তর কোনদিন বিপুল পর্বতপ্রাচীর ভেদ করতে পেরেছিল কিনা জানা যায়নি।

অতএব পেরল্ট শ্যাংরি-লাতেই থেকে গেলেন। তাঁর প্রধানদের আদেশ অমান্য করে রইলেন তা নয়, শারীরিক অক্ষমতা আদেশ পালনের পথে অন্তরায় হলো। আর যাই হোক, তিনি তখন বৃদ্ধ মানুষ এবং শীঘ্রই মরণ এসে তাঁর জীবন ও অনিয়ম দুয়েতেই ছেদ টেনে দেবে। ইতিমধ্যে তিনি যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন সেখানে ধীরে ধীরে সবার অগোচরে কেমন পরিবর্তন শুরু হলো। হয়তো তাতে আক্ষেপের কিছু ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের

ছিল না কিছুই ; কেন-না যুগ-যুগান্তরের অভ্যাস ও ঐতিহ্য নির্মূল করা একটি মাত্র মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর এমন কোন পাশ্চাত্য সহকর্মী ছিল না যারা তাঁর শিথিল মুঠি থেকে দৃঢ় মুঠিতে কঠিন কর্তব্যভার তুলে নিতে পারত। সুপ্রাচীন ও ভিন্নধর্মী স্মৃতিবহ সেই জায়গাটিতে মঠ স্থাপন করা হয়তো তাঁর ভুলই হয়েছিল। এ যেন প্রাপ্যের অতিরিক্ত চাওয়া, কিন্তু একজন নব্বুই বৎসর বয়সের বৃদ্ধের পক্ষে তখন ভুল বোঝার আশা করাটা কি আরও বেশি চাওয়া নয়? যাই হোক পেরল্ট তখন কিছুই বোঝেননি। তিনি তখন অতি বৃদ্ধ এবং সুখী। তাঁর অনুগামীরা তাঁর উপদেশ ভুলে গেলেও তাঁকে ভোলেনি, এবং উপত্যকার অধিবাসীরা তাঁকে এমনই শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালবাসত যে তারা তাদের পুরানো রীতিনীতি পুনর্গ্রহণ করলেও তিনি তাদের সহজভাবেই ক্ষমা করতে পেরেছিলেন। পেরল্ট তখনও বেশ কর্মক্ষম ছিলেন এবং তাঁর ধীশক্তি আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ ছিল। আটানব্বুই বৎসর বয়সে তিনি বৌদ্ধ লিপি পড়তে শুরু করেন ; সেগুলি শ্যাংরি-লার কোন পূর্ব-অধিকারী রেখে গিয়েছিলেন। পেরল্ট স্থির করলেন, বৌদ্ধধর্মের গোঁড়ামির দিকটা আক্রমণ করে একটি পুস্তক রচনায় তিনি বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন। পুস্তক রচনা তিনি শেষ করে-ছিলেন (আমাদের কাছে সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি আছে), কিন্তু আক্রমণ হলো বড়ো মৃদু, কেন-না তখন তিনি শতবর্ষে পৌঁচেছেন—সে-বয়সে সুতীব্র কঠোরতাও স্তিমিত হয়ে আসে।

ইতিমধ্যে বুঝতেই পারছ, তাঁর প্রথমদিককার বহু অনুগামী মারা গেছেন, এবং তাঁদের শূন্য স্থান পূর্ণ করার মতো তেমন কেউ না থাকায় প্রাচীন ক্যাপুশীন পন্থীর সংখ্যা বেশ কমে আসতে লাগল। এঁকসময় তাঁদের সংখ্যা ছিল আশিরও বেশি, সংখ্যা নেমে এল কুড়িতে, শেষে থাকলেন মাত্র বারোটি, —তাঁদের প্রায় সবাই বৃদ্ধ। পেরল্টের জীবনে তখন গভীর প্রশান্তি নেমে এসেছে, তিনি তখন অপেক্ষা করছেন শেষ ক্ষণটির জন্যে। তাঁর বয়স তখন এত বেশি যে, তাঁর কোন রোগ বা অতৃপ্তি থাকতে পারে না,—একমাত্র অনন্ত

নিদ্রাই তাঁকে অভিভূত করতে পারে, এবং সেহেতু তাঁর মনে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। উপত্যকার অধিবাসীরা, হয়তো বা দয়াপরবশ হয়েই, তাঁকে খাদ্য-দ্রব্য ও পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহ করত, এবং গ্রন্থাগারটি তাঁকে যোগাত কাজ। তাঁর শরীর যেন ভেঙ্গে পড়েছিল, কিন্তু তাঁর যাজকীয় কর্তব্যের অন্তর্গত প্রধান আচার-অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করার মতো শক্তি তাঁর তখনও ছিল। গ্রন্থ, অতীত স্মৃতি আর মাদকের মৃদু সুখানুভূতি এই নিয়ে তাঁর শান্তিময় দিনের বাকি অংশটুকু কাটত। তাঁর মন তখনও এমনই স্বচ্ছ ছিল যে, ভারতীয়রা যাকে যোগ বলে এবং যা কতকগুলি বিশেষ শ্বাস-প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর, সেই রহস্যময় ক্রিয়াভ্যাস তিনি শুরু করে দেন। সেই বয়সে ওই ধরণের প্রচেষ্টা বিপজ্জনক এবং তাই ইতিহাসের স্মরণীয় বৎসর ১৭৮৯ সালে উপত্যকায় সংবাদ এল যে পেরল্ট মৃত্যু শয্যায়।

বন্ধু কনওয়ে, এই ঘরেতেই ছিলেন তিনি, এখান থেকে জানলার ভেতর দিয়ে তিনি কারাকালের একটা শুভ্র আবছা ছায়া মাত্র দেখতে পেতেন, তাঁর স্তিমিত দৃষ্টিতে স্পষ্টতর কিছু ধরা দিত না; কিন্তু তিনি মানস চক্ষেও দেখতে পেতেন, অর্ধশতাব্দী পূর্বে তার যে স্বচ্ছ অনুপ রূপ তিনি প্রথম দেখেছিলেন সেদিনও তাঁর মানস-চক্ষে তা প্রতিভাত হয়ে উঠত। আর তাঁর মনের সামনে ভেসে উঠত তাঁর বহু-অভিজ্ঞতার বিচিত্র এক মিছিল,—মরুভূমি ও উচ্চভূমির মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রাপথের দিনগুলি, পাশ্চাত্যের শহরগুলির ঘনীভূত জনতা, মার্লবোরোর দীপ্যমান সেনাবাহিনীর অস্ত্র ঝনৎকার। তাঁর মনে তখন তুষারশুভ্র প্রশান্তি, মৃত্যুর জন্যে তিনি প্রস্তুত, উৎসুক, আনন্দিত। বন্ধু-বান্ধব ও পরিচারকদের সকলকে একদিন শয্যাপার্শ্বে ডেকে তিনি সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, তারপর ক্ষণকালের জন্য একলা থাকতে চাইলেন। সেই মৌনী নিস্তব্ধতার মাঝে যখন দেহ বিলীয়মান, মনে অতীন্দ্রিয় সুখানুভূতি, তখনই তিনি আত্মার মুক্তি চেয়েছিলেন। কিন্তু আত্মার মুক্তি ঘটল না। দিনের-পর-দিন নিঃসাড়

নির্বাক অবস্থায় কেটে গেল, এবং তারপর তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। তখন তাঁর বয়স একশো আট বছর।

মৃদু কণ্ঠস্বর মুহূর্তের জন্য থামল। কনওয়ে ঈষৎ নড়েচড়ে বসল। তার মনে হয়, প্রধান লামা কোন সুদূর গোপনচারী স্বপ্নকে স্বচ্ছন্দ ভাষায় রূপ দিয়ে চলেছেন।

আবার তিনি শুরু করলেন: যাঁরা দীর্ঘকাল মৃত্যুর দ্বারদেশে অপেক্ষা করেছেন তাঁদেরই মতন পেরল্টও কেমন এক অর্থপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। এই অন্তর্দৃষ্টির কথা পরে আরও বলব। এখানে আমি শুধু তাঁর কাজ এবং আচার-আচরণের কথাই বলব, সেগুলি সত্যই বলবার মতো। কেননা, তখন নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পাবার অজুহাতে অলসভাবে দিনাতিপাত না করে তিনি অবিলম্বে আত্মশাসন ব্রতে নিজেকে কঠোরভাবে নিয়োগ করলেন, কিন্তু সেই কঠোরতার সঙ্গে মাদকের প্রতি তাঁর কিছুটা আসক্তি অদ্ভুতভাবে থেকে গেল। মাদক সেবন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম এমন কিছু মৃত্যুঞ্জয়ী ব্যবস্থা নয়, কিন্তু যা ঘটল, ১৭৯৪ সালে যখন শেষ প্রাচীন সন্ন্যাসীটিও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, পেরল্ট তখনও জীবিত।

বলিরেখাঙ্কিত ক্যাপুশিনপন্থীর জরাগ্রস্ত দেহের আর অবনতি হয় না, বছরের পর বছর তা অপরিবর্তিত থাকে। তিনি নিজেরই উদ্ভাবিত একটি গোপন প্রক্রিয়া অভ্যাস করতেন, এবং অল্পকালের মধ্যেই উপত্যকাবাসীদের কাছে তিনি নিঃসঙ্গ গিরিশিখরবাসী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক দুর্জ্ঞেয় যোগীরূপে পরিচিত হলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা তখন এক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, এবং শ্যাংরি-লাতে এসে তাঁকে সামান্য উপহার দেওয়া কিংবা মঠের প্রয়োজনে কিছু কায়িক পরিশ্রম করে দেওয়া তারা সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করতে লাগল। এইসব তীর্থযাত্রীদের পেরল্ট আশিস দান করতেন—তারা যে ভ্রান্ত, তারা যে দলভ্রষ্ট মেষের মতো, হয়তো এ-কথা ভুলে

গিয়েই আশীর্বাদ করতেন। কেননা, তখন উপত্যকার মন্দিরে মন্দিরে খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা-সঙ্গীতের সঙ্গে স্থানীয় ধর্মসঙ্গীত যুগপৎ গীত হতে শোনা যেত।

নূতন শতকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে কিংবদন্তীটি একটি বিচিত্রবর্ণ কাল্পনিক লোকোপাখ্যানে পরিণত হলো। লোকে বলত, পেরল্ট দেবতায় পরিণত হয়েছেন, তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, এবং কয়েকটি বিশেষ রাত্রে আকাশ প্রদীপ দেবার জন্য কারাকালের শৃঙ্গে উড়ে যান। প্রতি পূর্ণিমা রাত্রে কারাকালকে দেখায় পাণ্ডুর; তোমাকে একথা বলা বাহুল্য যে পেরল্ট বা অন্য কোন জীবিত মানুষই আজ পর্যন্ত কারাকালে উঠতে পারেনি। অপ্রয়োজনীয় হলেও একথা বললাম, তার কারণ উপত্যকায় বহু অবিশ্বাস্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে যে পেরল্ট সব কিছু অসাধ্য করেছেন এবং করতে পারতেন। যেমন উপত্যকাবাসীদের ধারণা যে পেরল্ট মৃত্তিকা ছেড়ে শূন্যে উঠতে পারতেন—বৌদ্ধ যোগতন্ত্রে তার বহু নজির আছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে তিনি ওই সম্পর্কে বহু রকমের পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হননি। তবে একটি জিনিস তিনি আবিষ্কার করেন, সাধারণ ইন্দ্রিয়গুলির দৌর্বল্য অন্যগুলির পরিপুষ্টির দ্বারা পূরণ করা অনেকটা সম্ভব। মনঃসঞ্চালন বিষয়েও তিনি বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন,—সেটা হয়তো একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার; আর যদিও তিনি রোগ নিরাময়ের কোন বিশেষ শক্তি দাবি করতেন না, তবু তাঁর উপস্থিতির মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যা অনেক রোগীকে ভালো করে তুলত।

এই অভিনব দিনগুলি তিনি কী ভাবে কাটিয়েছেন তা জানার জন্যে তোমার নিশ্চয়ই খুব আগ্রহ হচ্ছে। মোটামুটি বলতে গেলে, যেহেতু স্বাভাবিক বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়নি, তিনি অনুভব করতে লাগলেন যে ভবিষ্যতে কোন বিশেষ সময়ে তাঁর মৃত্যু হবে কি হবে না তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত। একবার অস্বাভাবিক প্রমাণিত হওয়ার পর তাঁর সহজেই বিশ্বাস হলো যে কোন মুহূর্তে সেই অস্বাভাবিকত্বের অবসান হবে। কাজেই, তিনি যে আসন্নতার

জন্য এতদিন সচেতন ছিলেন সে-চিন্তা অপসারিত হওয়াতে এবার তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জীবন যাপন শুরু করলেন,—যা এতদিন সম্ভবপর হয়নি। সব পরিবর্তনের মাঝে তাঁর হৃদয়ের একমাত্র অভিলাষ ছিল জ্ঞানতৃষা মেটান। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর ; যেন তা দেহের বন্ধন ছাড়িয়ে উচ্চতর প্রদেশে এক অসীম স্বচ্ছতায় এসে পৌঁচেছিল। এখন তাঁর মনে হলো, ছাত্রজীবনে কোন একটি বিষয় শিক্ষা করার চাইতে এখন সর্ববিষয়ে শিক্ষালাভ করা অনেক বেশি সহজ। তখন তিনি খুবই বইয়ের অভাব বোধ করতে লাগলেন ; কিন্তু গোড়া থেকেই তাঁর সঙ্গে কিছু বই ছিল এবং তুমি হয়তো শুনে কৌতুক বোধ করবে যে সেগুলির মধ্যে ছিল একখানি ইংরেজি ব্যাকরণ, একটি অভিধান এবং ফ্লোরিওকৃত মনটেনের একটি অনুবাদ। এগুলি সম্বল করেই তিনি তোমাদের ভাষার জটিলতা আয়ত্ত করতে শুরু করলেন ; এবং আমাদের গ্রন্থাগারে তাঁর ভাষা শিক্ষার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ একটি পাণ্ডুলিপি আজও রয়েছে—সেটি মনটেনের "ব্যর্থ অহঙ্কার" প্রবন্ধের তিব্বতী অনুবাদ,—এবং সেটি হচ্ছে এক অপূর্ব সৃষ্টি।

কনওয়ে একটু হেসে বলল, সুবিধা হলে সেটি দেখার ইচ্ছা থাকল।

প্রধান লামা বললেন : বেশতো। তুমি হয়তো ভাববে এটি একটি আশ্চর্য রকম অবাস্তব কাজ, কিন্তু স্মরণ রেখ পেরল্ট তখন আশ্চর্য রকম অবাস্তব বয়সে উপনীত হয়েছেন। এ ধরণের কোন কাজ না পেলে তাঁকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হতো অন্তত উনবিংশ শতকের চতুর্থ বৎসর পর্যন্ত। শাংরি-লার ইতিহাসে সে বৎসর একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, কেননা তখন য়ুরোপ থেকে নীলচাঁদের উপত্যকায় দ্বিতীয় অতিথি এসে উপস্থিত হলো। একজন অস্ট্রিয়ান যুবক, নাম হেনশেল, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ইতালিতে সে যুদ্ধ করেছিল ; উচ্চবংশসম্ভূত, মার্জিত-রুচি, এবং ব্যবহারে অপূর্ব। যুদ্ধে সর্বস্বান্ত হয়ে সে রাশিয়ার মধ্য দিয়ে এশিয়ায় এসেছিল কতকটা ভাগ্যান্বেষণে। ঠিক কী ভাবে সে মালভূমিতে এসে পৌঁচেছিল তা নিশ্চয়ই কৌতূহলপ্রদ, কিন্তু

তার নিজেরই সে-সম্বন্ধে যেন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, পেরল্টের মতো সে-ও অর্ধমৃত অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। শ্যাংরি-লা আবার তার অতিথিকে সম্বর্ধনা জানাল, সে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠল,—কিন্তু তারপর আর পেরল্টের সঙ্গে তার মিল নেই। পেরল্ট এসেছিলেন ধর্ম প্রচার করতে, এখানকার অধিবাসীদের দীক্ষিত করতে; কিন্তু হেনশেলের দৃটি আকৃষ্ট হলো সোনার খনির দিকে। তার একমাত্র চেষ্টা হলো ধনী হয়ে য়ুরোপে যত শিগ্‌গির সম্ভব ফিরে যাওয়া।

কিন্তু তার ফেরা হোল না। একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল,—অবশ্য সে ধরণের ব্যাপার তারপর প্রায়ই ঘটেছে, তাই এখন আর তাকে খুব অদ্ভুত বলা চলে না। শান্তিময় নীল চাঁদের উপত্যকায় পৃথিবীর দুঃখকষ্টের লেশমাত্র ছিল না, তারই আকর্ষণে বারে বারে লুব্ধ হয়ে সে তার যাওয়ার দিন কেবলই পেছুতে লাগল। স্থানীয় লোকপ্রবাদ শুনে একদিন সে শ্যাংরি-লাতে এলো এবং পেরল্টের সংগে তার প্রথম সাক্ষাৎ হলো।

সে সাক্ষাৎকার সত্যসত্যই ঐতিহাসিক। পেরল্ট তখন বন্ধুত্ব স্নেহ প্রভৃতি মানবিক হৃদয়বৃত্তির কিছুটা ঊর্ধ্বে হলেও তাঁর মন ছিল মমতায় ভরা,—তা ঠিক শুষ্ক মৃত্তিকায় জলসেচের মতো তার হৃদয় অভিসিক্ত করল। পেরল্টের সঙ্গে তার যে-সম্পর্ক গড়ে উঠল তা বিস্তারিত করতে চাইনে; একজন নিজেকে উজাড় করে দিল শ্রদ্ধার্ঘ, আর অন্যজন হলেন তাঁর জ্ঞানের, তাঁর আনন্দের, তাঁর প্রমত্ত স্বপ্নের সমঝদার,— ওটি ছাড়া পৃথিবীতে তাঁর বাস্তব কিছু ছিল না।

তিনি থামলেন। শান্তকণ্ঠে কনওয়ে বলল, মার্জনা করুন, কিন্তু এখানটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সহানুভূতিভরা কণ্ঠে উত্তর এলো: তা আমি জানি। এখানটা তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারলে আমি বিস্মিতই হতাম। আমাদের আলোচনা শেষ হবার আগে আমি এখানটা বেশ স্পষ্ট করে দেব। কিন্তু এখনকার মতো আমি সহজতর অংশগুলি বলব,—আশা করি তুমি তাতে কিছু মনে করবে না।

একটি বিষয় তুমি শুনলে খুশী হবে যে, চৈনিক শিল্প সংগ্রহ, গ্রন্থাগার গঠন, বাদ্যযন্ত্রাদি আনয়ন এ-সবই হেনশেলের কাজ। সে বন্ধুর পথ অতিবাহন করে পিকিনে যায় এবং ১৮০৯ সালে প্রথম চালান নিয়ে ফিরে আসে। তারপর সে আর কোনদিন উপত্যকা ছেড়ে যায়নি, কিন্তু সে নিজের বুদ্ধিবলে এমনই একটি ব্যবস্থার উদ্ভাবন করল যার সাহায্যে শ্যাং রি-লার সব কিছু প্রয়োজন বহির্জগৎ থেকে আসা সম্ভব হলো।

আপনারা বোধ হয় সোনা দিয়ে সেগুলির দাম পরিশোধ করতেন?—কনওয়ে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ। পৃথিবীর অন্য অংশে যে-ধাতুর অত সমাদর সেই ধাতুটি আমাদের প্রচুর পরিমাণে থাকায় আমরা সত্যিই ভাগ্যবান।

সমাদর এত বেশি যে এখানে স্বর্ণলোলুপের দল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেনি সেটাও ভাগ্যের কথা।

প্রধান লামা মাথাটা ঈষৎ নেড়ে তার কথায় সায় দিয়ে বললেন, হেনশেলেরও সব সময় এই ভয়ই ছিল। যে-সব কুলিরা মালপত্তর নিয়ে আসত তারা যাতে উপত্যকার খুব কাছাকাছি না আসতে পারে সে-বিষয়ে সে খুব সতর্ক ছিল। এখান থেকে একদিনের পথ দূরে সে তাদের কাছ থেকে মাল খালাস করে নিত, তারপর আমাদের উপত্যকার লোকেরা সেগুলি নিয়ে আসত। এমন কি গিরিসঙ্কটের ওপর সব সময় নজর রাখার জন্যে সে শান্ত্রীর ব্যবস্থাও করেছিল। কিন্তু শিগগিরই সে বুঝতে পারল তার চাইতে অনেক সহজ এবং ভাল নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে।

কি রকম?—সপ্রয়াস সতর্কতার সংগে কনওয়ে প্রশ্ন করল।

প্রধান লামা বললেন: বাইরের আক্রমণের কোন ভয় আমাদের নেই। দেশের দূরত্ব এবং অদ্ভুত অবস্থিতির জন্য তা সম্ভব নয়। বড় জোর কিছু কিছু পথভ্রষ্ট পান্থ কখনো বা এসে হাজির হতে পারে। তাদের সংগে কোন রকম অস্ত্রশস্ত্র থাকলেও, তারা এমন অবস্থায় এখানে এসে পৌঁছবে যে, তাদের কাছ

থেকে কোনরকম বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। তাই তখন স্থির করা হলো, বিদেশীরা ইচ্ছামত এখানে আসতে পারে—কিন্তু একটি শর্ত থাকবে।

তারপর অনেক বছর ধরে বিদেশীরা এখানে আসত। চৈনিক বণিকেরা অনেক সময় মালভূমি অতিক্রম করার সময় সহজ-অতিক্রম্য অংশের দিকে না গিয়ে এই দিকেই এসে পড়ত। কখনো বা যাযাবর তিব্বতীরা দলভ্রষ্ট হয়ে পরিশ্রান্ত পশুর মতো এখানে এসে উপস্থিত হতো। সকলকেই স্বাগত আহ্বান জানান হতো, অবশ্য কেউ কেউ যেন মৃত্যুবরণের জন্যই উপত্যকার আশ্রয়ে এসে পৌছত। ওআটার্লু'র বৎসরে দুজন ইংরেজ-মিশনারি পদব্রজে পিকিন যাবার পথে এক নামহীন গিরিবর্ত্ম দিয়ে পর্বতমালা অতিক্রম করে এমন সুস্থ শরীরে এসে হাজির হলো যেন তারা বেড়াতে এসেছে। ১৮২০ সালে গিরিসঙ্কটের সর্বোচ্চ শৈলস্তবকে একজন মুমূর্ষু গ্রীক ব্যবসায়ীকে দেখতে পাওয়া যায়,—তাঁর সংগে ছিল কয়েকজন অনাহারক্লিষ্ট পীড়িত পরিচারক। ১৮২২ সালে তিন জন স্পেনদেশীয় লোক স্বর্ণখনির আবছা খবর পেয়ে দীর্ঘকাল ঘুরে ঘুরে এবং বারে বারে ব্যর্থ হয়েও অবশেষে এখানে এসে পৌছয়।

১৮৩০ সালে অনেকগুলি অতিথি এসে উপস্থিত হয়। দুজন জার্মান, একজন রুশ, একজন ইংরেজ এবং একজন সুইদি অসমসাহসিকতার সংগে তিয়েনশান পার হয়ে আসেন। তাঁরা এসেছিলেন বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে, তখন থেকে এই উদ্দেশ্যে অভিযান যেন নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে ওঠে। তাঁরা যে সময় আসেন সেই সময় শ্যাংরি-লার আতিথেয়তায় সামান্য একটু পরিবর্তন এসেছে। যদি কেউ হঠাৎ উপত্যকায় এসে পড়ত শ্যাংরি-লা তাকে অভ্যর্থনা জানাত শুধু তাই নয়, উপত্যকার বাইরে একটি বিশেষ পরিধির মধ্যে কেউ এসে পড়লেও তার প্রত্যুদ্‌গমনের ব্যবস্থা হতো। এই সব ব্যবস্থার অবশ্য কারণ ছিল, সে কথা আমি পরে বলব। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে শ্যাংরি-লা অতিথির সম্পর্কে আর মোটেই নির্বিকার ছিল না; তখন নূতন অতিথির আগমন তার কাছে প্রয়োজনীয় এবং আকাঙ্ক্ষিত। এবং তারপর বছরের

পর বছর এমনও ঘটেছে, যে একাধিক অভিযাত্রীদল যখন দূর থেকে কারাকালের শোভা দেখে বিমুগ্ধ তখন আমাদের লোকেরা শ্যাংরি-লার সাদর আমন্ত্রণ নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে,—এবং সে আমন্ত্রণ প্রায় কোন সময়েই প্রত্যাখ্যাত হয়নি।

ইতিমধ্যে মঠ বর্তমানের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করল। একথা আমি না বলে পারি না যে, হেনশেলের কর্মক্ষমতা ও প্রতিভা ছিল অদ্ভুত এবং আজিকার শ্যাংরি-লা তার প্রতিষ্ঠাতার কাছে যতখানি ঋণী, হেনশেলের কাছেও তার চাইতে কম ঋণী নয়,—না কম নয়, আমার প্রায়ই একথা মনে পড়ে। কেননা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই তার ক্রমোন্নতির পথে এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছয় যখন দরকার হয় হেনশেলের মত একজন সবল অথচ সহৃদয় মানুষের। তার অভাব নিতান্তই অপূরণীয় মনে হতো যদি-না সে একটি-জীবনের অতিরিক্ত কাজ সমাপন করে যেত মৃত্যুর পূর্বে।

মৃত্যু।—প্রশ্ন নয়, যেন প্রধান লামার শেষ কথাটুকুর প্রতিধ্বনি করল কনওয়ে।

হ্যাঁ, সে মারা গেছে, এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। সে নিহত হয়। যে বছর ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ হয় সেই বছরে। তার মৃত্যুর ঠিক আগে একজন চৈনিক শিল্পী তার একটি ছবি আঁকে, ছবিটি তোমাকে দেখাতে পারি—এই ঘরেই আছে।

আবার তাঁর হাতের একটু মৃদু আলোড়ন দেখা গেল এবং তখনই একজন ভৃত্য এসে উপস্থিত হলো। কনওয়ে মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকের মতো দেখল, লোকটি ঘরের শেষপ্রান্তে গিয়ে ছোট একটি আবরণী সরিয়ে সেখানে একটি লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিল,—আবছা অন্ধকারে আলোটি দুলতে লাগল। তারপর সে শুনল, সেই মৃদু কণ্ঠস্বর তাকে এগিয়ে যেতে বলছে ; কিন্তু আশ্চর্য ! কনওয়ে তখন যেন তার গতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছে।

প্রায় স্খলিতপদে সে কম্পিত আলোকচক্রটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ছোট্ট ছবিটি, রঙিন কালিতে আঁকা, কিন্তু শিল্পীর শিল্পচাতুর্যে তা যেন জীবন্ত মনে হয়। শরীরের গড়ন অপূর্ব সুন্দর, কেমন যেন কুমারীর লাবণ্য মেশান, এবং সেই চিত্তহারী সৌন্দর্যের মধ্যে কনওয়ে দেখতে পেল সময়, মৃত্যু ও শিল্পকৌশল অতিক্রম করে আসা একটা অদ্ভুত ব্যক্তিক আবেদন। কিন্তু প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার পর সে সবার বড় বিস্ময়টি উপলব্ধি করল: ছবির মুখ যুবকের।

ফিরে আসতে আসতে সে অসম্বদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলল, কিন্তু—আপনি যে বললেন—ছবিটি তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে তোলা হয়েছিল?

হ্যাঁ। ছবিটি তার অবিকল প্রতিকৃতি।

তাহলে আপনি যে-বৎসর বলেছেন সেই বৎসরে তাঁর মৃত্যু হলে—

হ্যাঁ, সেই বৎসরেই সে মারা গিয়েছিল।

কিন্তু আপনি যে বলেছেন, তিনি আসেন ১৮০৩ সালে যখন তিনি যুবক?

হ্যাঁ।

মুহূর্তের জন্যে কনওয়ে মুখে আর কোন কথা জোগায় না; তবু জোর করে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, এবং আপনি বলছিলেন তিনি নিহত হন?

হ্যাঁ। একজন ইংরেজ তাকে গুলি করে। শ্যাংরি-লাতে তার আসার কয়েক সপ্তাহ পরে ঘটনাটি ঘটে। সেও সেই অভিযাত্রীদলের একজন।

কিন্তু কারণটা কী?

জনকতক কুলিকে নিয়ে তাদের বিবাদ হয়েছিল। ঠিক তার আগেই হেনশেল তাকে আমাদের অতিথি-সম্বর্ধনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি জানায় সেটি অনেকটা কঠিন কর্তব্য এবং ওই ঘটনার পর থেকে আমি শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও কর্তব্যটি নিজের উপর নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

প্রধান লামা বহুক্ষণ নীরবে রইলেন। সে নীরবতায় যেন একটা জিজ্ঞাসার

ইংগিত থাকে। তারপর আবার তিনি বললেন, বন্ধু কনওয়ে, সে শর্তটি কী হতে পারে তাই বোধ হয় তুমি ভাবছ ?

কনওয়ে ধীর অনুচ্চ কণ্ঠে উত্তর দিল, আমার মনে হয়, আমি তা অনুমান করতে পেরেছি।

পেরেছ ? আমার এই দীর্ঘ এবং বিচিত্র গল্প শুনে আর কিছু অনুমান করতে পারছ ?

তাঁর প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে কনওয়ের মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল। ঘরে তখন যেন সেই প্রাচীন মূর্ত প্রশান্তিকে কেন্দ্র করে আবছায়ার কেমন একটা আবর্ত রচিত হয়েছে। তাঁর কাহিনী সে এত নিবিষ্ট চিত্তে শুনেছে যে, হয়তো সেই কারণেই সে তার নিহিতার্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করার অবকাশই পায়নি। এখন সচেতন অভিব্যক্তির একটুমাত্র প্রচেষ্টাতেই সে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে উঠল এবং কথা বলতে গিয়ে তার বর্ধমান নিশ্চয়তা-বোধ যেন গলায় আটকে গেল। তবু সে অসম্বদ্ধ কণ্ঠে বলল,—এ যেন অসম্ভব—তবু না ভেবেও তো পারিনে—আশ্চর্য—অদ্ভুত—সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য—অথচ আমার বোধশক্তির একেবারে বাইরে তাও তো নয়—

কী, বৎস ?

উত্তর দিতে গিয়ে কনওয়ের সারা শরীর ভাবাবেগে থর থর করে কেঁপে উঠল, কেন তা সে জানে না এবং তা গোপন করার চেষ্টাও সে করে না ; সে বলল : ফাদার পেরল্ট, আপনি আজও জীবিত।

আট

আলোচনা কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত রেখে প্রধান লামা আবার চায়ের জন্য সংকেত করলেন। কনওয়ে তাতে মোটেই বিস্মিত হলো না, কেননা দীর্ঘক্ষণ একভাবে শ্যাংরি-লার ইতিহাস বর্ণনা করে তিনি নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন। এই বিরামটুকুর জন্যে কনওয়ে নিজেও কম কৃতজ্ঞ নয়। সে ভেবে দেখে, রুচির দিক থেকে বা যে কোন দিক থেকে দেখলে এই বিশ্রামটুকুর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া চা-ভরা পাত্রগুলি এবং আনুষঙ্গিক নিয়মানুগ টুকিটাকি ভব্যতা কোন সঙ্গীতালাপের শেষটুকুর মতই তার মনে হয়। তার এই চিন্তাটুকু অবলম্বন করে (অবশ্য যদি না হঠাৎ মিলে গিয়ে থাকে) কনওয়ে প্রধান লামার মনঃসঞ্চালন শক্তির অদ্ভুত রকম প্রমাণ পেল; কেননা ঠিক তখনই তিনি গানবাজনা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন এবং শ্যাংরি-লা যে তার সংগীত-রুচিকে নিতান্ত হতাশ করেনি তাতে তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন। কনওয়ে যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে বলল যে, শ্যাংরি-লাতে য়ুরোপীয় গীতিকারদের প্রায় সমগ্র রচনা দেখে সে বিস্মিত হয়েছে।

চায়ে মৃদু চুমুক দিতে দিতে তিনি কনওয়ের অভিনন্দন গ্রহণ করলেন, বললেন, ওবিষয়ে আমরা খুব ভাগ্যবান। আমাদের মধ্যে একজন প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ রয়েছেন, তিনি অবশ্য সোঁপ্যার ছাত্র ছিলেন, আমরা তাঁর ওপরই ওদিককার সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। তোমার সংগে তাঁর নিশ্চয়ই দেখা হবে।

তাঁর সংগে পরিচিত হলে আমি আনন্দিত হব। ভাল কথা, চ্যাং বলছিলেন পাশ্চাত্য গীতিকারদের মধ্যে মোজার্ট নাকি আপনার প্রিয়।

হ্যাঁ।—উত্তর দিলেন তিনি, মোজার্ট-এর মধ্যে কেমন একটা ভাবগম্ভীর শালীনতা আছে যা আমাদের খুব ভালো লাগে। সে যেন একটি সৌধ নির্মাণ

করে যা খুব বড়ও নয় আবার খুব ছোটও নয় এবং যার সাজ-সরঞ্জামে নিখুঁত সুরুচির পরিচয়।

যতক্ষণ না চায়ের পাত্রগুলি অপসারিত হলো ততক্ষণ এই ধরণের কথার আদানপ্রদান চলল। তারপর কনওয়ে শান্তকণ্ঠে মন্তব্য করল, তাহলে আমাদের আগেকার আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক। আপনারা আমাদের এখানে রাখতে চান, তাই না? বোধ হয় আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় শর্ত এই?

পুত্র, তুমি ঠিকই অনুমান করেছ।

অর্থাৎ আমাদের এখানে চিরদিনের জন্য থাকতে হবে?

আমরা সকলেই এখানে আছি 'চিরদিনের জন্য'।

একটা বিষয় আমি বুঝতে পারছি না। পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে আমরা চারজন নির্বাচিত হলাম কেন?

পূর্বেকার মতো আত্মনিষ্ঠ ভংগিতে প্রধান লামা বললেন, তুমি শুনতে চাইলে নিশ্চই বলব, কিন্তু সেটি এক জটিল গল্প। তুমি বুঝতেই পারছ যে, সব সময়ই আমাদের উদ্দেশ্য হলো, যতটা সম্ভব নতুন মানুষ সংগ্রহ করে আমাদের সংখ্যা বজায় রাখা। তাছাড়া বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন সময়ের মানুষদের আমাদের মধ্যে পেলে আমরা খুশী হই। দুর্ভাগ্যক্রমে য়ুরোপীয় যুদ্ধ ও রুশবিপ্লবের পর থেকে তিব্বতে অভিযাত্রীদল আসা এক রকম বন্ধ হয়ে গেছে; বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এখানে শেষ অতিথি এসেছেন ১৯১২ সালে,— একজন জাপানি, এবং সত্য বলতে কি, তিনি আমাদের হতাশ করেছেন। দেখ কনওয়ে, আমরা বাক্‌সর্বস্ব প্রতারক নই; সাফল্য সম্বন্ধে আমরা কোন প্রতিশ্রুতি দিই না, বা দিতে পারি না। কোন কোন অতিথি এখানে থেকে কিছুই লাভ করে না, অনেকে আবার স্বাভাবিক অর্থে দীর্ঘ জীবন যাপন করার পর সামান্য রোগেই মারা যায়। আমরা দেখেছি, সাধারণত তিব্বতীরা উচ্চতা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশে অভ্যস্ত বলে বহির্জগতের অন্য জাতির চাইতে

কম অনুভূতিশীল। সুন্দর মানুষ তারা; তাদের অনেককে আমরা এখানে গ্রহণ করেছি। কিন্তু তাদের ভেতর কজন যে শতবর্ষ অতিক্রম করবে তা বলা শক্ত। চীনারা আর একটু ভাল, কিন্তু তাদের নিয়েও আমরা বিফল হয়েছি বেশি। আমাদের সব চাইতে আকাঙ্ক্ষিত হচ্ছে য়ুরোপের নর্ডিক আর লাতিন জাতীয় লোকেরা। আমেরিকাবাসীরও বোধ করি তাদেরই মতো উপযোগী হবে, এবং অবশেষে তোমাদের দলে ওই জাতির একজনকে পাওয়ার ভাগ্য আমাদের হয়েছে। কিন্তু তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শেষ হয়নি। যা বলছিলাম, গত দুই দশকের মধ্যে আমরা কোন নবাগতকে আমাদের মধ্যে পাইনি এবং সেই সময়ের মধ্যে কয়েকটি মৃত্যু ঘটায় একটি সমস্যার উদ্ভব হলো। কয়েক বছর আগে আমাদেরই একজন যুবক এক অপূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে এগিয়ে এল। সে যুবক উপত্যকার অধিবাসী, অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং আমাদের আদর্শে তার পরিপূর্ণ আস্থা। কিন্তু প্রকৃতির এমনই যে খেয়াল যে আর সব উপত্যকাবাসীদের মতো সেও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল—যে-সুযোগ দূরাগতদেরই ভাগ্যে ঘটে থাকে। সে বলল যে উপত্যকা থেকে কিছুদিনের জন্যে সে কাছাকাছি কোন দেশে যাবে এবং সেখান থেকে এক অভিনব উপায়ে আমাদের নূতন সহকর্মী সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে: সে-উপায়টি এমনই যে আগেকার যুগে একেবারে অসম্ভব ছিল। তার প্রস্তাব বৈপ্লবিক হলেও আমরা বিশেষভাবে বিবেচনা করার পর সম্মত হলাম। কেননা, শ্যাংরি-লাতেও আমাদের সময়ের সাথে চলতে হবে।

অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, আপনারাই তাকে পাঠিয়েছিলেন আকাশ-পথে কাকেও এখানে নিয়ে আসার জন্যে?

বুঝতেই পারছ, অদ্ভুত প্রতিভাবান ও কর্মকুশল যুবক সে, আর আমাদেরও তার ওপর খুব আস্থা ছিল। এ-পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ তারই, আমরা সেটি কাজে পরিণত করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাকে দিয়েছিলাম। আমরা কেবল এইটুকুই

সুস্পষ্ট জানি যে, তার পরিকল্পনার প্রথমাংশ ছিল আমেরিকার কোন বৈমানিক-বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষানবিসি করা।

কিন্তু তার পরের অংশটুকু সে কী ভাবে নিষ্পন্ন করল? নেহাৎ দৈবক্রমে সেই বিমানটি তখন বাসকুলে ছিল—

ঠিক কথা, কনওয়ে, অনেক কিছুই তো দৈবক্রমে ঘটে থাকে। মোট কথা, যে সুযোগের জন্যে টালু অপেক্ষা করছিল সে-সুযোগ সে পেয়েছিল। যদি না পেত তাহলে হয়তো দু-এক বছরের ভেতর আর একটি সুযোগ এসে জুটত, কিংবা হয়তো সুযোগই হতো না। আমি স্বীকার করছি, যখন শাস্ত্রী এসে খবর দিল যে টালুর বিমান মালভূমিতে অবতরণ করেছে তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। বিমানশিল্পের দ্রুত উন্নতি হচ্ছে বটে, কিন্তু তবু আমার ধারণা ছিল সাধারণ বিমানের পক্ষে ওই রকম পর্বতমালা অতিক্রম করে আসতে এখনও অনেক দেরি।

আমাদের বিমানটি সাধারণ বিমান ছিল না। পাহাড় পর্বতে ওড়ার জন্যেই ওটি বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল।

আবার দৈব? আমাদের তরুণ বন্ধুটি দেখছি খুবই ভাগ্যবান। তার সঙ্গে এ বিষয়ে কোন আলাপ করতে পেলাম না বলে আমরা দুঃখিত—তার মৃত্যুতে আমরা সকলে ব্যথিত। তাকে তোমারও খুব ভাল লাগত, কনওয়ে।

কনওয়ে ঈষৎ মাথা নাড়ল, তার মনে হল, সেটা খুবই সম্ভব। একটুখানি নীরব থাকার পর সে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এত কিছু করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি?

পুত্র, তোমার ওই প্রশ্নটি করার ধরণ আমাকে প্রচুর আনন্দ দিল। আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় কাকেও আমি এত শান্তকণ্ঠে প্রশ্নটি করতে শুনিনি। আমার সত্যোদ্ঘাটন নানাভাবে অভ্যর্থিত হয়েছে—ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ, অবিশ্বাস, হিস্টিরিয়া সব কিছু দিয়ে; কিন্তু আজিকার রাত্রের আগে শুধু কৌতূহল দিয়ে কখনও অভ্যর্থিত হয়নি। এই মনোভাবকেই আমি স্বাগত

অভিনন্দন জানাব। তুমি আজ আগ্রান্বিত হয়েছ, কাল উৎসাহিত হবে এবং পরিশেষে হয়তো তোমার অনুরাগ দাবি করব।

অতখানি প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি না।

তোমার সংশয় আমাকে সুখী করল, কনওয়ে—গভীর ও অর্থবোধক বিশ্বাসের মূলে আছে সংশয়। কিন্তু তর্ক থাক। তোমার আগ্রহ হয়েছে, এবং তোমার কাছ থেকে সেইটুকুই যথেষ্ট। আর একটি কথা বলব, তোমাকে যা-কিছু বললাম তা এখনকার মতো তোমার সংগী তিনজনের কাছে গোপন থাকবে।

কনওয়ে নীরব।

সময়ে তারা তোমার মত সবই জানতে পারবে, কিন্তু তাদেরই মঙ্গলের জন্যে তাড়াহুড়া না করাই বাঞ্ছনীয়। তোমার বিবেচনা-বোধ সম্বন্ধে আমার এমনই শ্রদ্ধা যে তোমার কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি আমি চাই না ; আমি জানি, আমরা উভয়ে যা ভাল বুঝব তুমি সেইমত কাজ করবে। আচ্ছা, এখন তোমার সম্পর্কে আমি একটি মনোরম চিত্র আঁকছি। পৃথিবীর নিরিখে আজও তুমি যুবক ; তোমার জীবন তোমার সামনে ; স্বাভাবিক হিসেবে, তুমি আরও বিশ থেকে তিরিশ বছর প্রায় একই ভাবে কাটাবে,—শুধু তখন তোমার কর্মশক্তি খুব ধীরে ধীরে কিছুটা হ্রাস পাবে। খুব যে নৈরাশ্যজনক চিত্র তা মোটেই নয়, এবং আমি আশা করি না যে, আয়ুষ্কালের এই মধ্যবর্তী সময়-টুকু তুমি সেইভাবে দেখবে যেভাবে দেখি আমি—সংক্ষিপ্ত, শশব্যস্ত, অসংখ্য উত্তেজনায় উন্মদ। তোমার জীবনের প্রথম পঁচিশটি বছর যেন এক মেঘের আড়ালে কেটেছে—কেননা তখন জাগতিক বিচারে বয়স ছিল কম, আর শেষের পঁচিশটি বছর কাটবে ঘনতর এক মেঘের আড়ালে—কেননা তখন বয়স হবে বেশি ; এবং এই দুটি মেঘের মাঝে কতটুকু সময়ের জন্যেই বা মানুষের জীবন রৌদ্রালোকে ঝলমল করে ! কিন্তু তুমি হয়তো ভাগ্যবান পুরুষ, কেননা শাংরি-লার নিরিখে তোমার জীবনের রৌদ্রালোকিত দিনগুলির এখনও শুরুই

হয়নি। হয়তো একাধিক দশক পরেও তোমার বয়স বেড়েছে বলে তুমি বুঝতেই পারবে না,—হেনশেলের মত তুমিও হয়তো এক দীর্ঘ বিস্ময়কর যৌবনের অধিকারী হবে। কিন্তু বিশ্বাস কর, সেটা হচ্ছে মাত্র প্রাথমিক এবং বাহ্য স্তর। এমন দিন আসবে যখন আর পাঁচজনের মতো তোমারও বয়স বাড়বে কিন্তু খুব ধীরে ধীরে এবং একটা বৃহত্তর অনুভূতির ভিতর দিয়ে। আশীবছর বয়সেও ঠিক যুবকের মতই তুমি ওই গিরিসঙ্কটে আরোহণ করতে পারবে, কিন্তু তাবলে তার দ্বিগুণ বয়সে এরকম অলৌকিক শক্তির আশা করা ঠিক হবে না। আমরা কিছু অলৌকিক শক্তির অধিকারী নই ; আমরা মৃত্যু, এমন কি জরাও জয় করতে পারিনি। সংক্ষিপ্ত যে অন্তর্বর্তীকালটুকুকে জীবন বলা হয় তার গতি আমরা হ্রাস করেছি বা কখনও কখনও করতে পারি। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা তা করি সেগুলি এখানে যেমনই সহজসাধ্য অন্যত্র তেমনই অসম্ভব। কিন্তু একটি কথা ভুললে চলবে না, শেষের দিন সবারই আসবে।

তবু, তোমার ভবিষ্যতের যে ছবিটি আঁকলাম সেটা নিশ্চয়ই মনোরম—দীর্ঘায়ত প্রশান্তির ক্রোড়ে বসে তুমি সূর্যাস্ত দেখবে যেমন বহির্জগতের লোকেরা ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি শোনে, অথচ তাদের মতো উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ এতটুকু থাকবে না। বছরের পর বছর আসবে ও যাবে, কায়িক সুখভোগ ছেড়ে অনাসক্তির আনন্দ-লোকে হবে তোমার গতিবিধি, সেখানে অপরিমেয় পরিতৃপ্তি। হয়তো তোমার পেশীগুলি শিথিল হয়ে পড়বে, মন্দাগ্নি হবে, কিন্তু ক্ষতি পূরণের মতো লাভও হবে। তুমি অর্জন করবে প্রশান্তির সাথে গভীরতা, পূর্ণতার সাথে প্রজ্ঞা এবং স্মৃতির জাদুকরী শক্তি। আর সব চাইতে অমূল্য সম্পদ পাবে—সময়, যা বড় দুষ্প্রাপ্য, বড় সুন্দর, এবং যাকে বেশি অনুসরণ করতে গিয়ে তোমাদের প্রতীচীর লোকেরা আরও বেশি করে হারিয়েছে। একটু ভেবে দেখ কনওয়ে। পড়ার জন্যে তুমি সময় পাবে, সময় বাঁচাবার জন্যে তোমায় কখনও তাড়াহুড়া করে কেবল পাতা উলটে যেতে হবে না, কিংবা বড় বেশি সময় নেবে বলে কোন

কিছু পড়ার বাসনাও ত্যাগ করতে হবে না। তুমি সংগীতকলার অনুরাগী, এখানে নানানরকম বাদ্যযন্ত্র ও অসংখ্য স্বরলিপি রয়েছে, আর আনন্দের শেষ-বিন্দুটি পর্যন্ত উপভোগ করার মতো আছে অব্যয় অব্যস্ত সময়। তাছাড়া, আমাদের মনে হয়, তুমি সহৃদয় বন্ধুত্বের প্রয়াসী ; যখন মৃত্যু এসে যথারীতি ব্যস্ততার সঙ্গে তাগিদ দিচ্ছে না তখন কি তুমি নির্মল বন্ধুত্ব এবং দীর্ঘকালব্যাপী সহৃদয়তার বিনিময় লোভনীয় ভাব না ? আর যদি নির্জনতাই চাও, তাহলে তোমার নিভৃত চিন্তাগুলিকে সুন্দরতর করার জন্যে আমাদের গৃহগুলি কি নিয়োজিত হতে পারে না ?

কণ্ঠস্বর থামল, কিন্তু কনওয়েও কোন কথা বলল না।

বন্ধু কনওয়ে, তুমি তো কিছু বলছ না। আমার দীর্ঘ বক্তৃতা ক্ষমা করো,—আমি এমন একটা বয়সে পৌচেছি এবং এমনই এক সমাজের লোক যে আমার পক্ষে বাক্‌বহুল হওয়াটা দূষণীয় নয়।···কিন্তু তুমি হয়তো তোমার স্ত্রী, মাতা-পিতা ও সন্তানসন্ততির কথা ভাবছ ? কিংবা হয়তো কোন উচ্চাশার কথা ? বিশ্বাস কর, প্রথম প্রথম তীব্র ব্যথা অনুভব করলেও, আজ থেকে একটি দশকের মধ্যে তার আর ছায়ামাত্র থাকবে না। অবশ্য আমি যদি তোমার মন নির্ভুলভাবে বুঝে থাকি—তোমার এ ধরণের কোন খেদ নেই।

তাঁর এই নির্ভুল সিদ্ধান্তে কনওয়ে চমকে উঠল। বলল, ঠিকই বলেছেন। আমি অবিবাহিত, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব খুবই কম, আর উচ্চাশা আমার কিছু নেই।

কোন উচ্চাশা নেই ? বহুব্যাপ্ত ব্যাধিগুলি তুমি এড়ালে কি করে ?

এই প্রথম কনওয়ের মনে হলো সে বাস্তবিকই কথোপকথনে অংশ গ্রহণ করছে। উত্তর দিল, আমার চাকরিজীবনে লক্ষ্য করেছি সাফল্য নামে যা খ্যাত তার বেশির ভাগই অপ্রীতিকর কাজ—তার ওপর যতটুকু চেষ্টা করতে মন যায় তার বেশি করার বাধ্যকতা তো আছেই। আমি ছিলাম দূতাবাসের কাজে—নিতান্তই অপ্রধান পদে, কিন্তু আমার একরকম খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তাতে তোমার অন্তর ছিল না?

মন প্রাণ কিছুই ছিল না, এমন কি তাতে আমি কখনও অর্ধেকের বেশি শক্তি ব্যয় করিনি। স্বভাবতই আমি একটু অলসপ্রকৃতির।

প্রধান লামার মুখের কুঞ্চনগুলি আরও গভীর, আরও বঙ্কিম হয়ে উঠল; কনওয়ে বুঝতে পারল, খুব সম্ভব সেটা হাসির রেখা। তিনি বললেন, বাজে কাজে অলসতা একটি বড় গুণও হতে পারে। যাই হোক, আমাদের এখানে ওরকম জুলুম কিছু দেখতে পাবে না। মনে হয়, চ্যাং তোমাকে আমাদের পরিমিতি নীতিটি বুঝিয়ে দিয়েছে, এবং যে-সব জিনিস সম্পর্কে আমরা সর্বদা পরিমিত তার ভেতর কাজও একটি। যেমন আমার কথাই ধর, আমি দশটি ভাষা শিখেছি; আমি যদি অপরিমিত পরিশ্রম করতাম তাহলে দশটি হয়তো বিশটিতে দাঁড়াত। কিন্তু আমি তা করিনি। অন্য সব বিষয়েও একই ব্যবস্থা; তুমি দেখতে পাবে আমরা অসংযত বা অতিসংযত কোনটাই নই। যে-পর্যন্ত না বার্ধক্য এসে সাবধানতা অনিবার্য করে তোলে, আমরা খাওয়া-দাওয়ার সুখ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করি। আবার—আমাদের তরুণ সধর্মীদের হিতার্থে—উপত্যকার তরুণীরা নারীত্ব সম্পর্কে আমাদের পরিমিতি নীতিটি সানন্দে গ্রহণ করেছে। সব দিক থেকে ভেবে দেখলে, আমার বিশ্বাস, আমাদের জীবনপ্রণালীর সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে তোমায় বিশেষ বেগ পেতে হবে না। চ্যাং, অবশ্য খুবই আশান্বিত—এবং আমিও এই সাক্ষাৎকারের পর সমান আশান্বিত হয়েছি। কিন্তু, একটা কথা না বলে পারি না, তোমার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আজ পর্যন্ত যা শ্যাংরি-লার কোন অতিথির মধ্যে দেখতে পাইনি। সেটা নৈরাশ্যবোধ নয়—তিক্ততা তো নয়ই, হয়তো খানিকটা ভুল-কেটে-যাওয়ার অনুভূতি; কিন্তু আর যাই হোক, সেটা কেমন এক মানসিক স্বচ্ছতা যা শতবর্ষ বয়স্কের অনধিক কারও মধ্যে দেখতে পাব বলে আশা করিনি। একটিমাত্র কথা দিয়ে বলতে গেলে, তোমার সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—নির্লিপ্ততা।

কনওয়ে উত্তর দিল, কথাটি যে খুব ভাল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের আপনারা কোন শ্রেণীবিভাগ করেন কিনা আমি জানি না, যদি করেন তাহলে আমার মার্কা দিতে পারেন '১৯১৪—১৯১৮'। তাতে আপনাদের যাদুঘরের আমি হব একটি অদ্বিতীয় নমুনা,—আর তিনজন যাঁরা আমার সংগে এসেছেন তাঁরা এ দলে পড়েন না। ১৯১৪ থেকে '১৮ সালের মধ্যে আমার যা কিছু শক্তি যা কিছু আবেগ তা প্রায় সবই নিঃশেষিত হয়েছে। এবং যদিও আমি এ-প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করি না, কিন্তু তারপর থেকে পৃথিবীর কাছে আমার একটিমাত্র আবেদন, আমায় একা থাকতে দাও। এই জায়গাটির শ্রী ও শান্ততা আমার মনকে আকর্ষণ করেছে, এবং আপনি যা বলেছেন, আমি এখানকার সব কিছুর সঙ্গে নিশ্চয়ই অভ্যস্ত হয়ে উঠব।

পুত্র, তোমার আর কিছু বলার নেই?

আশা করি আপনাদেরই পরিমিতি সূত্র অনুসারে আমি ঠিকমতো চলেছি।

চ্যাং ঠিক বলেছিল, তুমি খুবই বুদ্ধিমান কনওয়ে। কিন্তু আমি তোমার ভবিষ্যৎজীবনের যে চিত্র দিলাম তা কি তোমায় কোন মহত্তর অনুভূতির দিকে প্রলুব্ধ করে না?

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর কনওয়ে বলল, আপনার অতীত দিনের কাহিনী আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ভবিষ্যতের যে-ছবি চিত্রিত করলেন তা শুধু ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বিচারে আমার ভাল লেগেছে বলতে পারি। অতদূর দেখার সামর্থ্য আমার নেই। কাল কি পরের সপ্তাহে, এমন কি আগামী বৎসরেও শ্যাংরি-লা ছেড়ে যেতে আমি খুবই দুঃখ পাব। কিন্তু শতবর্ষ পরমায়ু পেলে শ্যাংরি-লা সম্বন্ধে আমার মনোভাব কেমন দাঁড়াবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। অনাগত ভবিষ্যতের সব কিছুরই মতো আমি তারও মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব; কিন্তু আমাকে উন্মুখ করে তুলতে হলে একটা অর্থ থাকা চাইই। জীবনেরই কোন অর্থ আছে কিনা সে বিষয়ে

আমার তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়; যদি না থাকে তাহলে দীর্ঘজীবন তো আরও বেশি অর্থহীন।

বন্ধু, এই প্রাচীন গৃহের বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ঐতিহ্য নবোৎসাহই তো আনে।

হয়তো তাই। কিন্তু শতায়ুদের ঈর্ষা করার মতো আরও কিছু সুস্পষ্ট কারণ আমি চাই।

কারণ একটি আছে—এবং খুবই স্পষ্ট কারণ। প্রাপ্যের অতিরিক্ত আয়ুষ্কালের অধিকারী দৈবপ্রেরিত বিদেশীদের এই উপনিবেশটির কাছে মূল কারণ হচ্ছে সেটি। আমরা অলস গবেষণা বা খেয়াল নিয়ে চলি না। আমাদের একটা স্বপ্ন আছে, আছে আদর্শ। ১৭৮৯ সালে বৃদ্ধ পেরল্ট যখন এই কক্ষে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তখন এই স্বপ্নটি তাঁর সামনে প্রথম ভেসে ওঠে। তখন তিনি ফিরে তাকালেন তাঁর দীর্ঘ অতীতের দিকে, সেকথা তোমাকে আমি বলেছি; এবং তখন তাঁর মনে হলো, পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর, এবং যুদ্ধ-লালসা ও পাশবিকতা হয়তো তাদের একদিন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। নিজের চোখে দেখা দৃশ্যগুলি তাঁর মনে পড়ল, এবং মানসপটে অন্যগুলি এঁকে নিলেন; তিনি দেখলেন পৃথিবীর জাতিগুলি দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, প্রজ্ঞায় নয়—নীচ মনোবৃত্তিতে ও ধ্বংস-লিপ্সায়। দেখলেন, তাদের যন্ত্র-শক্তি বহুগুণ বর্ধিত হচ্ছে,—হয়তো কিছুদিনের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটিমাত্র মানুষ গ্রাণ্ড মনার্কের বিরাট বাহিনীকে একা প্রতিহত করতে পারবে। তিনি আরও বুঝতে পারলেন, যখন জলে স্থলে ধ্বংসের প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখা দেবে তখন তারা আকাশকেও রেহাই দেবে না।—তুমি কি বলবে তার স্বপ্ন অসত্য?

না, সম্পূর্ণ সত্য।

কিন্তু ওইখানেই শেষ নয়। তিনি দেখতে পেলেন, এমন দিন আসবে যখন মানুষ হত্যালীলার উদ্ভাবনী শক্তিতে উল্লসিত হয়ে সারা পৃথিবীর ওপর এমনই উন্মত্তবেগে ছুটে বেড়াবে, যে প্রতিটি মহার্ঘ্য বস্তু বিপন্ন হয়ে পড়বে;

প্রত্যেকটি গ্রন্থ ও চিত্র, দু হাজার বছরের প্রত্যেকটি সঞ্চিত সম্পদ—ক্ষুদ্র, স্পর্শকাতর, অসহায় সব কিছু বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আপনার সংগে আমি একমত।

কিন্তু লোহা আর ইস্পাতের বিরুদ্ধে বিবেচক মানুষদের কী অভিমত? বিশ্বাস কর, বৃদ্ধ পেরল্টের সেই স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবেই। পুত্র, সেই কারণেই আমি এখানে, তুমিও এখানে, এবং সেই কারণেই আমাদের চারিদিকে যে প্রলয়কর ধ্বংস পুঞ্জীভূত হচ্ছে তা কাটিয়ে ওঠার জন্যে আমরা প্রার্থনা করব।

কাটিয়ে ওঠার জন্যে?

হ্যাঁ, তার সম্ভাবনা আছে। তুমি আমার মতন বৃদ্ধ হবার আগেই এসব ঘটবে।

এবং আপনার ধারণা যে, শ্যাংরি-লা সে-বিপদ কাটিয়ে, উঠতে পারবে?

হয়তো পারবে। করুণার আশা আমরা করি-না, কিন্তু উপেক্ষার ক্ষীণ আশা রাখি। আমরা এখানে আমাদের গ্রন্থ, আমাদের সংগীত ও সাধনা নিয়ে থাকব, এক মুমূর্ষু যুগের ভঙ্গুর সুষমাগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করব এবং এমন জ্ঞানের সাধনায় প্রবৃত্ত থাকব যা মানুষের প্রয়োজন হবে তার দুর্বার আবেগ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হবার পর। এ-দায় আমরা সযত্নে রক্ষা করব, দিয়ে যাব উত্তরপুরুষকে। সেই দিনটি না আসা পর্যন্ত আমরা যতটুকু আনন্দ পাই নেব।

তারপর?

তারপর, পুত্র, যখন প্রবলেরা পরস্পরকে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তখন হয়তো খ্রীষ্টিয় নীতি কথা সত্যে পরিণত হবে এবং বিনম্র মানুষেরা হবে পৃথিবীর অধিকারী।

মৃদু কণ্ঠস্বরে যেন গুরুত্বের আভাস। কনওয়ে সেই সৌন্দর্য-সুষমার কাছে মাথা নত করল। আবার সে অনুভব করে, চারিদিকে অন্ধকার জমাট বেঁধেছে, সেটা যেন বহির্জগতের আসন্ন প্রলয়ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস। তারপর সে শ্যাংরি-লার প্রধান লামাকে সত্যসত্যই নড়তে দেখল। চেয়ার থেকে উঠে তিনি

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন—যেন অর্ধদেহী একটি প্রেতমূর্তি। ভব্যতার তাগিদে কনওয়ে তাঁকে সাহায্য করতে এগুল, কিন্তু হঠাৎ এমনই গভীর ভাবাবেগে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল যে, সে জীবনে যা কোনদিন কোন মানুষের কাছে করেনি তাই করল, কিন্তু কেন করল তা সে নিজেই জানে না, তাঁর সামনে সে নতজানু হয়ে বসল, বলল, পিতা আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি।

তারপর কখন যে সেখান থেকে সে বিদায় নিয়ে আসে তা তার ঠিক মনে পড়ে না ; যেন সে একটি স্বপ্ন দেখছিল এবং বহুক্ষণ পরে স্বপ্নের ঘোর কাটে। শুধু তার এইটুকু স্মরণ হয় যে, উপরকার ঘরের উষ্ণতা থেকে বাইরে আসতেই বাতাস বরফশীতল মনে হয়েছিল আর সে জানতে পেরেছিল নির্বাক স্থৈর্যের প্রতিমূর্তি চ্যাঙের উপস্থিতি। তারা দুজনে একসংগে অংগন পার হলো। শ্যাংরি-লার সব সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়ে এমন করে কখনও তার চোখে ধরা দেয়নি। পর্বতশৃঙ্গের কিনারায় উপত্যকাটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল, যেন একটি নিস্তরঙ্গ দীর্ঘিকা ; সেটি তার প্রশান্ত চিন্তাধারারই প্রতিচ্ছবি। কেননা কনওয়ে তখন সব বিস্ময় উত্তরণ হয়ে এসেছে। বৈচিত্র্যপূর্ণ, সুদীর্ঘ আলোচনা তার মন খালি করে দিয়েছিল—শুধু ছিল পরিতৃপ্তি, সে তৃপ্তি তার মনের, তার প্রক্ষোভের ও তার আত্মার। এমন-কি তার সংশয়গুলিও এখন আর ক্লান্তিকর মনে হয় না, সেগুলিও যেন এক সূক্ষ্ম সমগ্রতার অঙ্গীভূত। চ্যাং বা সে কোন কথাই বলল না। তখন অনেক রাত হয়ে গেছে, আর সকলে শুয়ে পড়েছে দেখে সে একটু খুশি হলো।

নয়

সকালে গতরাত্রির কথা যতটুকু তার মনে পড়ল ততটুকুই ভেবে সে অবাক হয়ে গেল, মনে হলো সেটা তার জাগরণে কিংবা নিদ্রায় দেখা কোন স্বপ্নের অংশ কিনা।

একটু পরেই তার সব কথা মনে পড়ে গেল ; ব্রেকফাস্টে উপস্থিত হতেই সকলে যুগপৎ প্রশ্নবানের দ্বারা তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

বারণার্ড বলল, কাল রাত্তিরে কর্তার সংগে নিশ্চয় তোমার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করব ভেবেছিলাম কিন্তু এমন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। মানুষটি কেমন ?

ম্যালিনসন সাগ্রহে প্রশ্ন করল, কুলিদের সম্বন্ধে কোন কথাবার্তা হলো নাকি ?

মিস ব্রিনক্লো বলল, এখানে একজন মিশনারি রাখার কথা আপনি তাঁকে বলেছেন আশা করি।

তাদের আক্রমণে কনওয়ে তার চিরাচরিত আত্মরক্ষার পথ গ্রহণ করল। সে অত্যন্ত সহজভাবে তার নিজস্ব ধরণে উত্তর দিল, আমার মনে হয় আমি তোমাদের সকলকেই হতাশ করছি। মিশনের প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সংগে আমি কোন আলোচনা করিনি ; কুলিদের কথা তিনি একটি বারও আমাকে বলেননি ; আর মানুষটির সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলব যে, তিনি অতি বৃদ্ধ, চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন এবং খুব বুদ্ধিমান।

ম্যালিনসন বিরক্তির সংগে বাধা দিয়ে বলল, তাঁকে বিশ্বাস করা চলে কিনা সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। তিনি আমাদের ডোবাতে চান বলে তোমার মনে হলো কি ?

তাঁকে অসম্মানীয় ব্যক্তি বলে মনে হয়নি।

তাহলে কেন তুমি তাঁকে কুলিদের কথা বললে না ?

আমার মনে পড়েনি।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ম্যালিনসন বলল, আমি তোমায় ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কনওয়ে। বাসকুলের ব্যাপারে দেখেছি তুমি আশ্চর্য কাজের লোক ; তুমি সেই লোক কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে, মনে হচ্ছে, তোমার আর কিছু নেই।

আমি দুঃখিত ম্যালিনসন।

দুঃখিত হয়ে কি লাভ ? তোমার আবার উঠেপড়া লাগা উচিত এবং যা ঘটছে সে-বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত।

তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। তোমাকে হতাশ করার জন্যে আমি দুঃখিত—এইটুকুই বলতে চেয়েছিলাম।

কনওয়ে নীরস কণ্ঠে কথা বলে ; তার মনোভাব গোপন করার জন্যে সে ইচ্ছে করেই মুখোস টেনে দেয়। তার মনে নানান কথা এমনই জট পাকাতে থাকে যে কারও পক্ষে তা অনুমান করা শক্ত। এত সহজে কী করে সে সত্য গোপন করল তা ভেবে সে একটু বিস্মিত হয় ; অবশ্য এ-কথা সত্য যে, প্রধান লামার ইচ্ছা মতো সে গোপন তথ্যটি প্রকাশ না করার সংকল্প করেছিল। সে অবাক হয় এই ভেবে যে কত সহজে সে এমনই একটা অবস্থা স্বীকার করে নিল যার জন্যে তার সংগীরা তাকে বিশ্বাসঘাতক বলবে,—আর তা বললে কিছু অন্যায়ও হবে না। যেমন ম্যালিনসন বলল, তার মতো লোকের কাছ থেকে এ-রকম আচরণ সে মোটেই আশা করেনি। হঠাৎ তার জন্যে কনওয়ের মন স্নেহ ও মমতায় আর্দ্র হয়ে ওঠে,—তখনই সে নিজেকে এই ভেবে শক্ত করল যে, যারা 'বীরপূজা' করে তাদের ভুলভাঙার জন্যেও প্রস্তুত থাকা উচিত। বাসকুলে ম্যালিনসন যেন নিতান্তই নবাগত ছাত্রের মতো খেলাধুলার প্রিয়দর্শন অধিনায়ককে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিত, এখন সেই অধিনেতার আসন টলমল, হয়তো বা

স্বর্গ হতে বিদায়। যত মিথ্যাই হোক, আদর্শের অপমৃত্যু কিছুটা মর্মস্পর্শী; এবং যা নয় তার ভান করার যে আয়াস তার কিছুটা সান্ত্বনা মিলত ম্যালিনসনের ভক্তিশ্রদ্ধায়। কিন্তু ভান করাও তো অসম্ভব। শ্যাংরি-লার আকাশে বাতাসে এমন একটা কিছু আছে—হয়তো তার উচ্চতার জন্যে—যা কপট ভাবাবেগের পরিপন্থী।

বলল সে, শোন ম্যালিনসন, বার বার বাসকুলের কথা টেনে এনে কোন লাভ আছে কি? স্বীকার করছি যে, তখন আমি ভিন্ন ব্যক্তি ছিলাম, কিন্তু অবস্থাটাও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এবং আমার মতে, আরও সুখপ্রদ। এটুকু অন্তত আমরা জানতাম আমাদের প্রতিপক্ষ কে।

স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে, হত্যা আর নারীধর্ষণ,— সেগুলিকে সুখপ্রদ বলতে চাও বল।

ম্যালিনসন কণ্ঠস্বর চড়া পর্দায় তুলে উত্তর করল, আমি সুখপ্রদ বলেছি অন্য অর্থে। এইরকম দুর্বোধ্য অবস্থার চাইতে যে কোন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ান আমি বাঞ্ছনীয় ভাবি। হঠাৎ সে বলল, ওই চৈনিক মেয়েটির কথাই ধর না— কী করে সে এখানে এল? মহাপুরুষটি কি তোমায় এ-বিষয়ে কিছু বলেছেন?

না। কেনই বা বলবেন?

কেন বলবে না? এ ব্যাপারে যদি তোমার এতটুকু আগ্রহ থাকত তাহলে তুমিই বা জিজ্ঞাসা করবে না কেন? এক পাল সন্ন্যাসীর সংগে একজন যুবতী মেয়ের বাস করাটা কি খুব স্বাভাবিক?

কথাটা এদিক দিয়ে কনওয়ে আগে ভেবে দেখেনি। একটু ভেবে সে উত্তর দিল, কিন্তু এটিও তো সাধারণ মঠ নয়।

ও, তাই বটে!

নিস্তব্ধতা নেমে এল, কেননা তর্কে যতি পড়ে গেল। লো-সেনের জীবনেতিহাস কনওয়ের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। তন্বী মাঞ্চু তার

মনের অতলে এত নিঃশব্দে ঠাঁই করে নিয়েছিল যে তার খেয়ালই হয়নি সেখানটিতে সে আছে। ব্রেকফাস্টের টেবিলে মিস্ ব্রিনক্লোর তিব্বতী ব্যাকরণ শিক্ষা সমান উদ্যমে চলছিল ; মাঞ্চু মেয়েটির নামোল্লেখে সে ব্যাকরণ থেকে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল।

তরুণী ও সন্ন্যাসীর কথায় মিস ব্রিনক্লোর মনে পড়ল পুরুষ মিশনারিদের স্ত্রীদের কাছ থেকে শোনা ভারতীয় মন্দিরের গল্পগুলি। কঠিনকণ্ঠে বলল সে, এখানকার নৈতিক চরিত্র কদর্য হওয়াই তো স্বাভাবিক,—এ-কথা আমরা গোড়া থেকেই ধরে নিতে পারতুম। কথাশেষে সমর্থনের আশায় সে বারণার্ডের দিকে তাকাল।

বারণার্ড শুষ্ক একটু হেসে নীরসকণ্ঠে বলল, নৈতিকতা সম্বন্ধে আমার মতামতের কোন মূল্য তোমাদের কাছে নেই। কিন্তু আমি বলি কি, ঝগড়া-ঝাঁটি করাটাও সমান খারাপ। আমাদের যখন আরও কিছুদিন থাকতেই হবে তখন মিছিমিছি মেজাজ খারাপ না করে একটু আরামেই কাটান যাক-না।

তার কথাগুলো কনওয়ের খুব ভাল লাগল। কিন্তু ম্যালিনসনের রাগ পড়ল না। সে অর্থপূর্ণ ভাষায় বলল, হ্যাঁ ডার্টমুরের চাইতে এখানে তুমি আরামে আছ বই-কি।

ডার্টমুর ? ওহো বুঝেছি—তোমাদের সব চাইতে বড় গারদখানাটার কথা বলছ ? হাঁ। তা অবশ্য সেখানকার কাউকে আমি ঈর্ষ্যা করিনি। আরেকটা কথা, তুমি খোঁচা দিলে কি হবে, আমায় বিঁধবে না। মোটা চামড়া আর নরম হৃদয়—আমি হচ্ছি এই দুয়ের মেশাল।

কনওয়ে তার দিকে চাইল প্রশংসার দৃষ্টিতে, আর ম্যালিনসনের দিকে তাকাল চোখে তিরস্কারের আভাস নিয়ে। কিন্তু তখনই হঠাৎ তার মনে হলো, একটি বিরাট রঙ্গমঞ্চে তারা সকলেই যেন অভিনয় করছে,—রঙ্গমঞ্চটির পশ্চাৎপট একমাত্র সেই জানে। শুধু সেই জানে এবং অন্য কাকেও জানান সম্ভব নয়—এই কথাটি ভাবতেই সে হঠাৎ নির্জনতার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল।

সঙ্গীদের বিদায় জানিয়ে সে মুক্ত প্রাঙ্গণে চলে গেল। কারাকালকে দু চোখ ভরে দেখতেই তার সব সংশয় কেটে গেল ; এবং তার সঙ্গীদের ধারণার বহু দূরের এক নূতন পৃথিবী সে গ্রহণ করেছে—এই বোধটুকুর মধ্যে তাদের সম্বন্ধে তার সমস্ত অস্বস্তি নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। তবু তার প্রয়োজন মানসিক স্থৈর্যের, কেন না যে দ্বৈতজীবন সে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে তার সঙ্গে নিজেকে ঠিকমতো খাপ খাইয়ে নিতে গেলে চাই প্রশান্তচিত্ততা।

চ্যাং আজকাল তার সংগে বেশ খোলাখুলি আলাপ করে এবং মঠের আইন-কানুন রীতিনীতি নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়। তার কাছে কনওয়ে জানতে পারল, শ্যাংরি-লাতে প্রথম পাঁচটি বছর তাকে স্বাভাবিক জীবন কাটাতে হবে, কোন রকম বিশেষ ব্যবস্থা মেনে চলার দরকার হবে না।

তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে চ্যাং বলল, কারণ কিছুই নয়, শুধু দেহকে এখানকার উচ্চতার সংগে খাপ খাওয়ান আর মন ও হৃদয়ের ব্যথা-বেদনার অপনয়ন।

মৃদু হাসির সংগে কনওয়ে বলল, তাহলে আমি কি এই অনুমান করব যে পাঁচ বছরের ব্যবধানে মানবিক বৃত্তিগুলি আর বেঁচে থাকতে পারে না বলেই আপনাদের নিশ্চিত ধারণা ?

নিশ্চয় পারে।—চ্যাং উত্তর দিল, কিন্তু বিষাদমগ্ন মৃদু সৌরভের মতো —সেটা ভালও লাগতে পারে।

চ্যাং আরও বলল যে, পাঁচ বছরের শিক্ষানবিসি শেষ হলে, বয়সকে বিলম্বিত করার প্রক্রিয়া শুরু হবে, এবং যদি তা সফল হয় তাহলে প্রায় আরও পঞ্চাশ বছর ধরে কনওয়েকে মনে হবে চল্লিশ—অতকাল একভাবে থাকার পক্ষে চল্লিশ বয়সটা খারাপ নয় নিশ্চয়ই।

আপনার ক্ষেত্রে কী হয়েছিল?—কনওয়ে প্রশ্ন করল, কাজ করেছিল কেমন?

দেখুন, আমি খুব ভাগ্যবান, কেননা, আমি যখন এখানে আসি তখন বাইশ বছরের যুবক মাত্র। আপনি হয়তো ভাবতেই পারেননি যে, আমি একজন সৈনিক ছিলাম; ১৮৫৫ সালে আমার নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল উপজাতি দস্যুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে পাহাড়-পর্বতে পথ হারায়। নিদারুণ কষ্টে আমার একশো জনেরও বেশি সঙ্গীদের মধ্যে বাঁচল মাত্র সাতজন। শেষে আমাকে যখন উদ্ধার করে শ্যাংরি-লাতে নিয়ে আসা হলো তখন আমি ভয়ানক অসুস্থ—নিতান্ত তরুণ বয়স ও যুবশক্তি আমাকে সে যাত্রা মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করে।

বাইশ বছর!—কনওয়ে মনে মনে হিসাব করে বলল, তাহলে এখন আপনার বয়স সাতানব্বুই?

হ্যাঁ, লামাদের সম্মতি পেলে শিগগিরই আমার পূর্ণ দীক্ষা হবে।

বুঝেছি, একশো বছর অবধি আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

না, তা নয়, কোন নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার বাধা নেই। তবে সাধারণত শতবর্ষের পর সাধারণ জীবনের ভাবান্তর বা চিত্তবিক্ষেপ আর থাকে না বলেই আমরা মনে করি।

আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু তারপর কী হয়? কতকাল আপনি চালিয়ে যেতে পারবেন বলে মনে করেন?

শ্যাংরি-লায় যতটা সম্ভব ততটা প্রত্যাশা নিয়ে আমি লামাত্বে প্রবেশ করব এ-আশা আমি করতে পারি। বয়সের দিকে থেকে হয়তো আরও একশো বছর বা তারও বেশি।

মাথা নেড়ে কনওয়ে বলল, আপনাকে অভিনন্দিত করা উচিত কি না আমি জানিনা। উভয় জগতেরই শ্রেষ্ঠ দিনগুলির অধিকারী আপনি—আপনার

পিছনে দীর্ঘ ও আনন্দময় যৌবন, এবং আপনার সমুখে অনুরূপ দীর্ঘ ও আনন্দময় বার্ধক্য। আপনার শরীরে বার্ধক্যের চিহ্ন কবে থেকে দেখা দেয়?

সত্তরের পর থেকে। তাই সাধারণত হয়ে থাকে; তাহলেও বয়সের তুলনায় আমাকে অনেক কম দেখায় নিশ্চয়।

অবশ্যই। আচ্ছা ধরুন, আপনি যদি এখন উপত্যকা ছেড়ে বাইরে যান তাহলে কী হবে?

সামান্য কয়েকদিনের বেশি থাকলেই মৃত্যু।

তাহলে আবহাওয়াটাই হচ্ছে আসল?

নীল চাঁদের উপত্যকা একটিই, যারা আরেকটির আশা করে তারা প্রকৃতির কাছে প্রাপ্যের অতিরিক্ত চায়।

আচ্ছা যদি তিরিশ বছর আগে আপনার সম্প্রসারিত যৌবনকালের মধ্যে উপত্যকা ত্যাগ করে যেতেন তাহলে কী হতো?

চ্যাং জবাব দিল, তখনও হয়তো আমার মৃত্যুই হতো। তবে আর যাই হোক, উপত্যকার বাইরে গেলেই প্রায় সংগে সংগে আমার সারা শরীরে প্রকট হয়ে উঠবে আমার প্রকৃত বয়স। কয়েক বছর আগে এইরকম একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, অবশ্য আগে আরও কয়েকটি অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। একদল পর্যটক আসার কথা শুনে তাদের সন্ধানে আমাদের একজন উপত্যকা ছেড়ে যায়। সে একজন রুশ, এখানে যখন আসে তখন তার প্রথম যৌবন। আমাদের পদ্ধতি তার ওপর এমন চমৎকার কাজ করেছিল যে, আশী বছর বয়সেও তাকে চল্লিশের বেশি মনে হতো না। এক সপ্তাহের বেশি উপত্যকা থেকে তার অনুপস্থিত থাকার কথা নয়—তাতে কোন ক্ষতি হতো না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত একদল যাযাবর তাকে বন্দী করে আরও অনেকটা দূরে নিয়ে যায়। আমরা ধরে নিলাম, নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং তার আশা আমরা ছেড়ে দিলাম। মাস তিনেক পরে তাদের কবল হতে কোনরকমে পালিয়ে আবার সে এখানে ফিরে আসে। কিন্তু তখন সে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। তার মুখে

ও আচরণে বয়সের প্রতিটি বছর ফুটে উঠেছে, এবং তার কিছুদিন পরে সাধারণ একজন বৃদ্ধের মতো তার মৃত্যু হয়।

কিছুক্ষণ কনওয়ে কোন কথা বলল না। গ্রন্থাগারে বসে তারা আলাপ করছিল। গল্পটি শুনতে শুনতে সে একটি জানলা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর সংগে একমাত্র যোগসূত্র দূরে গিরিসঙ্কটটির দিকে তাকিয়েছিল—তার ওপর দিয়ে ছোট একটি মেঘ ভেসে গেল। অবশেষে বলল সে, গল্পটিকে ভয়ঙ্কর বলা চলে, চ্যাং। এতে মনে হয়, যে-সব শিথিলগতি লোক কোনরকমে ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে রয়েছে, সময় তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ব্যর্থকাম দৈত্যের মতো উপত্যকার বাইরে ওত পেতে রয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে চ্যাং বলল, ইংরেজরা যে শিথিলতাকে দোষ আখ্যা দেয় তা খুবই অর্থপূর্ণ। কিন্তু আমাদের কাছে উত্তেজনার চাইতে শিথিলতা বেশি কাম্য। পৃথিবীর বুকে আজ কী উত্তেজনার আধিক্য দেখিনে ? শিথিল লোকের সংখ্যা যদি বেশি হতো তাহলে কি সেটা মংগলকর হতো না ?

ভাবগম্ভীর আনন্দের সংগে কনওয়ে উত্তর দিল, আমি তো আপনার সংগে একমত হতে চাই।

প্রধান লামার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে কনওয়ে তার ভবিষ্যত জীবনের আরও কয়েকজন সহকর্মীর সংগে পরিচিত হলো। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে চ্যাং উৎসাহীও নয়, অনিচ্ছুকও নয়। কনওয়ে যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পেল,—তার সেটা ভালই লাগে ; সেখানে জরুরী কাজ নিয়ে কেউ হৈ চৈ করে না, কাজ ফেলে রাখলেও কেউ হতাশ হয়ে পড়ে না।

চ্যাং তাকে বলল, লামাদের ভেতর কেউ কেউ কিছুকালের জন্যে—হয়তো কয়েক বছর—তার সংগে দেখা নাও করতে পারেন ; কিন্তু আপনি যেন তাতে বিস্মিত হবেন না। পরিচয়ের সময় দেখবেন তাঁরা আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে উৎসুক ; তাড়াহুড়ো নেই বলে ভাববেন না যে তাঁরা অনিচ্ছুক।

কনওয়ে তার তিনগুণ বয়সী মানুষদের সংগে সাক্ষাৎকার এবং আলোচনায় সামাজিক ভব্যতা নিয়ে এতটুকু অস্বস্তি বোধ করে না, লণ্ডন বা দিল্লী হলে এই ধরণের সাক্ষাৎকারে তাকে হয়তো মুশকিলে পড়তে হতো। প্রথম পরিচয় হলো মেইসটার নামে একজন অমায়িক জার্মানের সংগে। তিনি একটি অভিযাত্রী দলের সঙ্গে আসেন এবং তিনি ছাড়া অভিযাত্রীদের সকলেই মারা যান। তিনি লামাস্বে প্রবেশ করেন গত শতাব্দীর নবম শতকে। তিনি ইংরেজি বলেন চমৎকার, তবে একটু টান রয়েছে। দু'একদিন পরে আরেকজনের সঙ্গে তার পরিচয় হলো, তাঁর সংগে আলাপ করে কনওয়ে খুব খুশি। প্রধান লামা এঁর কথা বিশেষ করে বলেছিলেন,—নাম আলফাঁসে ব্রিয়্যাক, জাতিতে ফরাসী, ছোটখাটো মানুষটি কিন্তু বেশ মজবুত। তিনি নিজেকে সোপ্যার ছাত্র বলে পরিচয় দিলেন,—যদিও তাঁকে ততো বৃদ্ধ দেখায় না। কনওয়ের মনে হলো ব্রিয়্যাক এবং সেই জার্মানটি সঙ্গী হিসেবে ভালই। মনের অবচেতনে সে ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছিল এবং আরও কয়েকটি সাক্ষাৎকারের পর সে দু-একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছল : সে লক্ষ্য করেছিল, যেসব লামাদের সংগে তার পরিচয় হলো তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকলেও তাঁরা সকলে একটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী—বয়োবৃদ্ধিহীনতা বললে যেন তার ঠিক নামকরণ করা হয় না, কিন্তু আর কোন শব্দও সে খুঁজে পায় না। তাছাড়া, তাঁদের প্রত্যেকেরই মধ্যে রয়েছে শান্ত ধীশক্তি—তাঁদের স্বল্প ও সুসংযত কথাবার্তায় তার আনন্দময় প্রকাশ। কনওয়ে বুঝতে পারে যে, তাঁরাও তার কাছ থেকে অনুরূপ আচরণ পেয়েছেন, এবং পেয়ে খুশী হয়েছেন। কৃষ্টি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষদের মতো তাঁদেরও সংগে মেশা বেশ সহজ বলে তার মনে হলো; অবশ্য যখন তাঁরা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ও দূর অতীতের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি বলেন তখন যেন কেমন অদ্ভুত মনে হয়। যেমন, একজন পক্ককেশ সদাশয় বৃদ্ধ তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন ব্রনতের লেখা সে পড়েছে

কিনা। কনওয়ে উত্তর দিল, সে কিছু কিছু পড়েছে। তখন তিনি বললেন, গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকে আমি যখন ওয়েস্ট রাইডিং-এর আচার্য ছিলাম তখন একদিন হওর্থে বেড়াতে গি[illegible] সেখানকার যাজকের গৃহে উঠেছিলাম। এখানে আসার পর আমি ব্রন্‌তে সমস্যার সব কিছু অনুশীলন করেছি—ওই বিষয়ের ওপর আমি একটি বইও লিখছি। ইচ্ছে হলে একদিন সময় করে সেটা পড়ে দেখবেন।

কনওয়ে সবিনয়ে তাঁর কথায় সম্মতি জানাল। পরে, যখন চ্যাং আর সে ছাড়া আর কেউ ছিল না, সে বলল, লামারা তাঁদের প্রাক্‌-তিব্বতী জীবনের প্রত্যেকটি কথা কত স্পষ্ট মনে রেখেছেন।

চ্যাং উত্তরে বলল, এটি শ্যাংরি-লার শিক্ষার একটি অংগ। মনের স্বচ্ছতা আনার একটি প্রধান ধাপ হচ্ছে নিজের অতীতকে তার সব কিছু বৈচিত্র্য নিয়ে স্মরণ পথে পাওয়া। আমাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল থাকবার পর আপনি দেখবেন, আপনার অতীত জীবন ক্রমশ যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে আসছে—দূরবীক্ষণের অতসী কাঁচ ঠিক মতো সন্নিবিষ্ট হলে বহুদূরের দ্রষ্টব্য যেমন কেন্দ্রীভূত হয় তেমনই। তখন সব কিছুই দেখবেন স্থির, সুস্পষ্ট, যথানুপাতিক এবং নির্ভুল অর্থবহ। যেমন, আপনার নব-পরিচিত লামাটি বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর অতীত জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তটি এসেছিল তাঁর যৌবনে—যৌবনের সেই দিনটিতে যেদিন তিনি হওর্থের এক গৃহে গিয়ে উপস্থিত হন যেখানে থাকতেন এক বৃদ্ধ যাজক ও তাঁর তিনটি মেয়ে।

তাহলে এখন থেকেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি স্মরণে আনার চেষ্টা শুরু করে দেওয়া দরকার।

চেষ্টা করার কোন প্রয়োজন হবে না, আপনা হতেই তারা আসবে।

বিমর্ষ কণ্ঠে কনওয়ে বলল, জানি না তাদের আমি কী রকম অভ্যর্থনা জানাব।

কিন্তু অতীত যাই দিক না কেন, বর্তমানে সে আনন্দের সন্ধান পেয়েছে।

যখন সে গ্রন্থাগারে পড়াশুনো করে বা সঙ্গীতাগারে মোজার্ট বাজায়, তখন প্রায়ই তার মনে একটা গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হয়; মনে হয় যেন শ্যাংরি-লা সত্যসত্যই এক জীবন্ত সত্তা, যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত মায়া থেকে তার উৎপত্তি, কাল ও মৃত্যুর কবল থেকে কোন অলৌকিক শক্তিদ্বারা সংরক্ষিত। এই সব মুহূর্তগুলিতে প্রধান লামার সংগে তার আলোচনার কথা বারে বারে মনে পড়ে; সে অনুভব করে, তার সব কিছুর ওপরে কেমন একটা শান্ত প্রজ্ঞা নেমে আসছে, হাজার হাজার অনুচ্চ কণ্ঠ তাকে নিয়ত শোনাচ্ছে আশার বাণী। লো-সেন যখন কোন জটিল সুর বাজায়, তখন এমনই মন নিয়ে সে তা শোনে এবং মৃদু নৈর্ব্যক্তিক হাসিতে যখন তার ওষ্ঠদুটি ফুটন্ত ফুলের মতো দেখায়, তখন সে অবাক হয়ে ভাবে, কী রহস্য আছে ওই হাসিটুকুর পিছনে। তার ভাষায় কনওয়েব দখল রয়েছে তা জানা সত্ত্বেও মেয়েটি এখনও খুব কম কথাই বলে; ম্যালিনসন প্রায়ই সঙ্গীতাগারে আসে, তার মতে মেয়েটি একরকম বোবা; কিন্তু কনওয়ে দেখতে পায়, তার মৌনতা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলে অপূর্ব সৌন্দর্য-সুষমা।

একদিন সে চ্যাঙের কাছে তার জীবনকথা জানতে চাইল।

চ্যাং বলল, লো-সেন মাঞ্চু রাজবংশ জাত। সে তুর্কিস্থানের এক রাজকুমারের বাগদত্তা হয় এবং ভাবী স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে কাশগড় যাচ্ছিল। কিন্তু তার বাহকেরা পাহাড়-পর্বতে পথ হারিয়ে ফেলে। আমাদের লোকের সংগে তাদের যথারীতি দেখা না হলে দলের সকলেরই নিশ্চিত মৃত্যু হতো।

এ ঘটনা কবে ঘটেছিল?

১৮৮৪ সালে। তখন লো-সেনের বয়স আঠারো।

তখন আঠারো?

চ্যাং ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। তার ওপর আমাদের পরীক্ষা খুবই সফল

হয়েছে, আপনি তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। সে সমানে উন্নতি করেছে।

প্রথম এসে সে শ্যাংরি-লাকে কী ভাবে নিয়েছিল?

আর পাঁচজনের তুলনায় সে একটু বেশি অনিচ্ছুক ছিল যেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ সে করেনি, তবে আমরা বুঝি কিছুদিন সে কষ্টই পেয়েছিল। এক-জন তরুণী বিবাহ করতে যাচ্ছে আর আমরা বাদ সাধলুম—এটা খুবই একটা বিরল ঘটনা। তাই সে যাতে এখানে সুখী হতে পারে সেদিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি ছিল।—স্নিগ্ধ একটু হেসে চ্যাং বলল, প্রথম পাঁচ বছরই যথেষ্ট, কিন্তু আমার তো মনে হয় ভালবাসার উদ্দীপনা কামনার কাছে সহজে নতি স্বীকার করে না।

হয়তো সে তার ভাবী স্বামীকে খুবই ভালবাসত?

তা হতে পারে না, কেন না সে তাকে কখনও চোখেই দেখেনি। কি জানেন, ওটা সেই চিরাচরিত রীতি। তার ভালবাসা নৈর্ব্যক্তিক।

কনওয়ে মাথা নেড়ে তার কথায় সমর্থন জানাল। লো-সেনের কথা ভাবতে গিয়ে যেন সে একটু বেদনা বোধ করল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল পঞ্চাশ বছর আগেকার একটি চিত্র: একটি সুসজ্জিত ডুলিতে দেবীপ্রতিমার মতো বসে লো-সেন, ডুলিটি বাহকেরা বয়ে নিয়ে চলেছে মালভূমির ওপর দিয়ে। প্রাচ্যের পুষ্পোদ্যান ও পদ্মদীঘির শ্যামলিমার পর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দিগরেখা বড় রূক্ষ মনে হয়, তবু তারই মধ্যে দুটি চোখ মেলে কি যেন সে খুঁজে পেতে চায়। সেই সৌন্দর্য-সুষমা বছরের পর বছর ধরে বাঁধা পড়ে আছে ভেবে কনওয়ে বলল, বেচারা! তার অতীত কাহিনী জানার পর তার নীরব নিস্তব্ধ রূপটি কনওয়েের আরও ভাল লাগে। সে যেন একটি লাবণ্যমণ্ডিত শীতল শুভ্র পুষ্পাধার, যার একটিমাত্র পলাতক আলোক-রেখা ছাড়া কোন আভরণই নেই।

ব্রিয়াক যখন তাকে সোঁপ্যার কথা বলে বা অপূর্ব নৈপুণ্যের সংগে তোলে কোন জানা সুরের ঝঙ্কার, তখনও কনওয়েের বেশ ভাল লাগে—তবে সে-

অনুভূতি তত মদির নয়। সে দেখল, তিনি সোঁপ্যার কয়েকটি অপ্রকাশিত সুর জানেন। তিনি সেগুলি লিখে রেখেছেন, তাই কনওয়ে সেগুলি অভ্যাস করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আনন্দে অতিবাহিত করে। করটট বা পাশম্যান-এর জীবনেও এমন সৌভাগ্য আসেনি একথা ভাবতে তার একটু অদ্ভুত রকম আনন্দ হয়। ব্রিয়াকের ঝুলিও অফুরন্ত, তাঁর স্মৃতিপথে কেবলই আসে কত সুরের টুকরো, সেগুলিকে রচয়িতা হয় ফেলে দিয়েছিলেন আর নয়তো কোন উপলক্ষে তখনকার মত রচনা করেছিলেন। সেগুলি মনে আসার সংগে সংগে ব্রিয়াক লিখে ফেলতেন, টুকরো গুলির কয়েকটি অপূর্ব।

চ্যাং বলল, ব্রিয়াক খুব বেশিদিন দীক্ষিত হয়নি, তাই যদি সোঁপ্যার কথা একটু বেশি বলে তো কিছু মনে করবেন না। নবীন লামাদের অতীত সম্পর্কে প্রায়ই একটু দুর্বলতা থাকে ; ভবিষ্যৎকে মনের সীমানায় আনতে গেলে এটি একটি প্রয়োজনীয় স্তর।

সে কাজটা তাহলে বৃদ্ধতর লামাদের করণীয়।

হ্যাঁ। যেমন ধরুন, প্রধান লামা তাঁর জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত অলোকদৃষ্ট অনুধ্যানে অতিবাহিত করেছেন।

কনওয়ে মুহূর্তের জন্য চিন্তা করে বলল, ভাল কথা, আবার কবে তাঁর দেখা পাব বলে আপনার মনে হয় ?

পাঁচ বছর শেষ হবার আগে নয়।

কিন্তু চ্যাঙের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হলো। কেন না, শ্যাংরি-লাতে আসার পর মাসখানেকের মধ্যে আবার সে প্রধান লামার কাছ থেকে উপর-তলার সেই উষ্ণ ঘরটিতে উপস্থিত হবার দ্বিতীয় আহ্বান পেল। চ্যাং তাকে বলেছিল, প্রধান লামা তাঁর ঘর ছেড়ে কোথাও যান না, এবং ঘরটি উষ্ণ রাখার প্রয়োজন তাঁর শরীর অস্তিত্বের জন্য। কনওয়ে এইভাবে প্রস্তুত থাকায় তাপের পরিবর্তন তার কাছে পূর্বেকার মতো অত অস্বস্তিকর লাগল না। বরং ঘরে প্রবেশ করে যখন সে তাঁকে অভিবাদন জানাল, এবং সেই কোটরগত প্রাচীন

চোখদুটি ঈষৎ স্পন্দিত হয়ে তার অভিবাদনে সাড়া দিল, তখন সে বেশ সহজ-ভাবেই নিশ্বাস নিতে শুরু করেছে। সে অনুভব করে তাঁর সঙ্গে কেমন একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; সে জানে প্রথমবারের পর এত শীঘ্র দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার এক অভূতপূর্ব সম্মান, কিন্তু তার জন্মে সে ভীত বা ভক্তিভারাক্রান্ত হয় না। পদমর্যাদা বা বর্ণের চাইতে বয়সের ব্যবধান তাকে এমন কিছু বিহ্বল করে না। অতিবৃদ্ধ বা অত্যন্ত অল্পবয়স্ক বলে কখনও কোন মানুষের সঙ্গে মিশতে তার বাধা ঠেকেনি। প্রধান লামাকে সে আন্তরিক শ্রদ্ধার চোখে দেখে, কিন্তু তাদের সামাজিক সম্পর্ক সভ্যসমাজের অনুরূপ হবে না এমন কোন কারণ নেই।

স্বাভাবিক সৌজন্য বিনিময় হলো এবং কনওয়ে অনেকগুলি ভব্য প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল। সে বলল যে, এখানকার জীবন তার ভালই লাগছে এবং ইতিমধ্যে অনেকের সংগে তার বন্ধুত্ব হয়েছে।

আমাদের গোপন কথাটি তোমার সংগীদের বলনি?

না এখনও পর্যন্ত বলিনি। মাঝে মাঝে খুব বিশ্রী লাগছে, তবে বললে হয়তো আরও বিশ্রী লাগত।

আমিও ঠিক তাই অনুমান করেছিলাম; তুমি যা ভাল বুঝেছ তাই করেছ। তবে ওই বিশ্রী বোধটা নিতান্তই সাময়িক। চ্যাং বলছিল, তাদের ভেতর দুজন নাকি বিশেষ কষ্ট দেবে না।

আমারও তাই মনে হয়।

আর তৃতীয় জন?

কনওয়ে জবাব দিল, ম্যালিনসন তরুণ, একটুতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সে ফিরে যাবার জন্মে ভারি ব্যস্ত।

তুমি তাকে ভালবাস?

হ্যাঁ, খুবই ভালবাসি।

এই সময় চা-পাত্র এসে পৌছল। সুগন্ধ চায়ে চুমুক দেবার মাঝে কথা-বার্তা নেমে এলো একটু লঘু স্তরে।

এক সময় প্রধান লামা জিজ্ঞাসা করলেন, শ্যাংরি-লাকে তার অনুপম মনে হয় কিনা এবং পাশ্চাত্য জগত এর অনুরূপ সামান্য কিছু দিতে পারে কিনা।

একটু হেসে কনওয়ে বলল, হ্যাঁ সত্যি কথা বলিতে কি, শ্যাংরি-লা আমাকে অক্সফোর্ডের কথা কিছুটা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখানে আমি কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলাম। সেখানকার দৃশ্য এত সুন্দর নয়, কিন্তু সেখানে যে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলি প্রায়ই এই রকমই অবাস্তব এবং যদিও সেখানকার প্রাচীনতম অধ্যাপকটিও আপনাদের মতো বৃদ্ধ নন কিন্তু তাঁদের বৃদ্ধত্বে অগ্রসর হওয়ার পথটা অনেকটা যেন আপনাদেরই মতো।

তোমার রসজ্ঞান আছে, কনওয়ে।—প্রধান লামা বললেন, এর জন্যে ভবিষ্যৎকালে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

দশ

চ্যাং যখন শুনল যে, কনওয়ে প্রধান লামার সংগে আবার দেখা করেছে তখন বলে উঠল, অদ্ভুত! আতিশয্যবোধক শব্দ ব্যবহারে সব সময় যে অনিচ্ছুক তার মুখে একথা গভীর অর্থবোধক।

সে নিজের বক্তব্যে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলল, মঠ সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর, এধরণের ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেনি। পাঁচবছরের শিক্ষায় কোন নবাগতের কামনা-বাসনাগুলি সম্পূর্ণ মুছে যাবার আগে প্রধান লামা তার সংগে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকারের অভিলাষ কখনও করেননি। কেননা, বুঝতেই পারছেন তাতে তাঁর ভীষণ ক্লান্তি হয়। মানবিক কামনা-বাসনার উপস্থিতিটুকুও অবাঞ্ছিত, এবং তাঁর বয়সে একরকম অসহনীয়। আমি যে এই সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় বিজ্ঞতায় সন্দেহ প্রকাশ করছি তা নয়। বরং আমার বিশ্বাস, এতে আমাদের একটি অমূল্য শিক্ষা হলো—আমাদের সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট বিধিগুলি পরিমিত-ভাবেই নির্দিষ্ট। কিন্তু তাহলেও বলব, এটা অদ্ভুত!

কিন্তু কনওয়ের কাছে আর সব কিছুর তুলনায় সেটা তেমন অদ্ভুত বলে মনে হলো না; এবং প্রধান লামার সংগে আরও দুবার সাক্ষাৎকারের পর ক্রমে সে অনুভব করতে লাগল যে সেটা মোটেই অদ্ভুত ব্যাপার নয়। বরং তার মনে হয়, যেন এক পূর্ব-নির্দিষ্ট স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে দুটি মন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে; কনওয়ে যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে আসে তখন তার মনের গোপন সংশয় সন্দেহ সব দূর হয়ে বিরাজ করে সুগভীর প্রশান্তি। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, সেই বিরাট প্রজ্ঞার কাছে যেন সে সম্পূর্ণভাবে সম্মোহিত হয়ে পড়ছে; তারপরেই আবার যখন ছোট ছোট নীল পাণ্ডুর চায়ের পাত্রগুলিকে অবলম্বন করে শান্ত সীমায়িত জীবনের স্পন্দন জেগে ওঠে তখন

মনে হয় যেন একটা উপপাদ্য কত স্বচ্ছভাবে একটি চতুর্দশপদী কবিতায় দ্রবীভূত হয়েছে।

তাদের আলোচনা হয় বহু বিষয় নিয়ে এবং কোথাও শঙ্কার কিছু থাকে না; সব রকম দর্শন উজাড় হয়ে যায়; ইতিহাসের বহুবিচিত্র ধারা তাদের বিশ্লেষণের কাছে ধরা দেয় ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যাত হতে থাকে। কনওয়ের কাছে এ এক আবেশময় অভিজ্ঞতা, কিন্তু সে তার সমালোচক-মনকে নিরোধ করতে চায় না। একদিন একটি বিষয় নিয়ে সে তার বক্তব্য শেষ করতেই প্রধান লামা বললেন, পুত্র, তুমি যুবক হলেও তোমার জ্ঞানে বয়সের পরিপক্কতা ধরেছে। নিশ্চয় তোমার জীবনে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছিল ?

কনওয়ে হাসল। বলল, আমার যুগের আর আর পাঁচজনের জীবনে যা ঘটেছে তার চাইতে এমন কিছু বেশি নয়।

ঠিক তোমার মত কাকেও আমি পূর্বে কখনও পাইনি।

একটুখানি নীরব থাকার পর কনওয়ে বলল, এতে রহস্যের কিছুই নেই। আমার যে অংশটিকে আপনার প্রাচীন মনে হচ্ছে সেই অংশটি সময়পূর্ব তিক্ত অভিজ্ঞতায় জারিত। আমার জীবনের পরমতম শিক্ষার কাল উনিশ থেকে বাইশ বছর, কিন্তু ভারি ক্লান্তিকর সে-শিক্ষা।

যুদ্ধের সময় তুমি খুবই অসুখী হয়েছিলে, না ?

না ঠিক তা নয়। যুদ্ধ আমার রক্তে এমন উত্তেজনা জাগিয়েছিল যে আমি হয়ে উঠেছিলাম আত্মঘাতী, আতংকিত, বেপরোয়া: কখনও বা দুর্জয় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠতাম।—আরও হাজার হাজার মানুষের মতোই আমার অবস্থা হয়েছিল, হয়তো তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু হত্যার নেশায় আমি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম এবং লাম্পট্য ও বর্বরতা আমার কাছে হয়ে উঠেছিল স্বাভাবিক। যুদ্ধ মানেই মানবিক বৃত্তিগুলির আত্মাবমান ছাড়া কিছুই নয়, এবং সে-অবস্থা অতিক্রম করে আসা যার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তারই জীবনে এসেছে বিশ্বের

বিরক্তি আর ক্ষোভ। তাতেই পরবর্তী জীবন হয়ে ওঠে অত কঠিন অত রুক্ষ। মনে করবেন না যেন যে আমি ইচ্ছে করেই একটা করুণ ছবি আঁকছি—বরং তারপর থেকে আমার বরাত মোটামুটি ভালই বলতে হবে। কিন্তু এটা যেন হচ্ছে এক অযোগ্য হেডমাস্টারের স্কুলে পড়ার মতো—ভাল লাগে আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা প্রচুর, কিন্তু সময় সময় স্নায়ুর ওপর অসহ্য পীড়ন ; সেটা নিশ্চয়ই খুব সুখকর নয়। আমার মনে হয় অনেকে যা পারেনি, আমি সেইটিই আবিষ্কার করেছি।

এবং এইভাবে তোমার শিক্ষা চলল?

একটা ঝাঁকি দিয়ে কনওয়ে বলল, হয়তো, কামনা-বাসনার চিতাতেই জ্বলে ওঠে প্রজ্ঞার শিখা।

পুত্র, শ্যাংরি-লারও মূল-মন্ত্র ওই একই।

তা আমি জানি। তাইতো আমি পেয়েছি এতখানি স্বাচ্ছন্দ্য।

সে সত্যই বলেছিল : কেন না দিন যতই এগিয়ে চলে ততই তার মনে হয়, কেমন একটা সন্তৃপ্তির অনুরণন তার দেহ-মনকে এক যোগসূত্রে বেঁধে দিচ্ছে। পেরল্ট, হেনশেল এবং আর সকলের মত সে-ও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে। নীল চাঁদ তাকে অধিকার করেছে, আর রেহাই নেই। পর্বতমালা যেন চারিদিকে একটা দুর্লভ পবিত্রতার পরিবেষ্টনী রচনা করে ঝলমল করছে, তার চক্ষুদুটি সেই আলোক প্রাখর্যে প্রতিহত হয়ে উপত্যকার ঘন শ্যামলিমায় নেমে আসে। কী অনুপম সে চিত্র। পরক্ষণে যখন পদ্মদীঘি পার হয়ে হারপ্‌সিকর্ডের রুপালি সুরকুহেলী ভেসে আসে তখন তার মনে হয় রূপ ও ধ্বনি একত্র গ্রথিত হয়ে অপূর্ব সঙ্গতি রচনা করেছে!

তন্বী মাঞ্চুকে সে নীরবে ভালবেসেছে সে জানে। তার ভালবাসা কিছুই চায় না, এমন কি প্রতিদানও নয় ; এ-যেন তার মন তাকে অর্ঘ্য দেয়, তাতে মিশে থাকে তার সর্বেন্দ্রিয়ের সুরভি। সে যেন তার কাছে পৃথিবীর যা-কিছু কোমল

যা-কিছু পেলব তার প্রতীক; তার নিখুঁত পরিচ্ছন্ন ভব্যতা, হারপ্‌সিকর্ডের ওপর তার আঙুলের স্বচ্ছন্দ পরশ যেন তাকে তার কাছে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। কখনও কখনও সে তাকে এমনভাবে সম্বোধন করে যে, লো-সেন, ইচ্ছা করলে, অন্তরঙ্গ আলাপ করতে পারে, কিন্তু তার মনের গোপন গহন থেকে কোন উত্তরই আসে না, আর কনওয়েও যেন তা চায় না। হঠাৎ প্রতিশ্রুত রত্নের একটি পল সে তার অন্তরে উপলব্ধি করে—সময় আছে; তার মনের যা-কিছু বাসনা পূর্ণ করার সময় সে পাবে, এত সময় যে বাসনা পূর্ণ হবার নিশ্চয়তায় নিবৃত্ত হবে। এক বছর, দশ বছর—তবুও থাকবে সময়। তার স্বপ্ন আরও মধুর আরও রঙিন হয়ে ওঠে, তাই নিয়েই সে সুখী।

মাঝে মাঝে সে আবার তার অন্য জীবনটিতে এসে প্রবেশ করে; সেখানে ম্যালিনসনের অধৈর্য, বারণার্ডের আন্তরিকতা আর মিস ব্রিনক্‌লোর দুর্নিবার কর্তব্যবোধের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়। সে ভাবে, তারাও যেদিন তার মতন সব কথা জানতে পারবে সেদিন সে সব চাইতে সুখী হবে। চ্যাঙের মত তারও বিশ্বাস যে, বারণার্ড বা মিস ব্রিনক্‌লো বিশেষ বেগ দেবে না। একদিন বারণার্ডের একটি কথা শুনে সে বেশ কৌতুকবোধই করেছিল।

বারণার্ড বলল, দেখ কনওয়ে, এ জায়গা চিরদিনের জন্যে বাসা বাঁধার পক্ষে মন্দ নয়। প্রথমে ভেবেছিলাম, সিনেমা নেই, খবরের-কাগজ নেই, বাঁচব কী নিয়ে; কিন্তু এখন দেখছি সব কিছুই সয়ে যায়।

আমারও তাই মনে হয়।—সায় দিয়ে কনওয়ে বলল।

পরে সে জানতে পারল যে, চ্যাং বারণার্ডকে তারই অনুরোধে উপত্যকায় নিয়ে গিয়েছিল এবং উপত্যকায় প্রাপ্য যা-কিছু আনন্দ সে উপভোগ করে এসেছে।

সে কথা শুনে ম্যালিনসন অবজ্ঞাভরে কনওয়েকে বলল, বোধ হয় খুব টানছে। তারপর সে বারণার্ডকে বলল, অবশ্য আমার নাক না ঢোকানই উচিত, তবে কিনা ফিরে যাবার জন্যে শরীরটাকে মজবুত রাখা চাই তো।

দিন পনেরর ভেতরই কুলিরা এসে পড়বে, এবং যতটুকু আমি জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় পুনর্যাত্রাটা খুব আরামের হবে না।

বারণার্ড ঘাড় নেড়ে অবিচলিতকণ্ঠে বলল, তা যে হবে না আমিও জানি। আর মজবুত থাকার কথা যদি বল, এত মজবুত আমি অনেকদিন থাকিনি। রোজ ব্যায়াম করছি, কোনরকম ভাবনা-চিন্তা নেই, আর উপত্যকার ওরা বেশি গিলতে দেয় না। পরিমিতিবোধ, বুঝতেই তো পারছ, এখানকার নীতি যে।

তিক্তস্বরে ম্যালিনসন বলল, হ্যাঁ, খুব বুঝি, তোমার সময়টা পরিমিতভাবে বেশ ভালই কাটছে।

নিশ্চয়। সব রুচির খোরাকের ব্যবস্থা এখানে আছে। কারও বা চীনা তরুণীর পিআনো বাজান ভাল লাগে, তাই না? যার যেমন রুচি, তাই বলে কাকেও দোষ দেওয়া চলে না।

এ কথায় কনওয়ের কোনরকম ভাবান্তর ঘটল না, কিন্তু ম্যালিনসন ছোট ছেলের মত লাল হয়ে উঠল। সে ফেটে পড়ল, তবে হ্যাঁ, কেউ যদি অপরের সম্পত্তির ওপর নজর দেয় তাহলে শ্রীঘরই তার যোগ্য স্থান।—রাগে তার মাথার ঠিক থাকে না।

নিশ্চয়ই, যদি ধরতে পার।—অমায়িকভাবে হেসে বারণার্ড বলল, কথাটা তুলে ভালই করেছ, তোমাদের আমি একটি কথা বলতে চাই। কুলিদের যে দলটি আসছে, আমি ভাবছি তাদের সংগে না গিয়ে পরের কোন একটি দলের সংগে যাব। সেটা অবশ্য নির্ভর করছে এখানকার সন্ন্যাসীদের ওপর, তারা যদি বিশ্বাস করে যে এখনও হোটেলের খরচ চালাবার ক্ষমতা আমার আছে।

তার মানে তুমি আমাদের সংগে আসছ না?

ঠিক তাই। এখানে কিছুদিন থাকব বলে আমি স্থির করেছি। তোমাদের ফিরে যাওয়ার মানে হয়—তোমরা যখন দেশে ফিরবে তোমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ব্যাণ্ড বাজবে; কিন্তু আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে হাজির থাকবে একদল পুলিশ। তাদের কথা যতই ভাবছি খুশী হতে পারছি না।

অর্থাৎ তুমি ভয় পাচ্ছ ?

আমি বীরপুরুষ বলে নিজেকে জাহির করিনি।

অবজ্ঞার সুরে ম্যালিনসন বলল, এটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার ; ইচ্ছে হলে তুমি সারা জীবন এখানে থাক-না, কেউ তোমায় বাধা দেবে না।—অনুনয়ের ভংগিতে আর সকলের দিকে একবার তাকিয়ে সে বলল যে, সকলেই যে একই পথ বেছে নেবে তা নয়, তবে মতের পার্থক্য হয় বইকি। তোমার কী মত, কনওয়ে ?

মতের পার্থক্য হয় এ-বিষয়ে আমি একমত।

ম্যালিনসন মিস্ ব্রিনক্‌লোর দিকে তাকাল। বইটি রেখে সে অকস্মাৎ বলে উঠল, আমিও এখানে থেকে যাব ভাবছি।

কী ?—সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল।

ঠোঁটের কোনে উজ্জ্বল একটুকরো হাসি ফুটিয়ে সে বলল, যে ঘটনাস্রোত আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে আমি তা ভেবে দেখেছি, এবং আমার পক্ষে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। এর পেছনে কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। আপনার কী মনে হয়, মিঃ কনওয়ে ?

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া কনওয়ের পক্ষে বেশ একটু কঠিন। কিন্তু তাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে মিস ব্রিনক্‌লো দ্রুতকণ্ঠে বলে যায়, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রশ্ন করার আমি কে ? তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তিনি আমায় এখানে পাঠিয়েছেন,—আমাকে এখানে থাকতেই হবে।

আপনি কি এখানে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করবেন বলে আশা করেন ?—ম্যালিনসন জিজ্ঞাসা করল।

শুধু আশা নয়, তাই আমার ইচ্ছা। এদের সংগে কী ভাবে চলতে হয় আমি জানি। আমি আমার পথে চলব, ভয় পাব না। এদের কোন দৃঢ়তা আছে বলে মনে হয় না।

তাহলে আপনি এদের খানিকটা দৃঢ় করে তুলতে চান ?

হ্যাঁ তাই চাই, মিঃ ম্যালিনসন। যে পরিমিতি-বাদের কথা আমরা অত শুনেছি, আমি তার ঘোরতর বিরোধী। ইচ্ছে করলে আপনি এটাকে উদারতা বলতে পারেন, কিন্তু আমার মতে এর পরিণতি ভীতিকর শৈথিল্য। এখানকার অধিবাসীদের একমাত্র ব্যাধি অই তথাকথিত উদারতা, - আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে তারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করব মনস্থ করেছি।

কিন্তু তারা কি এতই উদারহৃদয় যে আপনাকে তারা সে সুযোগ দেবে? —হাসতে হাসতে কনওয়ে বলল।

কিংবা মিস্ ব্রিনক্‌লো এতই দৃঢ়-হৃদয় যে তারা তাঁকে বাধা দিতে পারবে না।—বারণার্ড বলল, এইজন্যই তখন বলছিলাম, সব রুচির খোরাকই এখানে মিলবে।

হ্যাঁ, জেলখানার অভিরুচি থাকলে।—ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল ম্যালিনসন।

কিন্তু তাও তোমাকে দেখতে হবে দুভাবে। পৃথিবীতে এমন অনেক লোকই আছে যারা সব-কিছুর বিনিময়ে ঝঞ্ঝাট থেকে রেহাই পেয়ে এ-রকম জায়গায় থাকতে চায়, কিন্তু ছেড়ে আসার উপায় থাকে না। তাহলে বল, জেলখানায় আছি আমরা, না তারা?

খাঁচায় আবদ্ধ বাঁদরকে সান্ত্বনা দেবার মতো কল্পনা-বিলাস বটে!— ম্যালিনসন বলল, সে তখনও ভীষণ রেগে রয়েছে।

পরে একদিন প্রাংগণে পায়চারি করতে করতে ম্যালিনসন কনওয়েকে একা পেয়ে বলল, বারণার্ডকে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। ও যে আমাদের সংগে যাবে না তাতে আমি এতটুকু দুঃখিত নই। তুমি হয়তো আমাকে খুব বদমেজাজী ভাবছ, কিন্তু চীনা তরুণীটিকে নিয়ে ও অমন চিপটেন কাটবে আমার তা মোটেই ভাল লাগে না।

কনওয়ে ম্যালিনসনের হাতটা নিজের হাতে নিল। ক্রমেই সে স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, সে এই তরুণটিকে গভীরভাবে ভালবাসে এবং তাদের দুজনের মনে

বহু অসামঞ্জস্য থাকলেও এই কয়েক সপ্তাহের ঘনিষ্ঠতায় সে-ভালবাসা আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। বলল সে, আমার তো ধারণা, মেয়েটিকে নিয়ে সে খোঁচা দিয়েছিল আমাকে, তোমাকে নয়।

না, আমার মনে হয় সে আমাকে লক্ষ্য করেই বলেছিল। সে জানে আমি তার সম্বন্ধে উৎসুক। সে-কথা সত্যি, কনওয়ে। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না সে কেনই বা এখানে আছে, আর সত্যিই এখানে থাকতে চায় কিনা। আমি যদি তোমার মতন তার ভাষায় কথা বলতে পারতাম, তাহলে তার কাছ হতে সব কথা বার করে নিতাম।

পারতে কিনা সন্দেহ রয়েছে, ম্যালিনসন। জানই তো, কারুর সংগেই সে তেমন কথাবার্তা বলে না।

কেন যে তুমি তাকে সব রকম প্রশ্ন করে করে অস্থির করে তোল না তা ভাবতে আমার অবাক লাগে।

সেটা যে আমার স্বভাব নয়, ম্যালিনসন।

কনওয়ের আরও কিছু বলার ইচ্ছা হয়, কিন্তু তখনই হঠাৎ একটা দুঃখ ও বৈপরীত্য-বোধ কেমন অস্পষ্টভাবে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে ভাবে এই উৎসাহী অধীর যুবকটি কোন কিছুই সহজভাবে নিতে পারবে না। সে বলল, আমি যদি তুমি হতাম ম্যালিনসন, তাহলে লো-সেনের কথা মোটেই ভাবতাম না,—সে যথেষ্ট সুখী।

বারণার্ড আর মিস ব্রিনক্লোর শ্যাংরি-লাতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কনওয়ের ভালই লাগল, কিন্তু তাতে তখনকার মতো ম্যালিনসন আর সে যেন দুটি বিপরীত দলের লোক হয়ে গেল। সে এক বিশ্রী অবস্থা, কিন্তু তা আয়ত্তে আনার মতো কোন উপায়ও সে স্থির করতে পারল না।

ভাগ্যক্রমে তখন তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। দু মাসের মধ্যে তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই ; এবং পরে, নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করলেও

সঙ্কট কিছু কম হবে না। এই কারণে এবং আরও কয়েকটি কারণে যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্যে বৃথা চিন্তা সে ছেড়ে দিল। তবুও সেদিন সে চ্যাংকে বলল, দেখুন চ্যাং, আমার ভাবনা শুধু ম্যালিনসনকে নিয়ে। সে যখন সব জানতে পারবে তখন নিশ্চয়ই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠবে।

সহানুভূতির সংগে ঘাড় নেড়ে চ্যাং বলল, হ্যাঁ, তার সৌভাগ্য সম্বন্ধে তাকে উৎসাহিত করা খুব সহজ হবে না। কিন্তু তবু অসুবিধেটা সাময়িক। আজ থেকে বিশ বছরের মধ্যে আমাদের বন্ধু নিশ্চয়ই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

কনওয়েব মনে হলো, এভাবে অবস্থাটিকে একটু অতিমাত্রায় দার্শনিক ভঙ্গিতে দেখা হচ্ছে। বলল, আমি ভাবছি কী ভাবে সত্যটি তার কাছে ব্যক্ত করা যাবে। সে তো কুলিদের আশায় দিন গুণছে ; তারা যদি না আসে—

কিন্তু তারা আসবেই।

আসবে ? আমি ভেবেছিলাম আমাদের শান্ত করার জন্যে আপনি স্তোক দিয়েছিলেন।

মোটেই না। কোনরকম গোঁড়ামি না থাকলেও আমরা পরিমিতভাবে সত্য কথাই বলি,—শ্যাংরি-লার তাই রীতি। বিশ্বাস করুন, কুলিদের সম্পর্কে আমি যা বলেছি এক রকম নির্ভুল ; যে সময়ে তারা আসবে বলেছি ঠিক সেই সময়ে কিংবা তার কাছাকাছি কোন সময়ে তাদের আমরা আশা করছি।

তাহলে দেখবেন ম্যালিনসনকে আটকে রাখা খুব শক্ত হবে।

কিন্তু সে-রকম চেষ্টা আমরা কোনদিনই করি না। তিনি নিজেই জানতে পারবেন যে, কুলিরা কাকেও সংগে নিয়ে যেতে রাজি নয়।

বুঝেছি। এই আপনাদের পদ্ধতি ? তারপর কী হবে বলে আশা করেন ?

মিঃ ম্যালিনসন যুবক এবং আশাবাদী ; প্রথম বার বিফল হবার পর তিনি আশা করবেন দ্বিতীয় দলটি তাঁর প্রস্তাবে নিশ্চয়ই রাজী হবে। তারা মাস দশেকের মধ্যেই এসে পড়বে। আমরা এমন অবিজ্ঞ নই যে তাঁকে আমরা গোড়া থেকেই হতাশ করব।

কনওয়ে একটু তীক্ষ্ণভাবে বলল, ওসবের ধার দিয়ে সে যাবে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব সে একাই পালাবার চেষ্টা করবে।

পালাবেন ? আমাদের গিরিসঙ্কট তো সকলের জন্যে সবসময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। প্রকৃতি নিজে যেটুকু ব্যবস্থা করেছেন তাছাড়া আমাদের কোন প্রহরী নেই।

কনওয়ে ঈষৎ হেসে বলল, প্রকৃতি যে ব্যবস্থা ভালই করেছেন সেটুকু নিশ্চয় স্বীকার করবেন। কিন্তু আমার মনে হয় না যে প্রকৃতির ওপরই আপনারা সব সময়ই নির্ভর করেন। যে-সব অভিযাত্রীদল এখানে আসার পর ফিরে যেতে চেয়েছিল তাদের জন্যেও কি গিরিসঙ্কট সমান উন্মুক্ত ছিল ?

এবার হাসল চ্যাং। বলল, বিশেষ অবস্থার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।

চমৎকার। তাহলে আপনারা পালাবার সুযোগ দেন তখন যখন জানেন যে সুযোগ নিতে গিয়ে তারা বোকা বনে যাবে। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, অন্তত জনকয়েকও সে চেষ্টা করবে।

কদাচিৎ এ-রকম ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সাধারণত মালভূমিতে একটি রাত্রির অভিজ্ঞতার পর পলাতকরা ফিরে এসে হাঁপ ছেড়েছে।

উপযুক্ত আশ্রয় ও পোশাকের অভাবে ফিরতে বাধ্য হয়েছে নিশ্চয় ? তাই যদি হয়, তাহলে দেখছি আপনাদের নরম পদ্ধতি যে কোন গরম পদ্ধতির সমান কার্যকরী। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, কেউ ফিরল না ?

চ্যাং বলল, আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনিই তো দিলেন।—তাহলে ফিরলই না।—কিন্তু সংগে সংগে সে বলে গেল, তবে বিশ্বাস করুন এ রকম

হতভাগ্যের সংখ্যা খুবই কম, এবং আশা করি আপনার বন্ধু হঠকারিতা করে সে-সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন না।

তার কথায় কনওয়ে বিশেষ আশ্বাস পায় না; ম্যালিনসনের ভবিষ্যৎ তার মনে কাঁটার মত বিঁধে থাকে। যদি সে এদের সম্মতি নিয়ে যেতে পারত! আর তার নজিরও তো রয়েছে,—বৈমানিক টালু।

চ্যাং স্বীকার করল যে, কর্তৃপক্ষ যা ভাল বলে বিবেচনা করবেন তা করার অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার বন্ধুর কৃতজ্ঞতা-বোধের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

কনওয়ে বুঝল তার প্রশ্ন খুবই যুক্তিসংগত; কেননা ভারতে ফেরার সংগে সংগে ম্যালিনসন কী করবে তা তার ভাবভঙ্গি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। এখন সেইটেই তার প্রিয় আলোচ্য এবং সে-প্রসঙ্গ সে বহুবার বিস্তারিত করেছে।

কিন্তু বর্ণাঢ্য শ্যাংরি-লা তার সারা মনকে এমনই পরিব্যাপ্ত করেছে যে পার্থিব সব-কিছু তার মন হতে ক্রমে সরে যায়। এক ম্যালিনসনের চিন্তা ছাড়া সে খুবই পরিতৃপ্ত। সে অবাক হয়ে দেখে, নূতন পরিবেশ কত মন্থর-গতিতে বিকশিত হয়ে তার প্রয়োজন ও রুচির সংগে কেমন দুর্বোধ্যভাবে মিশে গিয়েছে।

একদিন সে চ্যাংকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা আপনাদের দৃষ্টিভংগিতে প্রেমের স্থান কোথা? আমার তো মনে হয়, এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের ভেতর কেউ কেউ হয়তো আসক্তি বোধ করেন?

প্রায়ই।—প্রশস্ত হাসির সংগে চ্যাং জবাব দিল, অবশ্য লামারা ওসব থেকে মুক্ত, এবং আমাদের মধ্যে যাঁরা বয়োবৃদ্ধ তাঁরাও; কিন্তু তার আগে আর সকলের সংগে আমাদেরও কোন তফাত নেই, শুধু এইটুকু দাবি করতে পারি যে আমরা বাহ্য আচরণে আরও সংযত। এই সুযোগে আপনাকে একটি কথা

জানাই মিঃ কনওয়ে, স্যাংরি-লার আতিথেয়তা বহুদূরপ্রসারী। আপনাদের বন্ধু মিঃ বারণার্ড ইতিমধ্যে তার সুযোগ নিয়েছেন।

কনওয়ে একটু হাসল। তারপর শুষ্ককণ্ঠে বলল, ধন্যবাদ। সে কথা আমি জানি, কিন্তু উপস্থিতের মতো আমার প্রবৃত্তি তেমন প্রবল নয়। আমার কৌতূহল দেহের দিক থেকে যত না হোক, মনের দিক থেকে বেশি।

আপনার কাছে দেহ ও মন পৃথক করা এত সহজ? এটা কি সম্ভব যে আপনি লো-সেনের প্রতি অনুরক্ত?

কনওয়ে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল, কিন্তু সে আশা করল সেটা প্রকাশ পায়নি। প্রশ্ন করল, একথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন?

কারণ, আপনার পক্ষে তার প্রেমে পড়াটা মোটেই অশোভন নয়—অবশ্য পরিমিতভাবে। লো-সেনের কাছ থেকে প্রতিদানে অনুরাগের কিছু পাবেন না—সেটা আশাতিরিক্ত, কিন্তু বিশ্বাস করুন, সে এক মনোরম অভিজ্ঞতা। একথা আমি জোর করেই বলতে পারছি, তার কারণ আমার বয়স যখন কম তখন আমি তাকে ভালবেসেছিলাম।

আপনি? তাই নাকি? তখন কোন প্রতিদান পেয়েছিলেন?

শুধু আমার স্তুতিবাদের রমণীয় স্বীকৃতি আর বন্ধুত্ব—যা কালের গতির সঙ্গে অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

তার মানে, সে প্রতিদান দেয়নি?

তাই বলতে চান বলুন।—চ্যাং একটু ভাবগম্ভীরকণ্ঠে বলল, পূর্ণতার চরম মুহূর্তটিতে প্রেমিককে দূরে সরিয়ে দেওয়াই তার স্বভাব।

কনওয়ে হেসে উঠল, বলল, সেটা না-হয় আপনার আর হয়তো আমারও ক্ষেত্রে হলো, কিন্তু ম্যালিনসনের মতন একজন রক্তগরম যুবকের বেলায়?

তাই যদি হয় তাহলে তো উত্তম কথা। জানবেন, এ-ঘটনা নতুন কিছু নয়,—ব্যথিত বন্দী যখন বুঝবে যে প্রতিদান নেই তখন লো-সেনই তো দেবে তাকে সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা ?

হ্যাঁ, কথাটির যেন ভুল অর্থ করবেন না। লো-সেন আশ্লেষ-আলিঙ্গন দেয় না, তার উপস্থিতিটুকুই সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। আপনাদের শেকস্‌পীয়র ক্লিওপেট্রার সম্বন্ধে কী যেন বলেছেন—'যেখানে সে দেয় পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেখানেই আনে ক্ষুধা'। কামনা-বাসনা বিক্ষুব্ধ সমাজে নারীর এই রূপটি মনোহারী নিশ্চয়ই, কিন্তু এই ধরণের নারীর স্থান শ্যাংরি-লাতে হতে পারে না। ওই উদ্ধৃতিটি আমি একটু ঘুরিয়ে বলব,—লো-সেন যেখানে পরিতৃপ্তি আনে না এতটুকু, সেখানেও মিটিয়ে দেয় ক্ষুধা। সেটা কিন্তু আরও মধুর, তার স্থায়ীত্ব আরও বেশি।

এবং আমার মনে হয়, সে-কাযে লো-সেন খুবই পারদর্শী।

নিশ্চয়ই—তার বহু নজির রয়েছে। তার বৈশিষ্ট্যই হলো বাসনাকে অনুগ্র করে এনেও সাড়া না দেওয়া—তাতে কিন্তু আনন্দের অনুভূতি বড় কম নয়।

তাহলে তো আপনারা তাকে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-সরঞ্জামের অংশবিশেষ বলতে পারেন ?

আপনার ইচ্ছে হয় আপনি তাকে ওইভাবেই দেখতে পারেন।—স্নিগ্ধকণ্ঠে চ্যাং বোঝাতে চাইল, কিন্তু আরও সুন্দর ও সঙ্গত হতো যদি তাকে আপনি কাচপাত্রে প্রতিফলিত রামধনুর সঙ্গে কিংবা ফুলের পাপড়ির ওপর ঘনীভূত শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তুলনা করতেন।

আপনার সঙ্গে আমি একমত, চ্যাং, সেটা অনেক বেশি সুসঙ্গত হতো।—কনওয়ে শান্তপ্রকৃতি চৈনিকটির পরিমিত অথচ বুদ্ধিদীপ্ত পরিহাসগুলি উপভোগ করে।

কিন্তু এর পর যখন সে তন্বী মাঞ্চুকে আবার একান্তে দেখতে পেল, সে বুঝতে পারল চ্যাঙের মন্তব্যগুলি কত চাতুর্যভরা। মেয়েটিকে ঘিরে থাকে একটি গন্ধ-সুরভি ; সেটা তার মনের গহনে এসে নাড়া দেয়, জালিয়ে তোলে

অগ্নিশিখা—সে-আগুনে জ্বালা নেই, আছে শুধু মধুর উষ্ণতা। তারপর সে যেন হঠাৎই বুঝতে পারে যে, শ্যাংরি-লা আর লো-সেন নিখুঁত পূর্ণতার প্রতিচ্ছবি এবং সে কিছু চায় না, শুধু চায় সেই যুগ্ম শান্ততায় ক্ষীণ একটু সাড়া তুলতে অনাগত ভবিষ্যতের কোন একটি দিনে। তার কামনা-বাসনাগুলি যেন একটি স্নায়ু-তন্ত্র, বছরের পর বছর ধরে পৃথিবী তাদের ওপর পীড়নই করেছে; আজ সেই সুতীব্র ব্যথা প্রশমিত হয়েছে এবং যে-ভালবাসায় বেদনা নেই বিরক্তি নেই, তার কাছে সে আজ নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে। রাত্রিতে পদ্মদীঘির পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে কোন কোন সময়ে তন্বী মাঞ্চুকে তার উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে কল্পনা করে, কিন্তু অবারিত সময়-বোধ তার স্বপ্ন প্লাবিত করে দেয়, একটা সুচির শান্ত বিমুখতায় তার সব চাঞ্চল্যের অবসান হয়ে যায়।

যুদ্ধপূর্ব জীবনেও সে এত সুখী ছিল বলে মনে হয় না। শ্যাংরি-লা তাকে এক প্রশান্ত জগতের সন্ধান দিয়েছে, সে-জগৎটি তার ভাল লাগে। তার ভাল লাগে সেখানকার সুশিষ্ট মন্থর আবহাওয়া—সেখানে বাক্যালাপ অভ্যাসমাত্র নয়, যেন শিল্পসৃষ্টি। তার এ-কথাটিও ভাবতে ভাল লাগে যে সেখানে অলসতম জিনিসটিও সময়াপহারক বলে নিন্দিত নয় এবং ভঙ্গুরতম স্বপ্নগুলিও মনের কাছে অবাঞ্ছিত নয়। শ্যাংরি-লা সব সময়ই শান্ত, তবু সব সময়ই সেখানে অসংখ্য অব্যস্ত কাজের ভিড়; লামাদের জীবনধারণ পদ্ধতি দেখে মনে হয় যেন সব সময়ই তাঁদের হাতে প্রচুর সময় রয়েছে, অথচ সে-সময়ের যেন কোন ভারই নেই। তাঁদের সংগে কনওয়ের আর দেখা হয় না, কিন্তু সে ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারে তাঁদের কাজ কত ব্যাপক, কত বহুল; ভাষা শিক্ষা ছাড়া তাঁদের কয়েকজন জ্ঞানসমুদ্র এমনভাবে মন্থন করে চলেছেন যে প্রতীচী তা শুনলে বিস্ময়াবিষ্ট হবে। অনেকেই নানাবিষয়ে পুস্তক রচনায় রত; একজন (চ্যাঙের কাছে শোনা) শুদ্ধ গণিত সম্পর্কে অমূল্য গবেষণা করেছেন; আরেকজন য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসের ওপর একটি বিরাট মৌলিক রচনায় স্পেংলার

আর গিবনের মধ্যে অপূর্ব সংহতি সাধন করেছেন। কিন্তু এই ধরণের কাজ সকলের জন্য নয়, বা কাকেও চিরকাল ধরে করতে হয় না; বহু নিস্তরঙ্গ খাত রয়েছে, তাতে তাঁরা খেয়ালখুশি মতো অবগাহন করেন। অবশ্য বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে সে সব কাজের সার্থকতা কতটুকু! এই প্রসঙ্গে কনওয়ে একদিন মন্তব্য করলে প্রধান লামা উত্তরে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের এক চীনা শিল্পীর গল্প বলেন। শিল্পীটি বহু বছর ধরে একটি লাল পাথরের ওপর কুঁদে কুঁদে ড্রাগন, পাখি, ঘোড়া এইসব এঁকে পাথরটি এক রাজকুমারকে উপহার দেয়। রাজকুমার পাথরটিকে নিছক পাথর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না; শিল্পী তখন তাকে বলল, 'একটি প্রাচীর তৈরি করিয়ে তাতে একটি জানলা বসান, তারপর সেই জানলার মধ্য দিয়ে উষার আলোকে পাথরটিকে দেখুন।' রাজকুমার তাই করল এবং তখন বুঝতে পারল পাথরটি কত সুন্দর। গল্পশেষে তিনি বললেন গল্পটি চমৎকার নয়? আর তোমার কি মনে হয় না এতে একটি অমূল্য উপদেশ নিহিত রয়েছে?

কনওয়ে সায় দিল। যখন সে বুঝতে পারল যে, শ্যাংরি-লা তার প্রশান্ত পরিকল্পনার মধ্যে অগণিত অদ্ভুত ও আপাত-তুচ্ছ কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পেরেছে তখন তার বড় আনন্দ হলো, কেননা এই ধরণের কাজের প্রতি তার আকর্ষণ চিরদিনের। সত্যিসত্যি অতীতের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পায় অসংখ্য কাজের ছায়ামূর্তি সেথা ভিড় করে দাঁড়িয়েছে—সেগুলি এমনই ছন্নছাড়া এমনই কষ্টকর যে সবই অসমাপ্ত থেকে গেছে। কিন্তু এখন সব-কিছু শেষ করা সম্ভব—গতি যতই মন্থর হোক না কেন। এ-কথা ভাবতে তার ভালই লাগে; তাই বারণার্ড যখন তাকে একান্তে বলে যে সেও শ্যাংরি-লা বাসের একটি চমৎকার ভবিষ্যৎ ছকে ফেলেছে তখন তাকে ঠাট্টা করতে প্রবৃত্তি হয় না।

বারণার্ড আজকাল প্রায়ই উপত্যকায় যায়, তা যে কেবল সুরা আর নারীর জন্য তা নয়।

সে বলল, শোন কনওয়ে, তোমায় আমি একথা বলছি, তার কারণ তুমি ম্যালিনসন নও। জানইতো, সে আমার ওপর একেবারে খড়্গহস্ত। কিন্তু তুমি সব বুঝবে নিশ্চয়। আশ্চর্য এই যে, তোমরা বৃটিশ কর্মচারীরা প্রথম প্রথম ভারি শক্ত, ভারি কড়া ; তবে হ্যাঁ, তোমাকে যে কেউ বিশ্বাস করতে পারে।

হাসতে হাসতে কনওয়ে বলল, সে-বিষয়ে আমি কিন্তু খুব নিশ্চিত নই। আর ম্যালিনসনও তো আমারই মতন বৃটিশ কর্মচারী।

হ্যাঁ—তবে সে বালক, কোন কিছু বিচার করার ক্ষমতা তার নেই। তুমি আমি বাস্তব জগতের লোক—আমরা বুঝি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। এই যে আমরা এখানে এসে হাজির হয়েছি কিন্তু কেন যে আমাদের আনা হলো এখনও পর্যন্ত তার মাথামুণ্ডু আমরা কিছুই জানি না—তবু এটা কি খুবই অস্বাভাবিক? যেমন ধর, পৃথিবীতেই বা আমরা কেন এসেছি তাই কি আমরা জানি?

তা হয়তো অনেকেই জানে না,—কিন্তু কী বলতে চাও তুমি?

গলা খাদে নামিয়ে ফিস ফিস করে কিছুটা উল্লাসের সঙ্গেই বারণার্ড বলল, সোনা হে—সোনা। রাশি রাশি—হ্যাঁ, রাশি রাশি উপত্যকায় রয়েছে। যৌবনকালে আমি ছিলাম মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, শৈলস্তর চিনতে আমার আজও ভুল হবে না। বিশ্বাস কর কনওয়ে, র‍্যাণ্ডেরই মতো প্রচুর, অথচ তোলা দশগুণ সহজ। তোমরা ভাবতে, ছোট্ট চেয়ারটি চেপে আমি উপত্যকায় যাই শুধু ফূর্তি করতে। কিন্তু মোটেই তা নয়। কেন যে যেতাম তা আমিই জানতাম। দেখ, গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, মোটা টাকা ধরে না দিলে বাইরে থেকে এখানে এত জিনিস কিছুতেই আসত না, তাহলে এরা দাম হিসেবে হয় সোনা, নয় রূপো, নয়তো হীরে জহরত কিংবা আর কিছু দেয়। অত্যন্ত সোজা হিসেব। তারপর কিছুদিন উপত্যকায় ঘোরাঘুরি করতেই এদের সব কারিকুরি ধরা পড়ে গেল।

তুমি নিজেই সন্ধান করে বের করেছ ?—কনওয়ে প্রশ্ন করল।

না, সেকথা আমি বলব না, তবে হ্যাঁ, আমি অনুমান করেছিলাম। তারপর একদিন চ্যাংকে সোজাসুজি বললাম। বিশ্বাস কর কনওয়ে, ও-চীনাকে আমরা যতটা খারাপ ভেবেছিলাম তা নয়।

আমি তো তাকে কোনদিনই খারাপ লোক ভাবিনি।

তা আমি জানি—তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব কি ভাবে হলো তা ভেবে তুমি নিশ্চয়ই বিস্মিত হবে না। তারপর সে নিজেই আমাকে সব কিছু দেখাল ; তুমি শুনলে অবাক হবে যে, কর্তৃপক্ষ আমাকে খুশিমতো উপত্যকা সন্ধান করে সে-সম্বন্ধে একটি পূর্ণ বিবরণ দাখিল করার অনুমতি দিয়েছে। কী মনে হচ্ছে তোমার, বল ? একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য পাওয়াতে তারা খুব খুশি, তারপর যখন বললাম, সোনা তোলার পরিমাণ যাতে বাড়ান যায় সে বিষয়ে আমি ভাল পরামর্শ দিতে পারব তখন তো কথাই নেই।

তাহলে তো দেখছি তুমি বেশ পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলছ ?

তা—কাজ একটা পেয়েছি, আর যা-তা কাজ নয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা কেউ বলতে পারে না। দেশে ফিরে গিয়ে ওর যদি তাদের আমি একটি নতুন সোনার-খনির সন্ধান দিতে পারি তাহলে হয়তো আমাকে জেলে পোরার জন্যে তারা তত ব্যস্ত হয়ে উঠবে না। কিন্তু মুশকিল একটা আছে—তারা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে ?

করতেও পারে। আমাদের সব কাহিনীই তো অস্বাভাবিক, বিশ্বাস করতে গেলে তাদের অস্বাভাবিকই বিশ্বাস করতে হবে।

উৎসাহের সংগে ঘাড় নেড়ে বারণার্ড বলল, ঠিক বলেছ, কনওয়ে। তাহলে এস আমরা একটা ব্যবস্থা করে নিই,—বেশ, সবেতেই তোমার আমার আধা-আধি। তোমায় করতে হবে কি, আমার বিবরণীতে কেবল একটা সই দিতে হবে—বৃটিশ কনসাল, ব্যাস আর কিছু নয়। তাইতেই আমার দর বেড়ে যাবে।

কনওয়ে হেসে বলল, সে দেখা যাবে'খন। আগে তো তোমার বিবরণী তৈরি হোক।

যা হবার নয় তাই করার চেষ্টা দেখে কনওয়ে বেশ কৌতুক অনুভব করে, অবশ্য বারণার্ড যে একটি অবলম্বন পেয়েছে তা জেনে সে খুশী হয়।

প্রধান লামাও আনন্দিত হন। কনওয়ে আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যার পর তাঁর সংগে দেখা করতে যায় এবং ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানে কাটায়; এমন-কি ভৃত্যেরা শেষ চায়ের পাত্রগুলি নিয়ে রাত্তিরের মত ছুটি পেয়ে চলে যাবার পরও সে সেখানে থাকে। প্রধান লামা কোনদিন তার তিনটি সংগী সম্বন্ধে কুশল প্রশ্ন করতে ভোলেন না এবং একদিন তিনি বিশেষ করে জানতে চাইলেন তাদের কর্মজীবনের কথা,—শ্যাংরি-লাতে আসায় যে-জীবনে ছেদ পড়েছে সেই জীবনের কথা।

একটু চিন্তা করে কনওয়ে বলল, ম্যালিনসন জীবনে উন্নতি করতে পারত—সে উৎসাহী, আর তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুবই। বাকী দুজন—অন্তত কিছুদিনের জন্যে তারা এখানে থাকতে খুশীই হবে।

জানলার পর্দায় এইসময় আলোর একটা চমক খেলে গেল। প্রাংগণ পার হয়ে প্রধান লামার ঘরের দিকে আসার সময় সে মেঘগর্জন শুনেছিল। এখন ঘরের ভেতর থেকে কোন শব্দ শোনা যায় না, এমন-কি ভারি পর্দা ভেদ করে বিদ্যুৎচমকের যে আলোকটুকু আসে, তা-ও অতি ক্ষীণ।

প্রধান লামা বললেন, তারা যাতে এখানে স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে তার জন্যে আমরা যথাসাধ্য করছি। মিস ব্রিনক্লো আমাদের ধর্মান্তরিত করতে চান, আর মিঃ বারণার্ডও আমাদের পরিবর্তিত করতে চান—একটি যৌথ বণিকসম্প্রদায়ে। নির্দোষ পরিকল্পনা—ওই নিয়েই তারা আনন্দে দিন কাটাবে। কিন্তু তোমার তরুণ বন্ধুটি—যাকে সোনা বা ধর্ম কিছুই সান্ত্বনা দিতে পারে না,—তাকে নিয়ে কী করা যায় বলো তো?

হুঁ, সে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সে দেখছি তোমারই সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমার কেন ?

ঠিক এইসময় চা এসে পৌছল, কাজেই প্রধান লামার উত্তর দেওয়া হলো না ; তিনি আতিথেয়তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—কিন্তু সেটা যেন অনেকটা নিয়মরক্ষা। যথারীতি কথাবার্তা লঘু পর্যায়ে নামিয়ে তিনি বললেন, বছরের এই সময়টা কারাকাল ঝড়ঝঞ্ঝা পাঠায়। উপত্যকার অধিবাসীরা বলে, গিরিসঙ্কটের বাইরে বিরাট জায়গাটিতে যে-সব দৈত্য-দানব বাস করে তারা ক্রুদ্ধ হলেই ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়। বাইরে বলতে তারা নিজেদের জায়গাটুকু বাদ দিয়ে গোটা পৃথিবীটাকেই বোঝে। অবশ্য তারা ফ্রান্স, ইংলণ্ড বা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাদের ধারণা, সম্মুখের অই ভীতিকর উচ্চ-ভূভাগ অনন্তপ্রসারী। উষ্ণ শান্ত উপত্যকার সমতলে তারা এত সুখে বাস করছে যে সে স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তাটুকু কারও কল্পনায় আসে না। বরং তারা বলে 'হতভাগ্য বাইরের লোকেরা' উপত্যকায় আসার জন্য অস্থির। এটা এক হিসেবে দৃষ্টিভংগির প্রশ্ন, তাই না ?

বারণার্ডও অনেকটা এইরকম একটি মন্তব্য করেছিল, কনওয়ে সেই কথা বলল।

প্রধান লামা বলে উঠলেন, খুব বুদ্ধিপূর্ণ কথা। তিনিই আমাদের প্রথম আমেরিকান অতিথি—সত্যিই আমরা ভাগ্যবান।

কথাটা শুনে কনওয়ের কেমন অস্বস্তি হয়। পৃথিবীর বারোটি দেশের পুলিশ যাকে এখনও সন্ধান করে ফিরছে তাকে পেয়ে কিনা শ্যাংরি-লা ভাগ্যবান! একবার তার মনে হলো, প্রধান লামাকে সেকথা বলে, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে ভাবল, যথাসময়ে বারণার্ডের নিজের মুখেই সব কথা ব্যক্ত হওয়া সঙ্গত। সে বলল, ঠিক কথাই বলেছে সে, এখন পৃথিবীর অনেক লোকই এখানে থাকতে পেলে খুশী হবে।

অনেক অনেক লোক। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের বুকে আমরাই একমাত্র

জীবন-তরী ; আমাদের এই ক্ষুদ্র তরীতে জনকতক বিপন্নের স্থান হতে পারে, কিন্তু যদি ডুবোজাহাজের সকলেই আশ্রয় নিতে চায় তাহলে আমাদের ভরাডুবি হবে। কিন্তু ওকথা এখন থাক। শুনলাম ব্রিয়াকের সংগে তোমার খুব আলাপ হয়েছে। আমারই দেশের লোক সে—ভারি চমৎকার। সে বলে গীতিকারদের মধ্যে সোঁপ্যাই শ্রেষ্ঠ ; আমি কিন্তু তার সংগে একমত নই। তুমি তো জান আমি ভালবাসি মোজার্টকে।

চা-পান শেষ হবার পর ভৃত্যেরা পাত্রগুলি নিয়ে সেদিনকার মতো বিদায় হলো। কনওয়ে তখন পূর্ব প্রশ্নটি আবার তুলল. ম্যালিনসনকে নিয়ে আমাদের কথা হচ্ছিল, আপনি বলছিলেন সে আমারই সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে —কিন্তু বিশেষ করে আমার কেন ?

বেশ সহজকণ্ঠে প্রধান লামা উত্তর দিলেন, কেননা, পুত্র, আমার শেষের ডাক এসেছে।

উত্তরের আকস্মিকতায় কনওয়ে কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না।

শেষে প্রধান লামাই বললেন, তুমি বিস্মিত হচ্ছ ? কিন্তু বন্ধু, আমরা তো কেউই অমর নই, শ্যাংরি-লাতেও নয়। এমন হতে পারে যে আর কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র আমার পরমায়ু রয়েছে—আবার কয়েকটি বছরও অসম্ভব নয়। আমি শুধু এই সরল সহজ সত্যটি জানিয়ে দিতে চাই যে শেষ মুহূর্তটি আমার মানস-চক্ষে স্পষ্ট ধরা দিয়েছে। আমার জন্যে তোমার মন চঞ্চল হয়েছে —সেটা তোমার চরিত্র-মাধুর্যের পরিচয়, আর আমিও গোপন করতে চাইনে যে এই বয়সেও মৃত্যুর কথা ভাবতে মনটা যেন ছলছল করে ওঠে। ভাগ্যক্রমে আমার দৈহিক মৃত্যুর অতি সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে. আর যা তার সম্বন্ধে সব ধর্মমতই আনন্দময় আশার বাণী শোনায়। আমি তৃপ্ত, কিন্তু এখনও যেটুকু সময় রয়েছে তার মধ্যে একটি মাত্র বিচিত্র অনুভূতি আমি উপলব্ধি করতে চাই—আমার এখনও একটি কাজ বাকি ; এই সময়টুকুর মধ্যে আমাকে তা করতেই হবে। কাজটি কি তুমি অনুমান করতে পার ?

কনওয়ে নীরব।

পুত্র, সে-কাজ তোমারই সম্বন্ধে।

আমাকে আপনি বিশেষ সম্মানিত করছেন?

তার চাইতে অনেক বেশি করার ইচ্ছা আমার আছে।

কনওয়ে মাথা নীচু করে তাঁকে অভিবাদন জানাল, কোন কথা বলল না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর প্রধান লামা বললেন, তুমি জান আমাদের এই ঘন ঘন সাক্ষাৎকার এখানকার পক্ষে খুবই অস্বাভাবিক। কিন্তু হেঁয়ালির মত শোনালেও আমি বলব, আমাদের এখানকার ঐতিহ্য এই যে আমরা কোন ঐতিহ্যেরই দাস নই। কোন রকম অলঙ্ঘনীয় অপরিবর্তনীয় নিয়ম আমাদের নেই। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা নিয়ে, বর্তমানের জ্ঞানের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে এবং অলোকদৃষ্টিলব্ধ ভাবীকালের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যা ভাল বুঝি তাই করি। এবং এই ভাবেই আমি আমার শেষ কাজটিও করে যেতে চাই।

কনওয়ে তবু নীরব।

পুত্র, আমি তোমার হাতে সমর্পণ করছি শ্যাংরি-লার উত্তরাধিকার এবং ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব।

অবশেষে সপ্রয়াস প্রতীক্ষার অবসান হলো, এবং কনওয়ে অনুভব করল যেন এক স্নিগ্ধ-কোমল শুভদা শক্তির সঙ্কেতে সে নিয়ন্ত্রিত। প্রধান লামার কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হয়ে নৈঃশব্দ্যে মিলিয়ে গেল; কনওয়ে শুধু শুনতে পায় তার নিজের হৃদস্পন্দন—বুকের ভেতর কে যেন তালে তালে দামামা বাজিয়ে চলেছে।

সেই ছন্দোময়তার মাঝখানে আবার জেগে উঠল প্রধান লামার কণ্ঠস্বর, পুত্র, তোমার জন্যে আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছি। এই ঘরটিতে বসে প্রত্যেকটি নবাগতের মুখ আমি দেখেছি, প্রত্যেকের চোখদুটির দিকে তাকিয়েছি, প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর শুনেছি; সব সময়েই আশা করেছি একদিন

তোমাকে পাব। আমার সহকর্মীরা বৃদ্ধ হয়েছেন এবং বয়সের সঙ্গে প্রজ্ঞা লাভ করেছেন; কিন্তু তুমি বয়সে নবীন হলেও প্রজ্ঞায় তাঁদের সমভাজন। বন্ধু, আমি তোমাকে খুব কঠিন কাজের ভার দিচ্ছি তা নয়, কেননা আমাদের সম্প্রদায় জানে শুধু কোষেয় বন্ধন। তোমাকে হতে হবে ধীর ও সহিষ্ণু; মনের ঐশ্বর্যের প্রতি তোমাকে রাখতে হবে সজাগ দৃষ্টি; আর বাইরে যতদিন চলবে ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভ ততদিন প্রজ্ঞা ও গুপ্তিসাধনা হবে তোমার পরম ব্রত। এ-সবই তোমার পক্ষে খুব সহজ, এবং তুমি পাবে পরমানন্দের সন্ধান।

আবার কনওয়ে কিছু বলতে যায়, কিন্তু পারে না; হঠাৎ একটি তীব্র বিদ্যুৎ-ঝলকানি ঘরের আঁধার ক্ষণকালের জন্যে কিছুটা তরল করে দিল এবং তাতে কনওয়ের স্নায়ুগুলি নাড়া পেতেই সে বলে উঠল, ঝঞ্ঝা—এই-যে ঝড়-ঝঞ্ঝা চলেছে এর কথাই বলছেন···

পুত্র, এমনই ঝঞ্ঝা আসছে যা পৃথিবী কোনদিন দেখেনি। অস্ত্রের সাহায্যে নিরাপত্তা রক্ষা করা যাবে না, রাষ্ট্রশক্তির কাছ থেকে কোন সাহায্য মিলবে না, আর বিজ্ঞান মূক হয়ে থাকবে। যতক্ষণ-না মানব-সংস্কৃতির প্রতিটি নিদর্শন ধ্বংস হয়, যতক্ষণ-না মানুষের যা-কিছু সৃষ্টি একটা সর্বগ্রাসী বিশৃঙ্খলার মধ্যে একাকার হয়ে যায় ততক্ষণ সেই প্রলয়ের উন্মত্ততা থামবে না। নেপোলিয়নের নামও যখন কেউ শোনেনি তখন এই ছবি আমি চোখের সামনে দেখেছি, এবং এখন প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে সে-ছবি আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। তোমার কি মনে হয় আমি ভ্রান্ত?

কনওয়ে উত্তর দিল, না, আপনার অনুমান সত্য বলেই মনে হয়। আর একবার এমনই এক সর্বগ্রাসী প্রলয় এসেছিল, তারপর দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর ধরে চলেছিল তামস যুগ।

তবু এ-দুটি সমান নয়; কেননা সেই তামস যুগ সত্যসত্যই তত তামস ছিল না—সেই আঁধারের সারা বুক ছেয়ে ছিল কম্পমান কত দীপশিখা; য়ুরোপের আলোক-বর্তিকা সম্পূর্ণ নির্বাপিত হলেও, চীন থেকে পেরু পর্যন্ত

দীপ্যমান ছিল আরও কত আলোক-শিখা,—য়ুরোপের দীপবর্তিকা তা থেকে আবার জ্বেলে নেওয়া যেত। কিন্তু যে তামস যুগ আসছে, তা সমগ্র পৃথিবীকে ঢেকে ফেলবে একটিমাত্র আস্তরণে ; তা থেকে পরিত্রাণ নেই, আশ্রয় নেই,—শুধু যে-সব স্থান এমনই গোপন যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় কিংবা এমনই তুচ্ছ যে কারও দৃষ্টিগ্রাহ্য হবার নয়, শুধু সেইগুলিই রক্ষা পাবে। শ্যাংরি-লা এ-দুটিই আশা করতে পারে। বিমানীরা যখন বড় বড় শহরের দিকে মৃত্যু বহন করে নিয়ে যাবে তখন আমাদের পথে তারা আসবে না, আর যদি একান্তই আসে তারা আমাদের বোমার যোগ্য ভাববে বলে মনে হয় না।

আপনি মনে করেন আমার জীবদ্দশায় এ-সবই ঘটবে ?

আমার বিশ্বাস তুমি সমগ্র প্রলয়-কাল বেঁচে থাকবে, এবং হয়তো প্রলয়ের পরে সুদীর্ঘ তামস যুগটিও তুমি অতিক্রম করে যাবে ; তোমার দেহ যত প্রাচীন হবে ততই বৃদ্ধি পাবে তোমার প্রজ্ঞা ও তিতিক্ষা। আমাদের ইতিহাসের মাধুরীটুকু তুমি সংরক্ষণ করবে, আর তা রঞ্জিত করবে তোমার মানসত্তার স্পর্শ দিয়ে। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবে এবং তাদের শোনাবে বয়স ও প্রজ্ঞার বাণী। তারপর যখন তুমি অতি-বৃদ্ধ হবে তখন হয়তো তাদেরই একজন তোমার হাত থেকে নেবে শ্যাংরি-লার উত্তরাধিকার। এর পর আমার দৃষ্টি আর তত স্বচ্ছ নয়, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি সুদূর ভবিষ্যতে ধ্বংস-স্তূপের মধ্য হতে জন্ম নিচ্ছে এক নূতন পৃথিবী ; নবজাতকের জীবন-স্পন্দনে হয়তো থাকবে না ছন্দোময়তা, কিন্তু তার বুকে থাকবে নূতন আশা, আর সে খুঁজবে তার হারিয়ে যাওয়া যত সব স্বপ্ন-সম্পদ। পুত্র, এক নবতর যুগের প্রতীক্ষায় সে সম্পদ অলৌকিকভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকবে এইখানে, অভ্রংলিহ শৈলস্তবকের অন্তরালে, নীলচাঁদের উপত্যকায়···

কথা শেষ হলো। কনওয়ে দেখল তাঁর মুখখানি যেন কোন্ সুদূরচারী সৌন্দর্য-সুষমায় প্লাবিত হয়েছে ; তারপর সে-দ্যুতি ধীরে ধীরে সরে গেল, থাকল শুধু একটি মুখাবরণ—কৃষ্ণ রেখাঙ্কিত ও জীর্ণ কাষ্ঠোপম ভঙ্গুর। সম্পূর্ণ

নিঃস্পন্দ সে-মুখ, চক্ষুদুটি মুদ্রিত। কনওয়ে অনেকক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থাকল, তারপর যেন স্বপ্নঘোরে বুঝতে পারল—প্রধান লামা মৃত।

কনওয়ে যেন বিশ্বাসই করতে পারে না যে প্রধান লামার সত্যসত্যই মৃত্যু হয়েছে, তাই অবস্থাটাকে একটা স্থূল কিছুর সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন মনে হলো, এবং যন্ত্রবৎ তার চোখদুটি হাতের ঘড়ির ওপর গিয়ে পড়ল: বারোটা পনের। দরজার দিকে অগ্রসর হতে হঠাৎ তার মনে হলো কি করে এবং কোথা থেকে সে সাহায্য চাইবে। ভিক্ষুণীরা সকলেই রাত্রির মতো চলে গেছে, আর চ্যাং বা অন্য কাকেও কোথায় যে পাওয়া যাবে তাও সে জানে না। অন্ধকার অলিন্দের ওপর সে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটি জানলার মধ্য দিয়ে দেখা যায় আকাশ কখন নির্মল হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও বিদ্যুতের আলোয় পাহাড়গুলি রূপালি পটের মতো ঝলমল করে উঠছে। তখন যেন স্বপ্নঘোরে তার মনে হলো, শ্যাংরি-লার সর্বাধ্যক্ষ সে। পৃথিবীর কল-কোলাহল থেকে মনের গহনে তার বাস, সেখানকার সব-কিছু যেন রূপায়িত শ্যাংরি-লার পরিবেশে, তাই চারিদিকের প্রতিটি জিনিস সে ভালবাসে। আঁধারের মাঝে তার দৃষ্টি ইতস্তত ফেরে এবং তরঙ্গময় লাক্ষারসে প্রোজ্জ্বল সোনালি বিন্দু-শীর্ষে নিবদ্ধ হয়। রজনীগন্ধার বিলীয়মান মৃদু সুরভি তার অনুভূতির প্রান্তদেশে পৌঁছে তাকে কক্ষ হতে কক্ষান্তরে টেনে নিয়ে যায়। অবশেষে স্খলিত পদক্ষেপে সে দীঘির সংলগ্ন প্রাঙ্গণটিতে এসে উপস্থিত হলো। কারাকালের পিছনে তখন পূর্ণচন্দ্র উঠেছে। তখন দুটো বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি।

পরে সে বুঝতে পারল ম্যালিনসন তার কাছে এসেছে, সে তার হাতদুটি ধরে তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলেছে। কেন তা সে কিছুই বুঝতে পারে না, শুধু শুনতে পায় উত্তেজিতকণ্ঠে ম্যালিনসন কী সব বলে চলেছে।

এগারো

বারান্দাওলা যে ঘরটিতে তারা খাওয়া-দাওয়া করে, সেইখানে তারা পৌঁছল ম্যালিনসন তখনও তার হাত দুটি ধরে প্রায় টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলছে কনওয়েকে—শোন, হাতে মাত্র রাত্রিটুকু রয়েছে, এর ভেতর জিনিসপত্তর যতটা পারি গোছগাছ করে নিয়ে আমাদের সরে পড়তে হবে। অন্দর খবর, বুঝলে— কিন্তু আমি কি ভাবছি জান, বারণার্ড আর মিস ব্রিংকলো কাল সকালে যখ দেখবে আমরা চলে গেছি তখন তারা কী মনে করবে।......অবশ্য তারাই তে স্থির করেছে যে এখানে থাকবে : আর দেখ, তারা কিন্তু সঙ্গে না আসলে বো হয় আমাদের পক্ষে ভাল। কুলিরা গিরিসঙ্কট থেকে পাঁচ মাইল দূরে আছে গতকাল তারা বই আর কী-সব জিনিসপত্তর নিয়ে এসেছে। কাল তারা ফি যাচ্ছে,—বুঝছ তো, এরা কী ভাবে আমাদের ডোবাতে চায়,—একটি কথা আমাদের বলেনি। ভগবান জানেন আরও কতকাল আমাদের এখানে পচতে হতো।......কী হলো বল তো তোমার? কোন অসুখ করেছে নাকি?

সামনের দিকে ঝুঁকে টেবিলের ওপর কনুই দুটি রেখে একটি চেয়ারে কনওয়ে বসেছিল। চোখের ওপর একবার হাতটা বুলিয়ে বলল সে, অসুখ না, সে রকম কিছু নয়। তবে হ্যাঁ—খুব ক্লান্ত আমি।..

হয়তো ঝড়ের দরুণ। কিন্তু এতক্ষণ ছিলে কোথায়? আমি তোমা জন্যে কখন থেকে অপেক্ষা করছি।

আমি—আমি প্রধান লামার সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

ও—তাঁর সংগে! যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই শেষ দেখা।

হ্যাঁ, ম্যালিনসন, শেষ দেখা।

কনওয়ের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু থাকে, এবং তার পরই সে এমনই নীরব হয়ে যায় যে, ম্যালিনসনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বলল, দেখ, আর গেঁতোমি করো না ; বুঝছ তো, আমাদের তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।

কনওয়ে নিজের চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় একটু শক্ত হলো। বলল, আমি দুঃখিত। তারপর সে যেন তার স্নায়ুগুলির কর্মণ্যতা ও অনুভূতির বাস্তবতা পরখ করার জন্যই একটি সিগারেট ধরাল। দেখল, হাত ঠোঁট দুইই তার অবশ। বলল, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ম্যালিনসন,... তুমি বলছ কুলিরা......

হ্যাঁ হ্যাঁ গো, কুলিরা,— সামলে নাও তুমি।

তুমি কি তাদের সঙ্গে যোগ দেবে ভাবছ ?

ভাবছি মানে ? আমি একেবারে নিশ্চিত—তারা তো ওই খাড়াইটার ওপারেই রয়েছে। আমাদের এক্ষুণি বেরতে হবে।

এখনই ?

হ্যাঁ হ্যাঁ— কেন নয় ?

কনওয়ে আবার চেষ্টা করল নিজেকে এক জগত হতে আর এক জগতে আনার জন্যে। কিছুটা সফল হলো, অবশেষে সে বলল, তুমি এ-কথা বুঝছ কি যে কাজটা যত সহজ ভাবছ তত সহজ নাও হতে পারে ?

ম্যালিনসন তখন হাঁটু অবধি উঁচু তিব্বতী জুতায় ফিতে বাঁধছিল। ঝাঁকানি দিয়ে বলল সে, আমি সবই বুঝছি, কিন্তু কিছু তো করতেই হবে, আর তা করবও—অবশ্য যদি দেরি না হয় আর বরাতে থাকে।

কিন্তু আমি তো বুঝছি না কী করে—

ওঃ ভগবান, এইভাবে সব কিছু এড়িয়ে যাবে তুমি ? তোমার কি আর কোন ক্ষমতাই নেই ?—তার অনুনয়ের সংগে মিশে থাকে কিছুটা আবেগ, কিছুটা ব্যঙ্গ।

তার কথায় কনওয়ে নিজেকে ফিরে পায়। বলল, আমার আছে কি

নেই সেটা প্রশ্ন নয়, তবে যদি তুমি চাও তাহলে আমি আমার বক্তব্য বলতে পারি। কতকগুলি দরকারী প্রশ্ন রয়েছে কিনা।—ধর, তুমি গিরিসঙ্কট পার হয়ে কুলিদের দেখা পেলে, কিন্তু তুমি কী করে জানলে যে তারা তোমায় সংগে নিয়ে যাবে? তুমি তাদের কি দিয়ে রাজি করাবে? এ কথা কি তোমার একবারও মনে হয়নি যে তুমি চাইলেও তারা রাজি না-ও হতে পারে? শুধু গেলে, এবং গিয়ে বললে, আমাকে নিয়ে চল,—সেটা কি সম্ভব? দরকার হচ্ছে আগে থেকে সব কিছু ব্যবস্থা ও কথাবার্তা পাকা করে রাখা—

অর্থাৎ যে কোন রকমে দেরি করা,—তিক্ততার সংগে ম্যালিনসন বলল, তুমি কী, কনওয়ে! আমার বরাত ভাল যে, তোমার ওপর সে-সবের ভার দিয়ে আমি বসে থাকিনি। শোন, সব কিছু ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কুলিদের অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তারা আমাদের নিয়ে যেতে রাজি। আর এই নাও পথের পোশাক আর সাজ-সরঞ্জাম—সব তৈরি। তাহলে তোমার শেষ অছিলা আর টেঁকে না—কেমন? এখন চল, কাজে নেমে পড়া যাক।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না—

আমি বুঝছি যে তুমি বুঝতে পারছ না। তাতে কিছু আসে-যায় না।

এ-সব ব্যবস্থা করল কে?

এবার ম্যালিনসন স্পষ্ট জবাব দিল, যখন একান্তই শুনতে চাচ্ছ বলছি—লো-সেন। সে কুলিদের সংগে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অপেক্ষা করছে?

হ্যাঁ। সে-ও যাবে আমাদের সংগে। আশা করি তোমার কোন আপত্তি হবেনা।

লো-সেনের নামোল্লেখেই কনওয়ের মনে আবার দুটি জগত মিশে একাকার হয়ে গেল। সে অবিশ্বাসের কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠল, বাজে কথা—অসম্ভব!

ম্যালিনসন তেমনই রুক্ষ উত্তর দিল, কিসের জন্যে অসম্ভব ?

কারণ···হ্যাঁ এমনিই অসম্ভব। বহু কারণই তো রয়েছে। আমার কথা শোন ম্যালিনসন, এ হতে পারে না। সে যে এখন ওখানে এ-কথা ভাবাই যায় না—তুমি যা বললে তাতেই আমি অবাক হয়েছি, কিন্তু আরও অগ্রসর হলে তার পক্ষে একেবারে মারাত্মক ভুল করা হবে।

ভুল কোথায় তাতো দেখছি না। আমার মতো তারও এখান থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু তার সে-ইচ্ছা নেই।—ওইখানেই তো তুমি ভুল করছ।

ম্যালিনসন কঠিন এক টুকরো হাসির সংগে বলল, তোমার ধারণা আমার চাইতে তুমি তার কথা বেশি জান, কিন্তু বোধ করি তুমি জান না।

কী বলতে চাও তুমি ?

বলতে চাই, গাদাখানেক ভাষা না জানলেও মানুষের মনের কথা বোঝার অন্য উপায়ও আছে।

ঈশ্বরের দোহাই, তুমি কী বলতে চাও পরিষ্কার করে বল।—তারপর আরও ধীর কণ্ঠে সে বলল, এ অসম্ভব। কিন্তু বাদবিতণ্ডা করে লাভ নেই। ম্যালিনসন, কী ব্যাপার খুলে বল। আমি এখনও কিছুই বুঝতে পারিনি।

তাহলে তুমি এ-নিয়ে একটা বিরাট হৈ চৈ বাধাচ্ছ কেন ?

আসল কথা আমাকে জানতে দাও,—বল ভাই।

আহা, ব্যাপার খুবই সোজা। তার বয়সী একটি মেয়ে এক গাদা উদ্ভট বুড়োর সংগে এখানে আটক,—সুতরাং সুযোগ পেলেই সে যে পালাবে এইটেই স্বাভাবিক। আজ পর্যন্ত সে রকম সুযোগ সে পায়নি।

তুমি কি নিতান্ত নিজের দিক থেকে তার অবস্থা কল্পনা করছ না ? আমি তোমায় বলছি, সে এখানে সম্পূর্ণ সুখী।

তাহলে কেন সে বলল আমাদের সংগে যেতে চায় ?

সে বলেছে ? কী করে বলল ? সে তো ইংরেজি জানে না।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিব্বতী ভাষায়—মিস্ ব্রিনকুলো তর্জমা করে দেন। কথাবার্তা বেশ স্বচ্ছন্দভাবে হয়েছিল তা নয়, তবে হ্যাঁ—পরস্পরের মন বোঝার পক্ষে যথেষ্ট।—ম্যালিনসনের মুখে একটু লজ্জার আভা দেখা দিল, সে বলল, দূর হোক গে,—শোন কনওয়ে, আমার দিকে অমন করে চেয়ে থেক না—যে কেউ ভাববে, আমি তোমার নিজস্ব ব্যাপারে হামলা করছি।

কনওয়ে উত্তর দিল, আশা করি কেউ তা ভাববে না। কিন্তু তুমি যা বলতে চাও তোমার ওই মন্তব্যটি থেকে আমি তার অনেক বেশি বুঝতে পেরেছি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত—এ ছাড়া আমার বলার কিছু নেই।

কিন্তু কেন—কিসের জন্যে?

কনওয়ে তার আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটটি ছেড়ে দেয়। সে ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করে, বিপরীতমুখী স্নেহ-প্রীতির একটা গভীর অনুভূতি তার মনকে আচ্ছন্ন করে—সে-অনুভূতির উদয় না হলেই ভাল ছিল। মৃদুস্বরে সে বলল, তোমার-আমার পরস্পরবিরুদ্ধ মনোভাব কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। লো-সেন লাবণ্যময়ী আমি জানি, কিন্তু তা নিয়ে বিরোধ কেন?

লাবণ্যময়ী?—বিদ্রূপ মেশান কণ্ঠে ম্যালিনসন তারই কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, তার চাইতে একটু বেশি। এসব ব্যাপারে সকলেরই রক্ত তোমার মতন হিম-শীতল ভেব না। তোমার কাছে লো-সেন জাদুঘরের দর্শনীয় কোন বস্তুর মতো নিছক প্রশংসাটুকু মাত্র পেতে পারে, কিন্তু আমার দৃষ্টি আরও বাস্তব; এবং যাকে আমার ভাল লাগে তাকে যদি বিশ্রী অবস্থার মধ্যে দেখি তাহলে তার জন্যে কিছু একটা করার চেষ্টা আমি করি।

কিন্তু অতি-উৎসাহ বলেও একটা কথা আছে। যদিই সে একান্তই যায়, কোথায় সে উঠবে সে কথা কিছু ভেবেছ?

চীনে কিংবা আর কোথাও তার বন্ধুবান্ধব নিশ্চয় আছে। মোট কথা, এখানকার চাইতে সে অনেক ভালো থাকবে।

এত জোরের সংগে তুমি সে কথা কী করে বলছ?

বলছি এই জন্যে যে, নিতান্তই যদি কেউ তার ভার না নেয় তাহলে আমিই নেব। কাকেও নরক থেকে উদ্ধার করার সময় কেউ জিজ্ঞাসা করে না তার যাবার কোন জায়গা আছে কিনা।

শ্যাংরি-লাকে তাহলে তোমার নরক বলেই মনে হয়?

নিশ্চয়। এর সঙ্গে কী একটা রহস্য, একটা শয়তানি জড়িয়ে রয়েছে। যে-ভাবে বিনা কারণে একজন উন্মাদ আমাদের এখানে নিয়ে এল, এবং তারপর যে-ভাবে নানান ছলে আমাদের এখানে আটক করে রাখা হয়েছে তাতে গোড়া থেকে আমার ওই কথাই মনে হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে সব চাইতে ভীতিকর ব্যাপার হলো, এই অদ্ভুত জায়গাটা তোমার ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছে।

আমার ওপর?

হ্যাঁ, তোমার ওপর। এখানে তুমি এমনই স্বপ্নের ঘোরে ভেসে বেড়াচ্ছ যে যেন কিছুই হয়নি এবং চিরজীবন এখানে থাকতে পেলে তুমি খুশীই হবে। আর নিজের মুখেই তো তুমি বলেছ যে এ জায়গাটা তোমার খুব ভাল লাগছে।......কনওয়ে, কী হয়েছে তোমার? আবার কি তুমি সেই আগের মানুষটি হতে পার না? বাসকুলে আমরা কত আপন ছিলাম—তখন তুমি ছিলে একেবারে আলাদা মানুষ।

বন্ধু ম্যালিনসন!

কনওয়ে সস্নেহে তার হাতটি চেপে ধরল।

ম্যালিনসন বলে চলল, জানিনা তুমি বুঝবে কিনা। কিন্তু গত কয়েকটি সপ্তাহ আমি কী নিদারুণ নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছি। সব চাইতে কাজের কথাটিতে কেউ দৃকপাতই করতে চায় না,—বারণার্ড আর মিস ব্রিনক্‌লোর না-হয় কিছু কারণ আছে, কিন্তু তোমাকেও যখন আমার বিপক্ষে দেখলাম তখন রীতিমত ভয়ই পেলাম।

আমি দুঃখিত।

বার বার তো ওই কথাই বলছ, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই।

আকস্মিক আবেগের বশবর্তী হয়ে কনওয়ে বলল, বেশ, তাহলে যাতে লাভ হয় তাই করব—জানিনা পারব কিনা। আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই; আমার কথা শুনলে এখন যা অদ্ভুত ও অস্পষ্ট বলে তোমার মনে হচ্ছে তা সবই স্বচ্ছ হয়ে যাবে। অন্তত এটুকু তুমি বুঝতে পারবে কেন তোমার সঙ্গে যাওয়া লো-সেনের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

আমার মনে হয়, কোন কিছুই আমাকে তা বুঝিয়ে উঠতে পারবে না। বেশ, যা বলতে চাও বল, কিন্তু যথাসাধ্য সংক্ষেপে, কেননা অতিরিক্ত সময় আমাদের হাতে এতটুকু নেই।

কনওয়ে তখন প্রধান লামার কাছ থেকে শ্যাংরি-লার যে-কাহিনী শুনেছিল এবং সে-সম্পর্কে তাঁর ও চ্যাঙের সংগে যেসব আলোচনা হয়েছিল তা সবই যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করল। বলার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বলা সঙ্গত, এমন কি প্রয়োজনও বলে তার মনে হয়েছিল। ম্যালিনসন যে তারই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই,—সেই সমস্যা সমাধানের জন্যে যা সঙ্গত তাই করা দরকার। দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ গতিতে সে সব কথা বলে গেল, এবং বলতে বলতে সেই কালজয়ী বিচিত্র জগতটির মোহে সে আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল; তার সৌন্দর্য-সুষমা বিবৃত করতে গিয়ে সে আবার অভিভূত হয়ে পড়ল, বার বার তার মনে হলো স্মৃতির একটি পৃষ্ঠা থেকে সে পাঠ করে চলেছে,—ভাবধারা ও শব্দসম্পদ কী স্পষ্টভাবেই-না মুদ্রিত হয়ে গেছে। কেবল একটি কথা সে বলল না,—সেই রাত্রে প্রধান লামার মৃত্যু হয়েছে এবং শ্যাংরি-লার উত্তরাধিকার পেয়েছে সে।

কাহিনীর শেষের দিকে আসতে সে স্বস্তিবোধ করল; ব্যাপারটার যা হোক একটা নিষ্পত্তি করে সে খুশী, আর এছাড়া অন্য কোন সমাধানই ছিল না। বক্তব্য শেষ করে সে শান্ত-দৃষ্টিতে ম্যালিনসনের দিকে তাকাল, তার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে সে জানে।

কিন্তু ম্যালিনসন টেবিলের ওপর আঙুলের টোকা মারতে লাগল ; বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলল, কী বলব আমি ভেবে পাচ্ছি না কনওয়ে তুমি নিশ্চয় বদ্ধ পাগল...

সুদীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এলো। দুজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে— কনওয়ে সংবৃত ও হতাশ, আর ম্যালিনসন অবরুদ্ধ অস্বস্তিতে ক্রুদ্ধ ও চঞ্চল।

অবশেষে কনওয়ে বলল, তাহলে তোমার ধারণা আমি পাগল ?

ম্যালিনসন ভয়বিমিশ্র কণ্ঠে হেসে উঠল, বলল, এইরকম একটা গল্প শোনার র তাছাড়া আর কী বলি ? দেখ, আমি বলতে চাই—সত্যি—এ সব অর্থহীন আজগুবি—এ নিয়ে কোন তর্কই চলে না।

গভীর বিস্ময়ের সংগে চোখদুটি তুলে কনওয়ে বলল, তোমার মনে হয় । সব আজগুবি ?

হ্যাঁ—তাছাড়া কী বলব ? আমি দুঃখিত কনওয়ে—কথাটা রূঢ় হয়ে যাচ্ছে—কিন্তু সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি মাত্রেই এই কথা বলবে।

অর্থাৎ তোমার এখনও ধারণা যে আমাদের এখানে আসাটা নিতান্তই একটা আকস্মিক ঘটনা, এবং সে-ঘটনার প্রধান নায়ক একটি বদ্ধ উন্মাদ যে এক সতর্ক পরিকল্পনা অনুসারে একখানি বিমান চুরি করে আমাদের নিয়ে পালিয়ে আসে হাজার মাইল দূরে নিছক তামাসা করবার জন্যে।

কনওয়ে একটি সিগারেট ম্যালিনসনের দিকে বাড়িয়ে দিল। সে নিল। একটু বিরাম পেয়ে যেন দুজনেই খুশী।

অবশেষে ম্যালিনসন বলল, শোন কনওয়ে, ও-ব্যাপার নিয়ে খুঁটিনাটি তর্ক করে লাভ নেই। তোমার অনুমান যে, এখানকার লোকেরা একজনকে বহির্জগতে পাঠিয়েছিল জনকতক নতুন লোককে কৌশল করে নিয়ে আসার জন্যে, তারপর সেই লোকটি তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে বিমানচালনা শিক্ষা করেছিল এবং যতদিন না চারজন আরোহী সমেত বাসকুলত্যাগী একটি উপযুক্ত বিমানের সন্ধান পায় ততদিন সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—দেখ,

তোমার এই অনুমান নিতান্ত অসম্ভব না হলেও আমার কাছে হাস্যকর কষ্ট-কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। তবু, এইই যদি সব হতো তাহলে না-হয় ব্যাপারটা ভেবে দেখা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে যখন তুমি যত সব অসম্ভব কথার আমদানি করছ—যেমন লামারা শত শত বৎসর বেঁচে থাকে এবং দীর্ঘ যৌবন লাভের জন্যে তারা নাকি আবিষ্কার করেছে এক রসায়ন বা ঐরকমই একটা কিছু – তখন, কি বলব, আমি ভেবেই পাই না তোমার মাথায় কী পোকা ঢুকেছে।

কনওয়ে হেসে বলল, স্বীকার করি তোমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। আমিও হয়তো প্রথমে অবিশ্বাস করেছিলাম—এখন ঠিক মনে নেই। অবশ্য কাহিনীটি খুবই অদ্ভুত, কিন্তু জায়গাটিও যে খুবই অদ্ভুত তা তো তুমি নিজের চোখেই দেখছ। যেসব জিনিস আমরা দুজনেই দেখেছি একবার সেগুলির কথা ভাব তো দেখি—অনবেক্ষিত পর্বতমালার মধ্যে একটি ভ্রষ্ট উপত্যকা, য়ুরোপীয় গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ গ্রন্থাগার-বিশিষ্ট একটি প্রাচীন মঠ—

এবং কেন্দ্রীয় তাপবিকিরণ যন্ত্র, আধুনিক সীসকব্যবস্থা, বৈকালিক চা এবং সব কিছু—এগুলি যে খুবই অদ্ভুত আমি তা জানি।

তাহলে, এসব থেকে তুমি কি সিদ্ধান্তে আসতে পার?

কিছু না,—স্বীকার করি সবই রহস্যময়। কিন্তু তাই বলে একটা অবাস্তব আজগুবি মেনে নিতে পারি না। উষ্ণস্নান বিশ্বাস কর, কেননা তুমি তার অনুভূতি নিজের দেহের মধ্যে পাও, কিন্তু শুধু মুখের কথা শুনে কি বিশ্বাস করতে হবে যে মানুষ শত শত বৎসর বাঁচে?—অস্বস্তির সংগে আবার একটু হেসে বলল সে, শোন কনওয়ে, জায়গাটা তোমার স্নায়ুগুলোকে অভিভূত করেছে, আর তাতে আমি খুব বিস্মিতও হইনি। এখন জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে চল বেরিয়ে পড়া যাক। মাসখানেক কি মাসদুয়েক পরে মেডেনে ডিনার খাবার পর আজকের মুলতুবি তর্ক শেষ করা যাবে।

শান্তকণ্ঠে কনওয়ে বলল, সে জীবনে ফিরে যাবার অভিলাষ আমার নেই।

কোন্ জীবনে?

যে জীবনের কথা তুমি ভাবছ—ভোজ—নৃত্য—পোলোখেলা—এইসব……

কিন্তু নাচ বা পোলোর কথা আমি বলিনি। তাছাড়া, তাতেই বা দোষ কি? কিন্তু তুমি কি সত্যিই আমাদের সংগে যাবে না? আর দুজনকার তো এখানেই থেকে যাবে? তাহলে আশা করি আমাকে অন্তত যেতে বাধা দেবে না।—সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, তখন তার চোখদুটো জ্বলছে। উত্তেজিত কণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে কনওয়ে,—হ্যাঁ, তুমি পাগলই হয়েছ। আমি জানতাম তুমি সব সময় ধীর স্থির, আর আমিই সব সময় উত্তেজিত; কিন্তু এখন দেখছি আমি তবু প্রকৃতিস্থ, কিন্তু তুমি উন্মাদ। বাসকুলে তোমার সংস্পর্শে আসার আগে অনেকে আমায় সাবধানে করে দিয়েছিল; আমি ভেবেছিলাম তারা ভুল বলেছে। কিন্তু এখন দেখছি অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছিল তারা।

কি বলেছিল তারা?

তারা বলেছিল যে, যুদ্ধে তুমি নিদারুণ ঘা পেয়েছিলে, এবং তার পর থেকে মাঝে মাঝে তুমি কেমন হয়ে যাও। আমি তোমাকে ভৎর্সনা করছি না—জানি কিছুই করার নেই তোমার—এবং ঈশ্বর জানেন, এভাবে কথা বলতে আমি মোটেই চাই না।… যাক, আমি চললাম। উঃ—এ-ভাবে যাওয়া কি ভয়ানক, কি কদর্য; তবু আমাকে যেতেই হবে। আমি কথা দিয়েছি যে।

কাকে? লো-সেনকে?

হ্যাঁ,—একান্তই যখন জানতে চাইছ।

কনওয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতটি প্রসারিত করে বলল, বিদায়, ম্যালিনসন।

শেষবারের মতন জিজ্ঞাসা করছি কনওয়ে, আসবে তুমি?

আমি যেতে পারব না।

তাহলে বিদায়।

করমর্দন করে ম্যালিনসন বেরিয়ে গেল।

লণ্ঠনের আলোয় কনওয়ে একা বসে রইল। মনে হলো, তার স্মৃতির ফলকে ক্ষোদিত হয়ে রয়েছে : প্রতিটি সুন্দর বস্তুই স্বল্পস্থায়ী ও নশ্বর, দুই জগতের পুনর্মিলন শেষ পর্যন্ত অসম্ভব, এবং তাদের একটি সব সময়ই সূক্ষ্ম সুতায় দোদুল্যমান। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে ঘড়ি দেখল : তিনটে বাজতে দশ মিনিট বাকি।

তখনও সে টেবিলের সামনে বসে শেষ সিগারেটটি টানছে, এমন সময় ম্যালিনসন ফিরে এল। তার সারা শরীরে উত্তেজনা এবং কনওয়েকে দেখে সে নিজেকে সামলাবার জন্যেই যেন একটু দূরে আবছা অন্ধকারে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু অপেক্ষা করে কনওয়ে প্রশ্ন করল, কী হলো, ম্যালিনসন? ফিরে এলে যে?

তার প্রশ্নের স্বাভাবিকতায় ম্যালিনসন এগিয়ে এসে ভেড়ার-চামড়ার ভারী পোশাকটা খুলে রেখে বসল। তার মুখ ছাইয়ের মতো শাদা, এবং তার সারা শরীরটা থর থর করে কাঁপছে। প্রায় কান্নার সুরে সে বলল, আমার সাহস হলো না কনওয়ে—পারলাম না। সেই জায়গাটা তোমার মনে আছে? —সেই-যে যেখানে আমরা দড়ি বেঁধে পার হয়েছিলাম? সেই অবধি গিয়েছিলাম, কিন্তু পার হতে পারলাম না। অত উঁচুতে মাথা ঘুরে গেল, চাঁদের আলোয় জায়গাটা বীভৎস দেখাচ্ছিল। ভারি দুর্বল আমি, তাই না?—সে একেবারে ভেঙে পড়ল, যেন সে উদ্‌ভ্রান্ত। কনওয়ের কাছ থেকে সান্ত্বনা পেয়ে সে আবার বলল, এদের কোন ভাবনাই নেই—স্থলপথে কেউ এদের আক্রমণ করতে পারবে না। কিন্তু ভগবান! আকাশ পথে এক বোঝা বোমা নিয়ে এখানে আসার জন্য আমি সব কিছু দিতে রাজি আছি।

কেন ম্যালিনসন?

কেননা, এ-জায়গাটা যাই হোক না কেন, এটা বিধ্বস্ত হওয়াই উচিত। এমনিতেই তো বিশ্রী কুৎসিত জায়গা এটা, তার ওপর তোমার সেই অসম্ভব

কাহিনীটি যদি সত্যি হয় তাহলে তো আরও ঘৃণ্য! একরাশ চিমসে-পড়া আদ্যিকালের বুড়ো যেন মাকড়সার মতো ওত পেতে রয়েছে যে-কেউ কাছে আসবে তাকে ধরার জন্যে……কী বীভৎস……ওভাবে যুগ যুগ ধরে কে বেঁচে থাকতে চায় বলতো? আর তোমার ওই মহামূল্য প্রধান লামাটি, তুমি যা বললে তার অর্ধেকও যদি তার বয়স হয়, তাহলে কারও উচিত তাকে ভব-যন্ত্রণা থেকে এখনই মুক্তি দেওয়া।……কনওয়ে, কেন তুমি আমার সংগে যাবে না, নিজের জন্যে তোমাকে অনুরোধ করতে ইচ্ছে যায় না, কিন্তু তবু. আমি যুবক এবং আমি তোমাকে বন্ধু বলে দাবি করতে পারি,—এই সব বিশ্রী জীবগুলোর মিথ্যার তুলনায় আমার সারা জীবনের কোনো মূল্যই কি তোমার কাছে নেই? আর লো-সেন—সে তরুণী— তারও কি কোন দাম নেই তোমার কাছে?

লো-সেন তরুণী নয়।—কনওয়ে বলল।

ম্যালিনসন তার দিকে চেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো মুখ চেপে চেপে হাসতে লাগল। বলল, না, সে তরুণী নয়—তরুণী সে হতেই পারে না। তাকে দেখায় সপ্তদশী, কিন্তু তুমি বলবে সে সুসংরক্ষিত নবতি!

ম্যালিনসন, সে এখানে এসেছে ১৮৮৪ সালে।

তুমি প্রলাপ বকছ, কনওয়ে।

সৌন্দর্যের মূল্য যারা জানে না তাদেরই করুণার ওপর নির্ভর করছে তার সৌন্দর্য—জগতের আর সব সৌন্দর্যেরই মতো। যেখানে ভংগুর বস্তুর সমাদর শুধু সেইখানেই ভংগুর বস্তু টিকে থাকতে পারে। তাকে তুমি এই উপত্যকার বাইরে নিয়ে গেলেই দেখবে সে প্রতিধ্বনির মতোই মিলিয়ে গেছে।

কর্কশকণ্ঠে হেসে উঠল ম্যালিনসন,—যেন তার নিজের চিন্তাধারা তাকে দেয় আত্মপ্রত্যয়।. সে বলল, তাতে আমি ভয় করি না। সে যদি কোথাও প্রতিধ্বনি হয় তো এখানে।—একটু থেমে আবার সে বলল, এসব কথাবার্তায় কোন লাভ নেই। বরং কাব্য ছেড়ে বাস্তবে নামা যাক। কনওয়ে, আমি

তোমাকে সাহায্য করতে চাই;—আমি জানি এ সবই অত্যন্ত
কথা, তাহলেও যদি তোমার কিছু ভাল করতে পারি এই আশায় আমি
করতে প্রস্তুত। তুমি যা বলেছ তা না হয় ধরে নিলাম সত্য, কিন্তু
পরীক্ষা সাপেক্ষ। এখন বল তুমি, তোমার কাহিনীব স্বপক্ষে কী প্রমাণ

কনওয়ে নীরব।

কেবল কারও কাছ থেকে তুমি একটি অলীক উপাখ্যান শুনেছ। তে
সুপরিচিত এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কারও কাছ থেকেও এই গল্পটি শু
তুমি প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করতে চাইতে না। এ-ক্ষেত্রে তোমার কি প্র
আছে? আমি যতদূর জানি, কোন প্রমাণই নেই। লো-সেন নিজে ক
তোমাকে তার কাহিনী বলেছে?

না, কিন্তু—

তাহলে অন্যের কাছ থেকে শুনে তুমি তা বিশ্বাস করছ কেন? আর
যে দীর্ঘায়ু হওয়ার ব্যাপার—তার পক্ষে বাইরে থেকে তুমি একটি মাত্র ন
দেখাতে পার?

কনওয়ে মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে ত্রিয়াক সোঁপ্যার যে-কটি অজ্ঞাত
বাজিয়েছিলেন তার উল্লেখ করল।

আমার কাছে ওসব অর্থহীন। আমি সংগীতবিদ্ নই, তবু মেনে
সেগুলি আসল সুর, কিন্তু তাতেও তার গল্প সত্য প্রমাণিত হয় না,-
কোন উপায়ে সেগুলি সংগ্রহ করা তার পক্ষে কি নিতান্তই অসম্ভব?

মোটেই অসম্ভব নয়।

তারপর তুমি বলতে চাও তারা নাকি যৌবন রক্ষার কি-এক পদ্ধতি জা
কিন্তু সে পদ্ধতিটি কি? তুমি বলছ সেটি একটি ওষুধ—ভাল কথা, কিন্তু ব
জানতে চাই কী ওষুধ সেটি? কোনদিন তুমি নিজের চোখে তা
নিজে পরীক্ষা করেছ? কেউ কোনদিন সে-বিষয়ে তোমাকে প্রমা
কিছু দিয়েছে?

বিশদ কিছু নয় স্বীকার করি।

এবং তুমিও তা কখন চাওনি? একথা তোমার মনেই আসেনি যে, এরকম একটা গল্প বিশ্বাস করতে গেলে চাই প্রমাণ। তুমি স্রেফ সবটুকু গাধঃকরণ করে নিলে?—সুযোগ না ছেড়ে ম্যালিনসন বলে চলল, তোমায় বলা হয়েছে তাছাড়া এখানকার কতটুকু খবর তুমি প্রকৃতপক্ষে জান? দু জনকতক বুড়োকে দেখেছ,—এই যা। তা বাদে আমরা এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, জায়গাটা সাজানো-গোছানো এবং এর চাল-চলন বেশ একটু রাসিক। কিন্তু কেমন করে এবং কি কারণেই বা এর আবির্ভাব হলো তা আমরা মোটেই জানিনা; উপরন্তু এরা যদি আমাদের এখানে রাখতেই চায়—কেন চায় তা সমান দুর্বোধ্য—তাই বলে কি মান্ধাতার আমলের একটি আলগল্প বিশ্বাস করে নিতে হবে? হাজার হোক, সূক্ষ্মবিচারী মন তোমার,—এ-গল্প কোন ইংরেজ মঠে শুনলে তুমি বিশ্বাস করতে রীতিমত ইতস্তত করতে। বাস্তবিক আমি ভেবে পাইনা—তিব্বত বলেই কি সব কিছু শোনামাত্র মেনে নিতে হবে!

কনওয়ে মাথা নাড়ল,—গভীরতর অনুভূতির মাঝেও সে ম্যালিনসনের যুক্তিগ্রাহ্য যুক্তি স্বীকার না করে পারে না। সে বলল, ম্যালিনসন, তোমার বক্তব্য খরধার; কিন্তু আমার কি মনে হয় জান, বিশ্বাস করার জন্যে যখন যুক্তির প্রয়োজন হয় না তখন বুঝতে হবে, সব চাইতে আকর্ষণীয় বলে যা প্রতীয়মান মন তারই প্রতি ধাবিত হয়েছে।

তুমি অর্ধমৃত হবার আগে এখানে বাস করার মতন কোন আকর্ষণ যদি আমি পাই তাহলে বলতে হবে আমার হয়ে গেছে। স্বল্প আনন্দময় জীবন আমার কামনা। আর ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কথা—আমার কাছে ওসব ফাঁকা বুলি। পরবর্তী যুদ্ধ কবে শুরু হবে, তার চেহারাই বা হবে কেমন—এ-সব কথা কি করে জানা যায় শুনি? গত যুদ্ধ সম্বন্ধে সব ভবিষ্যদ্বাণী কি ভুল প্রমাণিত হয়নি?—কনওয়ে কোন উত্তর না দিতে সে আবার বলল, অনিবার্য বলে আমি

কিছু বিশ্বাস করি না। আর তাই যদি হয়, তা নিয়ে ত্রস্ত হবার কী আছে! ঈশ্বর জানেন, যুদ্ধে যেতে হলে আমি খুব সম্ভব ভয়ে কাঠ হয়ে যাব, কিন্তু এখানে সমাধিস্থ হয়ে থাকার চাইতে বরং যুদ্ধে যেতে আমি রাজি।

কনওয়ে একটু হেসে বলল, আমাকে ভুল বুঝতে তুমি আশ্চর্য পটু ম্যালিনসন। যখন বাসকুলে ছিলাম, তুমি ভাবতে আমি বীর, এখন ভাবছ আমি কাপুরুষ। কিন্তু সত্যি কথা কি, আমি ওদুটির কোনটিই নই;—অবশ্য তাতে কিছু যায়-আসে না। ভারতবর্ষে ফিরে ইচ্ছে হলে তুমি সকলকে বলতে পার যে, আরেকটি যুদ্ধের ভয়ে আমি এক তিব্বতীয় মঠে থেকে গেছি থাকার কারণ অবশ্য এটা নয়, কিন্তু যারা আমায় পাগল ভেবে নিতে পারে তারা নিঃসন্দেহে একথা বিশ্বাস করবে।

বিষণ্ণ-কণ্ঠে ম্যালিনসন বলল, এভাবে কথা বলার কোন মানে হয় না যাই হোক-না কেন, তোমার বিরুদ্ধে আমি একটি কথাও বলব না, একথা তুমি বিশ্বাস করতে পার। তোমায় আমি বুঝতে পারি না, আমি তা স্বীকার করছি—কিন্তু—কিন্তু যদি পারতাম! কনওয়ে, আমি কি তোমার এতটুকু উপকারে আসতে পারি না? কোন কথা বলতে পারি না, কোন কাজ করতে পারি না?

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এলো। অবশেষে সে নিস্তব্ধতা ভেঙে কনওয়ে বল তোমাকে আমি একটিমাত্র প্রশ্ন করতে চাই—কথাটা খুবই ব্যক্তিগত, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো।

কী, বলো?

লো-সেনকে তুমি ভালবাস?

তরুণ ম্যালিনসনের মুখের বিবর্ণ ভাবটুকু দ্রুত সরে গিয়ে রক্তিম হলো সে বলল, হ্যাঁ বাসি—আমার তো তাই মনে হয়। আমি জানি তুমি বলবে এ অযৌক্তিক অচিন্তনীয়,—হয়তো তাই-ই, কিন্তু আমার হৃদয় বাধা মানে না।

আমি তোমার ভালবাসাকে মোটেই অযৌক্তিক ভাবি না।

বহু ঝড়ঝঞ্ঝার পর এতক্ষণে যেন তাদের তর্ক কূলের দেখা পেল।

কনওয়ে বলল, আমারই বা হৃদয় বাধা মানে কি করে? তুমি আর ঐ মেয়েটি—পৃথিবীতে এই দুটি মানুষই আমার সব চাইতে প্রিয়......যদিও আমার পক্ষে তা অদ্ভুত বলে তোমার মনে হচ্ছে।—হঠাৎ সে উঠে পড়ে ঘরময় পায়চারি করতে থাকে, বলে,—ম্যালিনসন, আমাদের যা-কিছু বলার ছিল সবই বলা হয়ে গিয়েছে, তাই নয় কি?

হ্যাঁ, মনে হয় আর কিছুই বলার নেই।—কিন্তু অকস্মাৎ ম্যালিনসন ব্যাকুল আবেগে বলে যায়, কি-সব অর্থহীন নির্বোধের প্রলাপ—লো-সেন তরুণী নয়! কুৎসিত—বীভৎস যত বাজে কথা! কনওয়ে, আমার কথা তুমি বিশ্বাস করতে পার না! সত্যি আশ্চর্যরকম হাস্যকর।—এ-সবের কোন অর্থ হয় নাকি?

তুমি নিশ্চিত কী করে জানলে যে সে তরুণী?

গভীর লজ্জায় ম্যালিনসনের মুখখানা ঝলকে উঠল, মাথাটা অন্যদিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলল, কেননা আমি নিশ্চিত জানি।—তুমি হয়তো আমার সম্বন্ধে কিছু ভাবছ,—কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি। কনওয়ে, তুমি তাকে কোনদিন ঠিকমত বোঝনি। তার খোলসটা ছিল শীতল, সেটা হয়েছিল এখানে থাকার ফলে—সব উষ্ণতা বরফ-জমাট হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু উষ্ণতা ছিল—

আবার দ্রবীভূত হবার জন্যে?

হ্যাঁ—তা এক রকম বলা যেতে পারে।

ম্যালিনসন, তুমি বলছ সে তরুণী—তুমি সে-বিষয়ে এত নিশ্চিত?

মৃদুস্বরে ম্যালিনসন বলল, ভগবান—কি বলব কনওয়ে, সে নিতান্তই কিশোরী। তার জন্যে আমি তীব্র বেদনা পেয়েছি এবং বোধ করি তাই আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছি। আমার এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই নিশ্চয়। বরং আমার মনে হয় এ-রকম জায়গায় এমন অনাবিল সুন্দর কোন কিছু কখনও ঘটেনি।

কনওয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে কারাকালের আলো-ঝলমল পঙ্কচূড়ার দিকে তাকাল ; নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে চাঁদ পাড়ি দিয়ে চলেছে। তার মনে হলো, অতি-সুন্দর বস্তুর মতো, একটি স্বপ্ন বাস্তবের স্পর্শ পেয়ে মিলিয়ে গেল ; আর সারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ তারুণ্য ও প্রেমের কাছে বাতাসের মতই লঘু। এ-কথাও সে বুঝতে পারল, তার মন বাস করে নিজস্ব এক জগতে যার সূক্ষ্মায়ত রূপ শাংরি-লা এবং সেই জগতটিও আজ বিপন্ন। কেননা আত্মস্থ হতে হতেই সে দেখতে পায়, তার কল্পনার দরদালানগুলি একটা সংঘর্ষে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, প্রশস্ত গৃহগুলি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে—সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। সে কিছুটা অসুখী, কিন্তু কেমন যেন বিষাদ-স্পৃষ্ট সীমাহীন বিহ্বলতায় তার মন আচ্ছন্ন। সে বুঝতে পারে না, সে পাগল হবার পর এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছে, কিংবা কিছুকালের জন্যে প্রকৃতিস্থ থাকার পর আবার সে পাগল হয়ে গেছে।

যখন সে ফিরল তখন তার ভেতর একটা পরিবর্তন এসেছে। তার কণ্ঠস্বর অনেক তীক্ষ্ণ, প্রায় রুক্ষ, এবং তার মুখের পেশী কিছুটা সঙ্কুচিত ; তখন সে যেন বাসকুলের সেই বীর কনওয়ে। কাজের জন্যে উৎসুক, নবলব্ধ ক্ষিপ্রতার সংগে সে অকস্মাৎ ম্যালিনসনের সামনে এসে দাঁড়াল, বলল, তুমি কি মনে কর আমি তোমার সংগে থাকলে সেই জায়গাটা তুমি দড়ির সাহায্যে পার হতে পারবে ?

ম্যালিনসন প্রায় ছিটকে তার সামনে এসে রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল কনওয়ে! তুমি—তুমি তাহলে যাবে আমার সংগে ? শেষ পর্যন্ত মনস্থির করেছ ?

কনওয়ে প্রস্তুত হতেই তারা বেরিয়ে পড়ল। আশ্চর্যরকম নির্বিঘ্ন তাদের যাত্রা—যেন বিদায় নিয়ে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া নয় ; চাঁদের আলো আর ছায়া ভরা প্রাংগণগুলি পার হবার সময় কোন কিছুই ঘটল না। কনওয়ের

মনে হলো, চারদিক একেবারে শূন্য, কেউ কোথাও নেই, এবং সেই শূন্যতা-বোধ অচিরে তার মনের শূন্যতায় পরিণত হলো; ম্যালিনসন অনর্গল বকে যায়, কিন্তু তার কোন কথা সে শুনতে পায় না। তাদের দীর্ঘ বাদানুবাদ যে এভাবে শেষ হবে এবং যে-মানুষ এই গোপন তীর্থটিতে এত সুখের সন্ধান পেয়েছিল সে তা ছেড়ে চলে যাবে—সত্যিই বড় বিস্ময়কর! পথ চলা এক ঘণ্টা পূর্ণ না হতে তারা একটি বাঁকের মাথায় এসে হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়াল, সেখান থেকে শেষবারের মতো দেখল শ্যাংরি-লা। অনেক নীচে নীলচাঁদের উপত্যকা যেন একখণ্ড মেঘ; কনওয়ের মনে হলো যেন বিক্ষিপ্ত কুটীরগুলি আবছা অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসছে তারই দিকে। এবার বিদায়ের শেষ মুহূর্ত এসেছে!

খাড়াই পাহাড়ে ওঠার ক্লান্তিতে ম্যালিনসন কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারে নি। এখন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, চমৎকার চলেছি আমরা—চল, এগিয়ে চল।

কনওয়ে মৃদু একটু হাসল, কোন কথা বলল না। সে তখন ছুরির-ফলার মতো দুস্তর পথটুকু অতিক্রম করার জন্যে দড়ি ঠিক করছে। ম্যালিনসন ঠিকই বলেছে, সে মন স্থির করেছে,—কিন্তু মনের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল শুধু ততটুকু। সেই ক্ষুদ্র কর্মচঞ্চল অংশটিই এখন প্রবল; বাকি অংশ শূন্যতায় ভরা, যেন সহ্যের অতীত। দুটি জগতের মাঝে সে এক পথচারী পথিক, তার পথ চলার শেষ নেই। কিন্তু এখন মনের বর্ধমান শূন্যতার মাঝে তার একমাত্র অনুভূতি, সে ম্যালিনসনকে ভালবাসে এবং তাকে সাহায্য সে করবেই। নিয়তি তাকে বাধ্য করছে লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো প্রজ্ঞার পথ থেকে সরে এসে বীর আখ্যা মেনে নিতে।

ম্যালিনসন খাড়াই দেখে ভয় পেয়ে গেল; কনওয়ে পর্বতারোহণের চিরাচরিত কৌশল অবলম্বন করে তাকে পার করে দিল। তারপর তারা সিগারেট ধরাল।

ম্যালিনসন বলল, কনওয়ে তোমাকে কী যে বলব······আমার মনের
হয়তো তুমি অনুমান করছ······আমি যে কী খুশি তা তোমাকে
পারব না······

তাহলে, আমি হলে সে চেষ্টাই করতাম না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার যাত্রা শুরু করার সময় ম্যালি
বলল, আমি আনন্দিত কেবল নিজের জন্যেই নয়—তোমার জন্যেও বটে।··
আমার ভারি আনন্দ যে তুমি এখন বুঝতে পেরেছ ঐ-সব গল্পগুলো নিতা
বাজে। তোমাকে তোমার স্বরূপে দেখতে আমার এত ভাল লাগে।

মোটেই নয়।—কেমন একটা বক্র ভঙ্গিমা নিয়ে কনওয়ে বলল—
মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে।

ভোরের দিকে তারা গিরিসঙ্কটটি পার হলো ; কোন শান্ত্রী থাকলেও
তাদের বাধা দিল না। কনওয়ের অবশ্য মনে হয়েছিল পথটির ওপর শ্যাংরি-
পাহারা যত থাক পরিমিতভাবেই আছে।

একটু পরে তারা মালভূমিতে পৌছল, আর বাতাস সগর্জনে ধেয়ে
তাদের দিকে। আরও কিছুটা নামার পর কুলিদের তাঁবুগুলি নজরে
ম্যালিনসন যা বলেছিল তা সবই ঠিক ঠিক মিলে গেল। তারা দেখতে
লোকগুলি তাদের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, তাদের জোয়ান কর্মঠ চেহ
লোম আর ভেড়ার চামড়ার পোশাকে সর্বাঙ্গ ঢাকা। ঝড়ো বাতাসে
গুঁজে তারা অপেক্ষা করছিল ; পূর্বদিকে এগারোশো মাইল দূরে
তাত্‌সিয়েন-ফুর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার জন্য তারা উৎসুক।

লো-সেনের সংগে দেখা হতেই ম্যালিনসন উত্তেজিত কণ্ঠে বলে
কনওয়ে আমাদের সংগে যাবে!—উত্তেজনার আধিক্যে সে ভুলে গেল
লো-সেন ইংরেজি জানে না ; কনওয়ে অবশ্য তরজমা করে দিল।

লো-সেনের চোখে মুখে এমন দীপ্তি কনওয়ে আগে কখনও দেখেনি
কনওয়ের দিকে ফিরে অতি মনোরম ভংগিতে সে একটু হাসল ; কিন্তু
চোখদুটি পড়ে থাকে তরুণ ম্যালিনসনের ওপর।

—কথাশেষ—

রাদারফোর্ডের সংগে আবার আমার দেখা হলো দিল্লীতে। বড়লাটের
ট ডিনারপার্টিতে আমরা দুজনেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু দূরত্ব আর
ষ্ঠানিক রীতি এমন বাধা হয়ে দাঁড়াল যে একেবারে শেষে যতক্ষণ না
ড়ি আঁটা চাপরাশিরা আমাদের টুপি হাতে দিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার সংগে
ন কথাই হোল না।

সুযোগ পেতেই রাদারফোর্ড পুরনো দিল্লীতে তার হোটেলে ড্রিঙ্কের নিমন্ত্রণ
নাল।

দুজনে তার হোটেলের উদ্দেশে একখানা গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম।
গজে দেখেছি, রাদারফোর্ড এই কিছুদিন হলো কাশগড় থেকে ফিরেছে।
র যা প্রসিদ্ধি তাতে তার সব কিছু নিয়েই একটু হৈ চৈ হয়।

যাই হোক, তার হোটেলে গিয়ে হুইস্কি পানের পর একটি অনুকূল মুহূর্ত
য়ে বললাম, তুমি তাহলে কনওয়ের অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলে?

অনুসন্ধান বললে একটু বেশি বলা হয়।—উত্তর দিল সে, য়ুরোপের প্রায়
র্ধেক একটি দেশ ঘেঁটে একজন মাত্র লোককে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।
ধু এইটুকু বলতে পারি যে; যেখানে যেখানে তার সন্ধান বা কোন খবর পাব
লে আশা করেছিলাম সেইসব জায়গায় গিয়েছিলাম। তার শেষ চিঠির কথা
শ্চয় তোমার মনে আছে, তাতে সে লিখেছিল যে, ব্যাঙ্কক হতে উত্তর-পশ্চিমে
ন চলেছে। বৃহৎ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে কিছুদূর অবধি তার হদিস মিলেছিল;
আমার নিজের মত, হয়তো সে চীনসীমান্তে উপজাতীয় জনপদগুলির দিকে
গয়েছে। বর্মায় যাবে বলে মনে হয় না, কেননা বৃটিশ কর্মচারিদের সঙ্গে
দখা হয়ে যাওয়া সম্ভব। যোটের ওপর উচ্চগ্রামের কোন জায়গা থেকে তার

পথরেখার আর সন্ধান পাওয়া যায় না, অবশ্য অতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করে যাওয়ার আশা আমি করিনি।

তুমি ভেবেছিলে নীল চাঁদের উপত্যকা খুঁজে বার করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে ?

হুঁ,—সেইটেই যেন আরও সুনির্দিষ্ট করণীয় বলে মনে হয়েছিল। তুমি আমার পাণ্ডুলিপিটিতে চোখ বুলিয়েছ নিশ্চয় ?

তার অনেক বেশি করেছি। হ্যাঁ দেখ—এতদিনে তোমাকে আমার সেটা ফেরত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তুমি তো কোন ঠিকানা দাওনি।

ঘাড় নেড়ে রাদারফোর্ড বলল, পড়ে তোমার কি ধারণা হলো ?

খুবই অদ্ভুত মনে হলো,—অবশ্য কনওয়ে যা বলেছিল শুধু তাই নিয়ে যদি রচিত হয়ে থাকে।

আমি শপথ করে বলছি যে, তার একটি বর্ণও আমার মনগড়া নয়—এমনকি, আমার ভাষা যতটা আছে ভাবছ তাও নেই। আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর, আর কনওয়ের কোনকিছু বর্ণনা করে যাওয়ার ক্ষমতা অদ্ভুত। তাছাড়া এ-কথাও ভুলো না যে, চব্বিশ ঘণ্টা ধরে প্রায় একটানা কথা আমাদের হয়েছিল।

সত্যি খুবই অদ্ভুত।

হেলান দিয়ে বসে একটু হেসে সে বলল, ওইটুকুতেই যদি তোমার বক্তব্য ফুরিয়ে যায়, তাহলে দেখছি আমাকেই বলতে হলো। তুমি নিশ্চয় ভাব যে আমি সব-কিছু সহজে বিশ্বাস করে নিই, কিন্তু সত্যিসত্যিই আমি তা করি না। অতি-বেশি বিশ্বাস করে মানুষ ভুল করে; আবার কিন্তু অতি-কম বিশ্বাস করলেও জীবন নীরস হয়ে ওঠে। এ-কথা ঠিক যে কনওয়ের গল্প আমি বিশ্বাস করেছিলাম, এবং সেই কারণেই কাহিনীটিকে টুকিটাকি যথাসম্ভব অলঙ্কৃত করি;—তাতে মানুষটির প্রতি অবিচারের আশঙ্কা কিছুটা ছিল, কিন্তু অবিচার করিনি।

একটি সিগার ধরিয়ে সে বলে চলল, তার জন্যে আমাকে ... ও
জায়গায় বহু ঘুরতে হয়েছে। অবশ্য ঘুরে বেড়ান আমার নেশা, এবং
প্রকাশক মধ্যে মধ্যে একখানা ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করতে মোটেই
নয়। মোটের ওপর আমি হাজার হাজার মাইল ঘুরেছি—বাসকুল,
চুং-কিয়াং, কাশগড়—সব, জায়গায় গিয়েছি এবং এইসব স্থানেরই
কোন অংশে রহস্যটি নিহিত রয়েছে। কিন্তু সব মিলে সে-এক বি...
এবং আমার অনুসন্ধান সেই ভূভাগের এবং রহস্যটিরও প্রান্তটুকু ছু...
গেছে। কনওয়ের অভিযান সম্পর্কে যদি তুমি নিছক তথ্যগুলি জানতে
তাহলে আমি প্রামাণ্য যতটুকু জানতে পেরেছি ও বলতে পারি তা হচ্ছে
যে, সে বাসকুল ত্যাগ করে বিশে মে এবং চুং-কিয়াঙে পৌছয় পাচুই অক্টো...
আর তার সম্পর্কে শেষ খবর হচ্ছে যে সে আবার ব্যাঙ্কক ত্যাগ করে ...
ফেব্রুআরি। বাকিটুকু সম্ভাবনা, অনুমান, জল্পনা-কল্পনা, রূপকথা—যা ...
বলতে পার।

তাহলে তিব্বতে তুমি কিছু পাওনি?

তিব্বতে আমি যাই-ই নি। গভর্ণমেণ্ট হাউসের কেউ ও-কথা শুনতে
চায় না, এ যেন এভারেস্ট অভিযানের অনুমতি দেওয়ার মতো গুরুতর এব
কিছু। যখন আমি বললাম যে আমি নিজে থেকে কুয়েন-লুনে বেড়াতে
ভেবেছি, তখন তারা এমনভাবে আমার দিকে চাইল যেন আমি গান্ধীর জী...
লেখার কথা বলছি। আসল কথা, তারা আমার চাইতে বেশি জ...
তিব্বতে ঘুরে বেড়ান একজন লোকের কর্ম নয়; রীতিমত একটি অভিযাত্রী
গঠন করা দরকার, এবং তিব্বতী ভাষায় কিছুটা দখল আছে এমন কারও ...
করা প্রয়োজন। আমার মনে আছে, কনওয়ে যখন তার গল্পটি বলছিল,
তখন ভাবছিলাম কুলিদের জন্যে অপেক্ষা না করে তারা স্রেফ বেরিয়ে প...
তো পারত। কারণটি আবিষ্কার করতে আমার বেশিদিন লাগেনি। স...
লোকেরা ঠিকই বলে,—পৃথিবীর সব পাসপোর্ট থাকলেও কুয়েন-লুনে ...

আমি তবু অনেকদূর অবধি গিয়েছিলাম, এ

মাইল দূর থেকে আমি কুয়েন-লুন পর্বতমালা দেখেছি।

রতে পারেন মাত্র জনকয়েক য়ুরোপীয়।

ং দুস্তর?

দিগরেখায় সেগুলি যেন একটানা শাদা রেখবী

আর কাশগড়ে যার সংগে আমার আলাপ হয়েছে তাকেই আমি

সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু আশ্চর্য—বিশেষ কিছু জানতে পারিনি। মনে হয়, পৃথিবীর ওই পর্বতশ্রেণীটিতে মানুষের অভিযান হয়েছে সব কম। ভাগ্যক্রমে একজন আমেরিকান পর্যটকের সংগে আমার দেখা তিনি একবার ওই পর্বতমালাটি অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পথ পাননি। তিনি বলেছিলেন, 'পথ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু মারাত্মক কম উঁচুতে এবং কোন মানচিত্রেই তার কিছুমাত্র হদিস নেই।' কনওয়ে য-রকম উপত্যকার কথা বলেছিল সেইরকম কোন উপত্যকা ওখানে থাকা সম্ভব কিনা আমি জিজ্ঞাসা করলাম; তাতে তিনি বললেন, 'নিতান্তই অসম্ভব ভব না, তবে ভূতত্ত্বের দিক থেকে সম্ভব বলে মনে হয় না।' তারপর তাঁকে প্রশ্ন করলাম, হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গের সমকক্ষ উচ্চ কোন শঙ্কু-পর্বতের কথা নি শুনেছেন কিনা; তিনি উত্তরে বললেন, 'এ ধরণের একটি গল্প শোনা বটে, তবে আমার বিশ্বাস সেটি ভিত্তিহীন।' তিনি আরও বললেন, খনও নাকি শোনা যায় যে এভারেস্টের চাইতেও উঁচু পর্বতশৃঙ্গ আছে, কিন্তু মি সে-সব কিংবদন্তীর বিশেষ মূল্য দিই না: কুয়েন-লুনের কোন শৃঙ্গই শ হাজার ফুটের চাইতে উঁচু বলে আমি মনে করি না; তবে অবশ্য মতো জরিপ করাও হয়নি।

'রাদারফোর্ড বলে চলল, সেই আমেরিকান অভিযাত্রীটি তিব্বতে গিয়েছিল ধিক বার, তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিব্বতী মঠগুলি সম্পর্কে : কী জানেন। তাতে তিনি যা বললেন, তা তুমি যে-কোন বইয়ে পাবে।

তিনি বললেন, 'মঠগুলি অত্যন্ত কদর্য, আর সন্ন্যাসীরা সাধারণত ভ্রষ্টচরিত্র নোংরা'। প্রশ্ন করলাম, তারা কি দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ—তা অনেকেই থাকে, যদি-না অবশ্য কোন নোংরা ব্যাধিতে মৃত্যু হয়।' তারপর আমি তাঁকে সাহস করে আসল কথাটি জিজ্ঞাসা করলাম, লামারা কয়েক-শো বছরও বাঁচে এরকম কোন গল্প তিনি শুনেছেন কিনা। তিনি উত্তর দিলেন 'রাশি রাশি শুনেছি—এরকম গল্প আপনি এখানে সব জায়গাতেই শুনতে পাবেন, কিন্তু প্রমাণ কিছু পাবেন না। একটি কুঠরির মধ্যে এক কুৎসিতদর্শন জীবকে দেখিয়ে এরা আপনাকে বলবে যে সেখানে সে একশো বছর আবদ্ধ রয়েছে—তাকে দেখে আপনার মনে হবে হয়তো বা তাই, কিন্তু আপনি তো তার জন্মপত্রিকা দাবি করতে পারেন না।' জিজ্ঞাসা করলাম জীবন ও যৌবনকে দীর্ঘ করার জন্যে তারা কোন গূঢ় বিদ্যা জানে বা কোন রকম ঔষধ প্রয়োগ করে থাকে এমন কথা তিনি শুনেছেন কিনা। তিনি বললেন, 'এসব ব্যাপারে তাদের বিচিত্র জ্ঞান আছে বলে ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু ভাল করে খোঁজ নিতে গেলেই দেখবেন যে ভারতীয় দড়ির ভোজবাজির মতো সব কিছুই আজব—সকলেই অন্যের দোহাই পাড়বে। তবে লামাদের দেহ-শাসনের অদ্ভুত ক্ষমতা স্বীকার করি। আমি দেখেছি, বরফঢাকা হ্রদের ধারে ঠাণ্ডা যখন শূন্য ডিগ্রিরও নীচে, তারা সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে দুরন্ত হিমেল বাতাসে বসে থাকে, আর তাদের ভৃত্যরা বরফ ভেঙে তারই জলে সপসপে করে কাপড় ভিজিয়ে তাদের সারা অঙ্গে জড়িয়ে দেয়। এই রকম তারা প্রায় বারো-চোদ্দ বার করে, আর প্রতিবারই সেই কাপড় লামারা নিজেদের গায়ে শুকিয়ে ফেলে। লোকে ভাবে, এ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দেহ-তাপ বজায় রাখা,—কিন্তু ব্যাখ্যাটি যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হয় না।'

রাদারফোর্ড আরও একটু মদ্যপান করে আবার শুরু করল, অবশ্য এ-সবের সঙ্গে দীর্ঘায়ু হওয়ার তেমন কোন সম্পর্ক নেই,—আমার আমেরিকান বন্ধুটিও সেকথা বলেছিলেন। এ থেকে এইটুকু মাত্র বোঝা যায় যে লামারা আত্ম-

সংযমের জন্যে অনেকগুলি ক্লেশকর পদ্ধতি অবলম্বন করে।......আমা
তথ্যানুসন্ধান ঐ পর্যন্ত, এবং আশা করি তুমি আমার সঙ্গে একমত যে লি
যোগ্য প্রমাণ কিছুই মিলল না।

আমি বললাম, হ্যাঁ—চূড়ান্ত কিছু তো নয়ই। আচ্ছা, সে
আমেরিকানটিকে 'কারাকাল' বা 'শ্যাংরি-লার' কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলে

করেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ ধরে তাঁ
নানান প্রশ্ন করার পর তিনি বললেন, 'সত্যি কথা বলতে, মঠ-টঠ সম্পা
আমার বিশেষ আগ্রহ নেই, একদা তিব্বতে ভ্রমণকালে এক ব্যক্তির সঙ্গে দে
হয়, আমি তাকে বলেছিলাম, আমি যদি একান্তই আমার সংকল্পিত পথে
চলি তাহলে বুঝতে হবে সেটা মঠে যাবার জন্যে নয়, মঠ এড়িয়ে যাবার জন্যে
তাঁর এই আকস্মিক মন্তব্যে হঠাৎ মাথায় একটা খেয়াল এসে গেল, জিজ্ঞা
করলাম কবে সে ঘটনা ঘটে। তিনি উত্তর দিলেন 'ও, সে অনেকদিনের ক
—যুদ্ধেরও আগে মনে হয় ১৯১১ সালে।' ব্যাপারটি বিস্তারিত জানার জন্যে
আমি পীড়াপীড়ি করলাম, সুতরাং তিনি যতটুকু মনে ছিল বললেন।—কোন
একটি আমেরিকান ভৌগোলিক সমিতির পক্ষ থেকে জনকয়েক সহকর্মীর সংগে
তিনি পর্যটন করছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কুলি এবং আর সব আয়োজনই ছিল
—অর্থাৎ একটি পাকা অভিযাত্রী দল। কুয়েন-লুনের কাছাকাছি কোন
জায়গায় সেই ব্যক্তিটির সংগে তাঁর দেখা হয়—একজন চৈনিক, দেশীয়
বাহকেরা একটি চেয়ারে করে তাকে নিয়ে যাচ্ছিল। সে চমৎকার ইংরেজি
জানত; অদূরে কোথায় যেন একটি বৌদ্ধ মঠ ছিল, সে তাঁদের সেটি দেখে
আসার কথা বিশেষ করে বলল—এমন-কি সে তাঁদের পথপ্রদর্শক হবার ইচ্ছে
প্রকাশ করল। কিন্তু আমেরিকান ভদ্রলোকটি বলেন যে তাঁদের সময়ও নেই,
আর তেমন আগ্রহও নেই।

একটু থেমে রাদারফোর্ড আবার বলল, এর কোন বিশেষ মূল্য আমি দিই
না। যখন বিশবছর আগেকার একটা টুকরো ঘটনা কেউ স্মৃতি থেকে উদ্ধার

...র বলতে চেষ্টা করে, তখন তার ওপর নির্ভর করে তুমি বড় কিছু একটা ...ড় তুলতে পার না। তবে ঘটনাটি বেশ একটা মুখরোচক সিদ্ধান্তে আসতে শুরু করে।

হ্যাঁ তা করে। একটি সুসজ্জিত অভিযাত্রীবাহিনী যদি সে আমন্ত্রণ গ্রহণই ...রত, তাহলে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মঠে আটকে রাখা যেত একথা আমি ভেবেই পাই না।

নিশ্চয়। তাছাড়া হয়তো সেটা শ্যাংরি-লা-ই নয়।

এ নিয়ে আমরা অনেক চিন্তা করলাম ; কিন্তু সব কিছু এত ঘোলাটে মনে ...লো যে তা নিয়ে কোন যুক্তি-তর্ক চলে না।

প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, বাসকুলে কিছু জানতে পারনি ?

বাসকুল আমাকে হতাশ করেছে, আর তার চাইতে বেশি হতাশ করেছে পেশোয়ার। এরোপ্লেন চুরি যাওয়ার কথা ছাড়া কেউই আর কিছু বলতে পারেনি। সেটুকুও তারা স্বীকার করতে চায় না,—তাদের পক্ষে সেটা তো খুব গৌরবের ব্যাপার নয়।

পরে প্লেনটার কোন খবরই পাওয়া যায়নি ?

একটি কথাও নয়, এমন কি একটা গুজব পর্যন্ত নয় ; তার চারজন আরোহী সম্বন্ধেও ওই একই কথা। তবে একটুকু প্রমাণ পাই যে, বিমানটি অত উচ্চ পর্বতমালা অতিক্রম করতে পারত। বারণার্ডেরও খোঁজ নেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তার অতীত ইতিহাস এমনই রহস্যময় যে সত্যই যদি সে কনওয়ের কথামতো চামারস্ ব্রিয়াণ্টই হয় তাহলে আমি এতটুকুও বিস্মিত হব না। মোটের ওপর, অত হৈ-হল্লার মধ্য থেকে ব্রিয়াণ্টের অন্তর্ধান রীতিমত বিস্ময়কর।

আসল চোরের সম্বন্ধে কোন খোঁজ নিয়েছিলে নাকি ?

নিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানেও হতাশ হতে হয়েছে। বিমানবহরের যে লোকটিকে আহত করে সে তার ছদ্মবেশ নিয়েছিল সে-লোকটি পরে নিহত

হয়, সুতরাং একটা আশাজনক অনুসন্ধানের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যায়। আমেরিকায় আমার এক বন্ধুর বিমান-চালনা শিক্ষার ইস্কুল আছে; তাকে পর্যন্ত চিঠি দিয়ে আমি জানতে চেয়েছিলাম, কিছুদিন আগে তারই ইস্কুলে কোন তিব্বতী ছাত্র ছিল কিনা; কিন্তু তার উত্তর পেয়ে হতাশ হলাম। সে লেখে যে, তিব্বতী আর চীনাদের মধ্যে সে কোন পার্থক্য করতে পারে না। তার স্কুলে প্রায় পঞ্চাশটি চৈনিক ছাত্র ছিল—তারা সকলেই জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে শিক্ষা নিচ্ছিল। ওদিক থেকেও বিশেষ কোন সুবিধে হলো না বুঝছ। কিন্তু একটি অদ্ভুত আবিষ্কার আমি করেছি—এবং সেটা লণ্ডনে বসেই করতে পারতাম। জেনার একজন জার্মান অধ্যাপক গত শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে পৃথিবী ভ্রমণে বার হন এবং ১৮৮৭ সালে তিব্বত পরিদর্শন করেন। তিনি আর ফেরেননি, শোনা যায় একটি নদী হেঁটে পার হবার সময় তিনি জলে ডুবে মারা যান। তাঁর নাম ফ্রিড্রিশ মেইস্টার।

অবাক ব্যাপার—কনওয়েও তো এই নামটি করেছে।

হ্যাঁ—যদিও এটা হয়তো এমনিই মিলে গেছে। এতে পুরো গল্পটি মোটে সত্য বলে প্রমাণিত হয় না,—কেননা জেনার অধ্যাপকটির জন্ম হয়েছিল ১৮৪৫ সালে। বিশেষ উত্তেজক খবর নয় নিশ্চয়।

কিন্তু অদ্ভুত।

হ্যাঁ, অদ্ভুত খুবই।

কনওয়ে আর যাদের নাম করেছিল তাদের কারও সন্ধান করতে পেরেছ না-কি?

না। দুঃখের বিষয় নামের তালিকাটি মোটেই দীর্ঘ নয়। ব্রিয়াক নামে শোপ্যার কোন ছাত্রের হদিস আমি পাইনি, অবশ্য তাতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, সে-নামে তাঁর কোন ছাত্রই ছিল না। কনওয়ে নামের উল্লেখ খুব বেশি করেনি—শ্যাংরি-লার প্রায় পঞ্চাশ জনের ওপর লামার মধ্যে সে আমাদের মাত্র

একজনের নাম বলেছে। হ্যাঁ—পেরল্ট ও হেনশেল এদের দুজনেরও কোন
দ্ধান-সূত্র আবিষ্কার করতে পারিনি।

আর ম্যালিনসনের খবর?—আমি বললাম, তার কী হলো তা জানার চেষ্টা
রেছ? আর সেই মেয়েটি—সেই চৈনিক মেয়েটি?

অবশ্যই করেছিলাম। পাণ্ডুলিপিটি পড়ে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেয়েছ যে,
আমাদের পক্ষে সবচেয়ে মুশকিল হলো, কনওয়ে কুলিদের সঙ্গে উপত্যকা
ত্যাগ করার মুহূর্তটিতে তার গল্প শেষ করেছে। তারপর কী হলো তা সে
আমাকে বলেনি বা বলতে চায়নি,—হয়তো বা সময় পেলে বলত। কোন
একটা দুঃখকর ঘটনা অনুমান করা যেতে পারে। পথে রাহাজানি বা কুলিদের
বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা তো ছিলই, তার ওপর পথের কষ্ট—সে তো কল্পনারও
অতীত। ঠিক যে কী ঘটেছিল তা হয়তো আমরা কখনও জানতে পারব
না, তবে এ-কথা বললে বোধ করি ভুল বলা হবে না যে, ম্যালিনসন কোনদিনই
চীনে এসে পৌছয়নি। আমি সব রকম খোঁজ নিয়ে দেখেছি। যেসব জায়গা
থেকে—যেমন ধর শাংহাই, পিকিন—বই ও অন্যান্য জিনিসের বড় বড় চালান
তিব্বত সীমান্তের ওপারে যেতে পারে, সেইসব জায়গায় প্রথমে আমি যথাসাধ্য
অনুসন্ধান করি, কিন্তু কিছুই জানতে পারিনি। সেইটেই অবশ্য স্বাভাবিক,
কেননা লামারা তাদের আমদানি-পদ্ধতিটি গোপন রাখার দিকে বিশেষ নজর
দিত নিশ্চয়। তারপর আমি চেষ্টা করি তাত্‌সিয়েনফুতে। সেটা যেন একটা
ভুতুড়ে জায়গা, পৃথিবীর একেবারে শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটা বাজার-শহরের
মতো, সেখানে যাওয়া অতি কষ্টকর, এবং সেইখানে য়ুনানের চৈনিক কুলিরা
তিব্বতীদের চায়ের চালান দিয়ে আসে। আমার নতুন বইটি বেরুলে তাতে
তুমি এ-সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবে। য়ুরোপীয়রা অতদূর অবধি প্রায়ই
যান না। সেখানকার লোকেরা দেখলাম বেশ ভদ্র-ভব্য,—কিন্তু সেখানে
কনওয়েদের দলবলের আসার কথা কিছুই জানা গেল না।

তাহলে কনওয়ে কী করে চুং-কিয়াঙে এল তা এখনও বোঝবার জো নেই?

শুধু এইটুকু বলা যায়, সে ঘুরতে ঘুরতে যেমন যে-কোন জায়গায় হাজির হতে পারত ঠিক তেমনি করে সেখানেই এসে উপস্থিত হয়েছিল। হোক, চুংকিয়াঙে আমরা নিশ্ছিদ্র বাস্তবের সংস্পর্শে আসি,—সেটা কম নয়। মিশন-হাসপাতালের সেবিকাদের কাহিনী খাঁটি, এবং তারপর জা কনওয়ের সৌপ্যা-নামধেয় সুর বাজানয় সিভেকিঙ-এর উত্তেজিত কাহিনীটিও নির্ভেজাল।—একটুখানি নীরব থাকার পর চিন্তিতকণ্ঠে রাদা বলল, এ যেন সম্ভব-অসম্ভবের দাঁড়ি পাল্লায় একটা বিরাট কসরত, এবং বলব পাল্লার কোনদিকই বেশ স্পষ্ট ঝুঁকছে না। কনওয়ের গল্প যদি বিশ্বাস না কর তাহলে এই দাঁড়ায় যে, তুমি তার সত্যবাদিতা কিংবা মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছ,—আর দেখ, সে-বিষয়ে রাখা-ঢাক না করাই সঙ্গত।

সে আবার চুপ করল, যেন আমার মন্তব্য শুনতে চায়। বললাম, তুমি জান, যুদ্ধের পর তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি, কিন্তু শুনেছি যুদ্ধে না তার অনেক পরিবর্তন হয়েছিল।

হ্যাঁ, সে কথা আমি অস্বীকার করি না। একটি বালকের দেহ ও ওপর যদি তিনটি বছর ক্রমাগত নিদারুণ নিপীড়ন চলে তাহলে তার ব্য সত্তার কোন না কোন অংশ চুরমার হয়ে যাবে না কি? লোকে বলবে, তো তার গায়ে আঁচড়টুকুও লাগেনি। কিন্তু লেগেছিল—বাইরে নয়, ভেতরে

তারপর কিছুক্ষণ ধরে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ ও মানুষের ওপর প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চলল। শেষে রাদারফোর্ড বলল, কিন্তু আ কথা রয়েছে যা না বললেই নয়,—এবং এক হিসেবে সেইটিই হয়তো সবচা অদ্ভুত। এ কথা আমি জানতে পারি মিশনে অনুসন্ধান করার সময়। তারা সবাই আমার জন্যে যথেষ্ট করেছিল, কিন্তু সব কথা তারা স্মরণ করতে পারেনি, তা ছাড়া তখন সে-এলাকায় এমন ব্যাপকভাবে জর মহামারী শুরু হয়েছিল যে তাই নিয়ে তারা ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এসময় আমি অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলাম; তার একটি হচ্ছে, কি ভাবে
ওয়ে প্রথম হাসপাতালে এসে পৌছয়—সে একা এসেছিল কিংবা তাকে
সুস্থ দেখে কেউ রেখে গিয়েছিল। কিন্তু তারা ঠিকমতো স্মরণ করতে
রনি—হাজার হোক, অনেক দিনের কথা তো। আমি হতাশ হয়ে ফেরা
করব ভাবছি এমন সময় একজন সেবিকা হঠাৎ বলে উঠল, 'আমার যেন
ন হচ্ছে ডাক্তার বলেছিলেন একজন মহিলা তাঁকে এখানে নিয়ে আসেন।'
র কিছু বলতে পারল না সে; আর ডাক্তারও মিশন ছেড়ে চলে গিয়েছিলে
জেই তখনকার মতো কথাটির সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না।
রাদারফোর্ড বলে চলল, কিন্তু এতদূর এগিয়ে পিছিয়ে পড়ার লোক আমি
ই। খবর নিয়ে জানলাম, ডাক্তার শাংহাই এর একটি বড় হাসপাতালে
গিয়েছেন। তাই তাঁর ঠিকানা জোগাড় করে সেখানে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা
রলাম। একটি জাপানী আকাশ-আক্রমণের ঠিক পরেই আমি গিয়ে উপস্থিত
লাম, চারদিক তখন কেমন যেন থমথমে। এই ডাক্তারটির সংগে আগে
আমার চুং-কিয়াঙে আলাপ হয়েছিল, অত্যন্ত ভদ্র তিনি, কিন্তু সাংঘাতিক ব্যস্ত
—হ্যাঁ সাংঘাতিক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, বিশ্বাস কর, শ্যাংহাই-এর
গ্রামাঞ্চল জাপানীরা যেভাবে বোমায় বিধ্বস্ত করেছে তার তুলনায় লণ্ডনের
ওপর জার্মানদের আকাশ-অভিযান কিছু নয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর
স্মৃতিভ্রষ্ট ইংরেজ রুগীটির কথা মনে পড়ল। তখন প্রশ্ন করলাম, এ কথা কি
সত্য যে, একজন মহিলা তাকে মিশন হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন?
ডাক্তার বলল, নিশ্চয় সত্যি, একজন চৈনিক মহিলা তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন।'
আবার বললাম, 'তাঁর সম্বন্ধে আপনার আর কিছু মনে আছে কি?' উত্তরে
বললেন তিনি, 'বিশেষ কিছু মনে নেই, তবে মহিলাটিরও তখন প্রচণ্ড জ্বর
এবং প্রায় তখনই তিনি মারা যান।'...ঠিক সেইসময় আমাদের কথাবার্তায়
বাধা পড়ল,—একরাশ আহতদের এনে স্ট্রেচার শুদ্ধু বারান্দায় গাদা করে
রাখা হলো—কোন ওআর্ডে আর তিলমাত্র স্থান ছিল না,—তাঁর আর সময় নষ্ট

করার ইচ্ছা আমার হলো না,—বিশেষ করে উদাও অঞ্চল হতে আমার গা

এসে আমায় স্মরণ করিয়ে দিল যে, ডাক্তারের আরও কাজ আসবে

তুনি যখন আবার ফিরে এলেন তখন তাঁকে সেই বীভৎসতার মাঝেও

ফুল দেখাল। তাঁকে তখন আমি শেষ প্রশ্নটি করলাম, কী প্রশ্ন তা হয়

বুঝতেই পারছ। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা সেই চৈনিক মহিলাটি

িনি কি যুবতী?'

রাদারফোর্ড সিগারের ছাইটি এমন ভংগিতে ফেলল যেন তার

আমার মতনই তাকেও উত্তেজিত করে তুলেছে। তারপর সে বলল, ডাক্ত

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল, এবং তারপর শিখি

চৈনিকরা যেমন কাটা কাটা অদ্ভুত ইংরেজি বলে সেইভাবে তিনি বললেন, '

না, তিনি অতি-বৃদ্ধা—ঐ-বয়সের বৃদ্ধা আমি আর দেখিনি।'

আমরা অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলাম। তারপর আবার কনওয়েকে

কেন্দ্র করে আমাদের কথা শুরু হলো—আমাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় সেই কনওয়ে

বালপ্রকৃতি, দিব্যকান্তি এবং প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। যে-যুদ্ধ তার পরিবর্তন

এনেছিল তা নিয়ে, কাল, বয়স ও মনের বহুতর রহস্য নিয়ে, 'অতি-বৃদ্ধা' তন্বী

মাঞ্চুকে নিয়ে, এবং নীলচাঁদের বিচিত্র ও পরম স্বপ্নচ্ছবি নিয়ে—আমাদের কথা

শেষই না হলো।

বললাম, কোন দিন কি নীলচাঁদের উপত্যকা সে খুঁজে পাবে বলে তোমার

মনে হয়?